প্রতিচ্ছায়া
সর্বাণী রায়

তেমাথার সিগন্যালের আগেই ডান দিকে পড়ে বাজারের টার্ন টা। সিগন্যালে আজ গাড়ীর লাইন লেগেছে, সন্ধ্যের সময় অফিস ফেরতাদের ভীড়। লাইনটা না নড়লে গাড়িটাকে বাজারের রাস্তায় ঢোকাতে পারছেনা অর্ক। বিরক্ত হয়ে হর্ন বাজায়, পাশে রাজীও বিরক্তিতে ভ্রু কোঁচকায়। রাজীর বিরক্তিটা অবশ্য অন্য কারণে এবং ওরই উদ্দেশ্যে সেটা না তাকিয়েও বুঝতে পারে। অর্ক একটু চঞ্চল, অস্থির প্রকৃতির, রাজী একদম উল্টো। শান্ত ধীর, সব কাজই করে ধীরেসুস্থে। অর্কর এই সবতাতেই তাড়াহুড়ো, অসহিষ্ণুতার ভাব রাজীর একেবারে পছন্দ নয়।

সিগন্যাল সবুজ হতেই গাড়ীগুলো প্যাঁ পোঁ হর্ন বাজিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছে, অর্ক রাগটাকে চাপা দিতে ধড়াম করে টার্ন করলো। সরু রাস্তা, গলির থেকে একটু বড়, একটা রিক্সাকে প্রায় ধাক্কা দিতে দিতে সামলে নিল। কিছুটা গিয়ে আনন্দ হসপিটাল পেরিয়ে শান্তি বিহারের বাজার এলাকা শুরু। চারিদিকে অসংখ্য ছোট ছোট দোকান, ঘিঞ্জি মত, হকাররা ফুটপাথ উপচে রাস্তার ওপর এসে পড়েছে। তার ওপরে কোথাও সবজি, ফল, ভুট্টাপোড়া, কোথাও বা মেয়েদের নানা কসমেটিক আর জামাকাপড়ের সম্ভার নিয়ে রাস্তা জুড়ে ঠেলারা দাঁড়িয়ে। একেবারে বাংলার ছোট মফস্বল শহরের বাজারের মত। তারই মধ্যে রাস্তা দিয়ে অবিরত রিক্সা, টু্য হুইলার আর গাড়ি আসছে যাচ্ছে। একটা মেন রোড আছে এই রাস্তার সমান্তরাল, কিন্তু লোকে তবু এই সরু রাস্তাতেই ঢুকবে। রাস্তাটা দেখতে গেলে হয়ত খুব সরু নয়, অর্ধেকটা এই হকার আর ঠেলার কবলে চলে গিয়েই এমন একটা গলির চেহারা নিয়েছে।

চারদিকে তাকিয়ে পার্কিং এর জন্য একটা মোটামুটি ফাঁকা জায়গা খুঁজতে লাগল অর্ক, গাড়িটার গতি ধীরে করে। মেন রোড আর এই রাস্তাকে যুক্ত করছে একটা ছোট গলিপথ। সেই অন্ধকার পথের ধারে এক জায়গায় একটা পাঁচিল ভাঙা ছোট্ট পার্ক মত আছে,সবুজ অঞ্চল। ভেতরটায় দেখলে অবিশ্যি সবুজের খুব বেশী কিছু অবশিষ্ট নেই, কয়েকটা বড় বড় গাছ আছে যদিও পাঁচিলের সীমানা ঘিরে। বাকি পুরো পার্কটাতেই বাজারের যত জঞ্জাল সব জমা হয়েছে। পার্কের পাশে অন্ধকার গলিটায় অনেক গাড়ী রাখা আছে। এই দিকটায় ভীড় তেমন নেই। ভাঙা পাঁচিলের ধারে খালি একটা জায়গা দেখে অর্ক গাড়ী পার্ক করল। চারদিকটা নোংরা,উল্টোদিকের তিনতলা বাড়ীতে রাজ্যের সাইনবোর্ডে দেওয়াল প্রায় দেখাই যায় না, নীচেতলায় অন্ধকারমত চাতাল ঘিরে ছোট ছোট দোকানের খুপরি। রাজী কোনোরকমে নাকমুখ কুঁচকে, সালওয়ার গুটিয়ে লাফ দিয়ে নর্দমা পেরিয়ে উল্টোদিকে ব্লাউজের দোকানটার সামনে দাঁড়াল।

অর্ক গাড়ী লক করে এল। দুজনে কেউ কোনো কথা না বলে রাস্তা ধরে বাজারের দিকে হাঁটতে থাকল। অর্কর মুখটা থম মেরে রয়েছে। প্রতিমাসে সাত আট কিলোমিটার ঠেঙিয়ে অন্য রাজ্যে আসতে হয় তাকে বাড়ির গ্রসারী আইটেম কিনতে এই বিচ্ছিরি বাজারটায়। অথচ ওদের বাড়ির পাশেই কি সুন্দর মল, সেখানে একাধিক সুপারমার্কেট। তা পছন্দ না হলে সেক্টরে সেক্টরে শপিং কমপ্লেক্স। দোকানে ফোন করে দিলে লিস্টি মিলিয়ে জিনিস ঘরে পৌঁছে দিয়ে যাবে। তার বন্ধুবান্ধব পড়শীরা সবাই তাই করে। কিন্তু তাকে প্রতিমাসে আসতে হবে এই ঘিঞ্জি বাজারে। প্রতিমাসেই সে এনিয়ে প্রচুর তর্ক করে, কথা কাটাকাটি হয় তবু শেষপর্যন্ত এখানেই আসতে হয়। শান্তিবিহারে এসে রাজীর ছোটোবেলার দোকান থেকে জিনিস না কিনলে তার পরিবারে শান্তি বজায় থাকবেনা।

শান্তিবিহারের এই এলাকা দিল্লীর মধ্যবিত্ত সরকারী চাকুরে আর প্রবাসী কেরালাইটদের একটা বড় ঘাঁটি সেই পুরনো আমল থেকে। রাজীর বাবা মাও এখানে থাকতেন, রাজী জন্মেছে এখানে, বিয়ের আগে অবধি এখানেই থাকত। রাজীর বাবা কেরালার, মা বাঙালী। এখন অবশ্য অবসর নিয়ে বাবা মা কেরালায় ফিরে গেছে। যাবার আগে ওরা ওদের ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিয়েছে। ছোট দুই বেডরুমের ফ্ল্যাট ছিল। প্রথমে বিক্রি করতে চায়নি, যতই হোক এতবছর ছিল ঐ বাড়িতে, মায়া পড়ে গেছিল। অর্কদের বলেছিল এসে থাকতে, কিন্তু অর্ক রাজী হয়নি। দিল্লী হলেও অর্কর এই জায়গাটা পছন্দ নয়, তাছাড়া ফ্ল্যাটটা ছোট। ওর নিজের ফ্ল্যাট কত বড়, তিন বেডরুমের, স্পেশিয়াস। অফিসের কাছেই অভিজাত এলাকা, চারিদিকে সবুজ, চারটে পার্ক, কত গাছপালা। সেসব ছেড়ে ও আসবেনা, রাজীরও সেরকমই মত ছিল। সেইই বাবামাকে জোর করে তাদের

পুরনো ফ্ল্যাট বিক্রি করিয়েছিল। ভাড়াটাড়া দিলে ওদের দেখাশোনা করতে হবে, সেসব অনেক ঝঞ্ঝাটের, অত সময় কার আছে!

অর্কর বাবা আর রাজীর বাবার অফিসসুত্রে দুবাড়িতে জানাশোনা। ছোট থেকেই পরস্পরকে চেনে, তবে ঐটুকুই। রাজীদের বাড়ি থেকেই বিয়ের প্রস্তাব আসে। বাবা মার তো রাজীকে দারুন পছন্দ ছিল। শান্ত সংযত, দিল্লীতে জন্মেছে, বড় হয়েছে, তবু আজকালকার দিল্লীওয়ালিদের মতো নয়। রাজীদের বাড়িতে ওর ঠাকুমার মত ছিলনা, তিনি চাইতেন কোনো পরিচিত মালয়ালী ছেলের সঙ্গে বিয়ে হোক রাজীর। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি নিজের বিরাদরীতে রাজীর পাত্র যোগাড় করতে পারেননি। রাজীর মা বাঙালী, গোঁড়া দক্ষিণীরা তাই দোআঁশলা রাজীকে বউ করে তাদের রক্তের কৌলিণ্য নষ্ট করতে বোধহয় রাজি হয়নি, মোটা পণের লোভেও নয়।

অর্ক ছোট থেকে রাজীকে দেখেছে, তবে দুজনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক বিয়ের আগে হয়নি। ও কেরিয়ারকে খুব সিরিয়াসলি নিয়েছিল, ইঞ্জিনীয়ারিং তারপরে ম্যানেজমেন্ট, পড়াশোনাতে কতগুলো বছর কিভাবে কেটে গেছে। অবশ্য তার মাঝে দু একটা খুচরো প্রেম যে করেনি তা নয়, তবে কোনোটাই বিয়ে অবধি গড়ায়নি। চাকরি পেল যখন তখন দিদির বিয়ে হয়ে গেছে, সুজনদা আর দিদি দুজনে ব্যাঙ্গালোরে, ফ্ল্যাটট্যাট কিনে একেবারে সেট ওখানে । বাবা রিটায়ার করে কলকাতায় বাড়ী করেছে। ওর বাবা রাজীর বাবার থেকে সিনিয়র ছিলেন। মা বাবা চলে যাওয়ার পরে এখানে ভাড়া বাড়ীতে এদিক ওদিক করতে করতে বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। সেইসময় অফিসের কজন মিলে একটা সোস্যাইটী শুরু করেছিল, খবর পেয়ে ও সেখানেই ফ্ল্যাট বুক করল। মা বাবা পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় যাবার আগেই রাজীর মা বিয়ের প্রস্তাবটা দেয়।

সেই প্রথম ও রাজীকে খেয়াল করে দেখে। রঙটা একটু চাপা, মাজা মাজা, তবে চোখ মুখ নাক খুবই সুন্দর, সাবেক দক্ষিণী চেহারায় বাংলার শ্যামল ছোঁয়া। প্রথম আনুষ্ঠানিক পাত্রী দেখার দিনে খোলা রেশম কালো চুলে, কচি কলাপাতা কাঞ্জিভরমে রাজীকে দেখে ওর কেমন যেন পুজোর সময় কলকাতা যাওয়ার পথে ট্রেন থেকে দেখা ভরা বর্ষার পরের মাঠের ধারের শ্যামলিমার কথা মনে হয়েছিল। মনে ঠিক সেইরকম ঘরে ফেরার,বচ্ছরকার পুজোর আনন্দের অনুভব।

রাজী, ভালো নাম রাজেশ্বরী। বিয়ের কিছুদিন পরে ওরা নতুন ফ্ল্যাটে শিফট করে, অর্কর একটা প্রোমোশনও হয়। সব মিলিয়ে ওরা তখন আর মাটিতে নেই, আকাশে উড়ছে। মাঝে মাঝে মা বাবা আসে, এতকালের জায়গা ভুলতে পারেনা। ছেলেমেয়ে ছাড়া কলকাতায় গিয়ে ওদের মন বসেনা। দু বাড়ী মিলে তখন হই হই, সব মিলিয়ে দারুন কাটছিল প্রথম দিন গুলো। রাজী রান্না জানতনা, মা হাতে ধরে শেখায় অর্কর প্রিয় রান্না সব, ইলিশের ভাপা, চিংড়ীর মালাইকারী, আলু পোস্ত।

ওদের বিয়ের দুবছরের মাথায় হঠাৎ বাবা চলে গেলেন। অর্কর কেমন যেন মনে হয় তারপর থেকেই সব কিরকম অন্য রকম হয়ে যেতে থাকল। মাকে একা আত্মীয়স্বজনের ভরসায় রাখা ঠিক হবেনা বলে প্রথমে দিদি নিয়ে গেল ওর কাছে ব্যাঙ্গালোরে। সেখানে কয়েকমাস থাকার পর অর্ক নিয়ে এল এখানে। মা একদম চুপচাপ হয়ে গেছিল, সংসারের কোনো ব্যাপারে থাকতনা। ততদিনে রাজীর বাবামাও কেরালায় চলে গিয়েছিল, ওর ঠাকুমা মারা গেলেন। রাজী এসময় গিয়ে প্রায়ই মা বাবার কাছে কেরালায় থাকছিল, ঠাকুমার অসুখ ও বাবা মাকে ওখানে সেটল করতে সাহায্য করার জন্য। এদিকে অর্ক বাবার চলে যাওয়া,বাড়ী, বিষন্ন মা, এসব ভাবনায় এতই ব্যস্ত ছিল যে নিজের একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিকে একটু অমনযোগী হয়ে পড়েছিল। রাজীর এতদিন বাপের বাড়ী থাকাটা ওর সেসময় সুবিধেজনকই মনে হয়েছিল। মাকে সময় দেওয়া, হুটহাট করে কলকাতা চলে যাওয়া, দিদির সঙ্গে নানা আলোচনায় লম্বা লম্বা ফোনকল, এসব নিয়ে নাহলে হয়ত দাম্পত্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হত।

মা মোটামুটি একটু সামলে নিয়ে, কলকাতায় একা একা থাকাতে অভ্যস্ত হয়ে যেতে, ঐদিকের সমস্যা মিটল যখন তখন অর্ক নিজের ঘরের দিকে তাকাল। হয়ত অনেকদিন মন দেয়নি বলেই ওপরে সব ঠিক থাকলেও ভেতরে ভেতরে কেমন একটা অস্বস্তি, কোথায় যেন তাদের জীবনে পরিবর্তন ঘটে গেছে নীরবে। রাজী একটা প্লে স্কুলে চাকরি নিয়েছে, লাঞ্চে যখন অর্ক বাড়ী আসে, সে তখনও ফেরেনা। একা একাই মাইক্রোতে খাবার গরম করে খায়। খাওয়ার মেনু গুলোও কেমন আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছিল। প্রথমদিকে ধরে নিয়েছিল বাপের বাড়ীতে নতুন রান্না শিখে এক্সপেরিমেন্ট করছে বউ। কিন্তু যত দিন গেল ঐ কেরালার ডিশগুলোই তাদের নিত্য খাবার হয়ে গেল। অর্ক অফিস থেকে দেরী করে ফেরে, মাঝে মাঝেই ট্যুরে বাইরে যায়।

আগে রাজী নিজে গিয়ে মাছ মাংস কিনে আনত। ইদানীং মাছ আসেই না প্রায়। অর্ক আনলেও রাজী রাঁধেনা,খায়না, রান্নার মেয়েকে দিয়ে কোনোরকমে কিছু বানানো হয়। রাজীর মা বাঙালী, ও ছোটোবেলা থেকে বাংলাদেশের খাবারে অভ্যস্ত। অর্কর মায়ের রান্না ওর একসময় ভীষণ পছন্দের ছিল। কিন্তু এখন যেন ওর যা কিছু বাঙালীয়ানা সবেতেই একটা অ্যালার্জী। এসব ছাড়াও নানা অজুহাতে প্রায়ই বাবা মার কাছে চলে যায়।

কিভাবে কী হচ্ছিল অর্ক বুঝতেও পারেনা। সামান্য খাওয়াদাওয়া নিয়ে বা বাপের বাড়ি যাওয়া নিয়ে বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে তার আধুনিকমনস্কতায় বাধে। অর্ক, রাজী দুজনেই বলতে গেলে দিল্লীরই ছেলেমেয়ে। ওদের মধ্যে প্রাদেশিকতার আঁচ তেমন নেই, হিন্দী বলে স্বচ্ছন্দে, পোশাকাআশাকেও এদিককার মতই। ইদানীং রাজীর হাবে ভাবে চালচলনে যেন কেমন দক্ষিণের ছোঁয়া। এসব অনুভব করলেও, অফিসে সে এত ব্যস্ত থাকে, নিজের কেরিয়ার নিয়ে, এর ওপরে বাড়ী নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় বিশেষ থাকেনা। তাই রাজীর এরকম পরিবর্তন দেখলেও সে চুপ করে থাকে। শুধু মা কখনো এলে একটা চাপা টেনশন অনুভব করে। রাজী মায়ের দেখাশোনা সবই ঠিকঠাক করে তবু বোধহয় আগের সেই আন্তরিকতা আর থাকেনা, কেমন যান্ত্রিক সব। তার মা মুখে কোনো কিছু বলেনা, তবু আজকাল আসতে চায়না। জোর করে নিয়ে এলেও দু সপ্তাহের বেশী মাকে রাখা যায়না। অথচ দিদির ওখানে গিয়ে মা মাসের পর মাস থাকে। অর্ক চায় মা কিছুদিন থাকুক, মা থাকলে খাওয়াদাওয়াটা একটু স্বাভাবিক হয়, আগের মত। তবে নিজের জীবনের দুই গুরুত্বপুর্ণ মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে সে এ নিয়ে কিছু বলেনা, দুরে থেকে শান্তি বজায় রাখাই ভালো।

চারবছর হল তাদের বিয়ে হয়েছে। এমনিতে বাইরে থেকে দেখলে সুখের সংসার। বন্ধুরা, প্রতিবেশীরা সবাই বলে, রাম মিলায়ে জোড়ী। রাজী শান্ত, অত্যন্ত সুন্দর ব্যবহার, ঝগড়াঝাঁটী নেই, গোছানো বাড়ী। তবু অর্ক জানে, হয়ত বা রাজীও, যে তাদের মধ্যে কিছু আছে বা কিছু নেই যার জন্য তারা সম্পূর্ণ নয়।

দোকানদারটা অর্ককে দেখলেই মালয়ালামে কথা বলবে, অর্ক হিন্দী বললেও লোকটা উত্তর ওদের ভাষায় দেবে। এই নিয়ে কিছুক্ষণ গোলমাল হয় প্রতিবারেই। রাজী দোকানে এসেই যেন নিজের জায়গায় এসে গেছে এমন একটা ভঙ্গী করে দোকানের একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়ে। এটা সেটা নানা জিনিস নিতে থাকে, আদ্ধেকের নামও জানেনা অর্ক। সে শুধু চাল ডাল তেল নুন মশলা এসব হিসেব করে নেয়। প্রায় তিরিশ চল্লিশ মিনিট লেগে গেল, সব নিয়ে হিসেব করে টাকাপয়সা মেটাতে। দুটো ছেলে মালপত্রের ভারী ভারী ক্যারি ব্যাগ গুলো বয়ে নিয়ে চলল ওর সঙ্গে গাড়ীতে তুলে দিতে। অর্ক যেতে যেতে রাজীকে ডাক দিল। রাজী তখন দোকানের সামনের ফুলওয়ালির কাছে দাঁড়িয়ে মালার দর করছে। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখে ইশারায় ওকে যেতে বলল, সে আসছে। এই এক ঢং জুড়েছে প্রতিমাসে, এক গুচ্ছ মালা কিনে নিয়ে গিয়ে ফ্রিজে রেখে রোজ বিকেলে মাথায় দেবে সাউথের বউ মেয়েদের মতো। অর্কর এই ফুলের গন্ধটা একেবারেই ভালো লাগেনা, কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে, এত উগ্র লাগে। অথচ এখন থেকে কমকরে হপ্তাখানেক তার ঘরের আনাচে কানাচে, বিছানায়, বউয়ের গায়ে এই গন্ধ!

গাড়ীর ডিকিটা মালে ভরে গেল। রাজীর তখনও দেখা নেই। ছেলে দুটোর হাতে দুটো দশটাকার নোট বকশিশ দিয়ে অর্ক গাড়ীতে গিয়ে বসল। কাজ হয়ে যাওয়ার পর এক মুহুর্তও আর তার এই জায়গাটায় থাকতে ভালো লাগছেনা। প্রতিবার রাজী এরকম করে, মালা কিনবে, এদোকান ওদোকানে উঁকি মারবে। এখানে এলে কেমন একটা মিডল ক্লাস গাঁইয়া গাঁইয়া আচরণ করে ও। অথচ রাজী এমনিতে যথেষ্ট স্মার্ট, পার্টি টার্টিতে বা বাইরে হোটেলে গিয়ে যথাযথ ব্যবহার করে, তখন কেউ বলবেনা বাড়ীতে আজকাল এই রাজীর সারা শরীরে নারকেল তেল আর মল্লিকা ফুলের গন্ধ জড়ানো থাকে। তবে অনেক চেষ্টা করেও রাজী রান্নার তেলের জায়গায় নারকেল তেল ঢোকাতে পারেনি, এটাই বাঁচোয়া। এই একটা ব্যাপারে অর্ক প্রচন্ড আপত্তি জানিয়েছে।

প্রায় কুড়ি মিনিট পেরিয়ে গেল, জানালার কাঁচ খুললে একটা বিচ্ছিরি দুর্গন্ধ আসছে পাশের নোংরার স্তুপ থেকে। এদিকে সব বন্ধ করে ভেতরে বসলে অস্বস্তি হচ্ছে। আজ এমনিতেই মেজাজ খারাপ, তারওপর রাজীর এই ব্যবহার। অর্ক মনে মনে একটা গালাগালি করে উঠল কোনো অজানা কারুর উদ্দেশ্যে, আর কোনোদিন সে এখানে আসবেনা। রাজীকে সোজা বলে দেবে

সামনের মাস থেকে অন্যদের মত কাছাকাছি কোথাও থেকে জিনিসপত্র নিতে। ওসব পেঁয়াজ, কচু, কলা, মোটা চাল খেতে হয় কেরালায় গিয়ে খাও। এখানে যেমন আর পাঁচটা লোকে যা খায় তাই খেতে হবে।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল, এবার দুশচিন্তা হচ্ছে। রাজীর কাছে মোবাইল আছে, অর্ক কল করল। কোথায় আটকে রয়েছে এতক্ষণ! রিং হয়ে গেল, কেউ তুলছেনা। মনে পড়ল মোবাইল রাজীর পার্সের ভেতরে, হয়ত শুনতে পাচ্ছেনা বাজারের ভীড়ে, আওয়াজে। অর্ক নেমে এল গাড়ি থেকে, লক করে দরজার হাতলটা টেনে দেখে আবার বাজারের দিকে পা বাড়াল। কপালে বেশ কয়েকটা রেখা ফুটে উঠেছে, আর বিরক্তির নয়, চিন্তার।

এদেশে পুজোর আগে আগে এই সময়টা রাইয়ের সবচেয়ে ভালো লাগে, না ঠান্ডা না গরম, শরতের দিন। এসময় বাইরেটা এত সুন্দর হয়ে ওঠে, রোদ ঝলমল অথচ রোদের আঁচ লাগেনা গায়ে। গাড়ী থেকে নেমে ও আলোকের হাতে ব্যাগটা দিয়ে দিল। আলোক হাসল, রাই এখন কিছুক্ষণ গিয়ে পার্কে বসবে। বাচ্চারা খেলছে, মহিলারা জোট বেঁধে গল্প করছে। আসলে ওপরে নিজেদের ফ্ল্যাটে উঠে গিয়ে একবার ঘরের কাজে লেগে গেলে আর নীচে আসার ফুরসত হবেনা। তাই ও অফিস থেকে ফিরে কিছুক্ষণ নীচে খোলা হাওয়ায় কাটিয়ে তবে ওপরে যায়। আলোক ওপরে গিয়ে টুপাইকে পাঠিয়ে দেবে। যতক্ষন তারা কেউ না ফেরে মেয়ের নীচে এসে খেলার অনুমতি নেই। আলোক তৈরী হয়ে চা টা বানাবে যদি না রান্নার মেয়েটা এসে গিয়ে থাকে। রাই ওপরে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে চা খেয়ে রান্নার মেয়েটার সঙ্গে লাগবে, টুপাই ফিরলে তার হোমওয়র্ক নিয়ে বসবে, নিত্য কর্ম।

এই আধঘন্টা ও একটু ঘাসে পা রেখে দাঁড়িয়ে মহিলাদের গসিপ, বাচ্চাদের হুল্লোড় এসবের মধ্যে সারাদিনের স্ট্রেসটাকে রিলিজ করে ফ্রেশ হতে চেষ্টা করে। মিসেস গুপ্তার কাছে তার বোনের শ্বশুরবাড়ীর গল্প শুনছে এমন সময় টুপাই এসে হাত ধরল,

-"মাম্মা ওপরে যাও এক্ষুনি, বাবা ডাকছে।"

রাই বিরক্ত হল। আলোক জানে ও একটু পরেই যাবে, আবার ডাকাডাকি কেন! মেয়েকে পাত্তা না দিয়ে বলল,

-"ঠিক আছে, তুমি খেলতে যাও। আমি একটু পরে যাচ্ছি।"

মিসেস গুপ্তা গল্পে বাধা পড়ায় একটু বিরক্ত হয়ে ভ্রু কুঁচকে টুপাইয়ের দিকে তাকালো। মেয়ে তাও নাছোড়বান্দা,

-"এক্ষুনি যেতে বলল বাবা, সাততলার আন্টি বসে আছে।"

ও, তারমানে কেউ এসেছে তাই আলোক ডাকছে। সাততলার আন্টি মানে কোন আন্টি জিজ্ঞেস করতে যাবে ততক্ষন বন্ধুদের ডাকে মেয়ে দৌড় দিয়েছে। ওদের ব্লকে প্রতিটা ফ্লোরে পাঁচটা করে ফ্ল্যাট, যে কেউ হতে পারে। মিসেস গুপ্তার কাছে বিদায় নিয়ে ও লিফটের দিকে যায়, আজকের বৈকালিক আড্ডা শুরুতেই ঘেঁটে গেল বলে মুখের ভাবটা একটু অপ্রসন্ন।

সদর দরজাটা খোলা, সাততলার কোন প্রতিবেশিনীর তার ঘরে শুভাগমন হয়েছে, কে কোন দরকারে এইসময় নীচের আড্ডায় না গিয়ে তার কাছে এসেছে ইত্যাদি সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ঢুকে দেখল সামনের কৌচে আলোক বসে, অফিসের ড্রেসেই। পেছন থেকে দেখেই বুঝতে পারল, আলোকের সামনে সোফায় বসে মুনিয়া। মুনিয়া ওদের ওপরের ফ্লোরে থাকে, ওর স্বামী ভাস্কর আগে রাইদের কোলীগ ছিল, এখন বছরখানেক হল অন্য একটা কোম্পানী জয়েন করেছে। একটু চালিয়াৎ গোছের,তাই রাইয়ের ঠিক পোষায় না এদের সঙ্গে। তবু মুনিয়া মাঝেসাঝে আসে, ওর একমাত্র ছেলেকে হস্টেলে রেখে দিয়েছে, বাড়িতে একা সময় কাটেনা। এবারে অনেকদিন পরে এল।

আসলে অনেকদিন ছিলনা, কলকাতায় গেছিল, বোধহয় দুতিনদিন আগে ফিরেছে। ওর মায়ের অসুখ শুনেছিল, রাইয়ের খোঁজ নেওয়াও হয়নি। ওকে ঢুকতে দেখে আলোক উঠে দাঁড়ালো, মুনিয়াও মাথা ঘুরিয়ে তাকালো।

-"আরে মুনিয়া, কবে ফিরলে? মাসিমা কেমন আছেন এখন?"

মুনিয়া হাসি হাসি মুখে বলল, -"পর্শু। মা এখন অনেকটা ভালো। এই বয়সে পা ভাঙা, বুঝতেই পারছ। তাই এত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াবে ভাবিনি আমরা।"

আলোকের দায়িত্ব শেষ, সে ভেতরে ঢুকে গেল। রান্নার মেয়েটা রান্নাঘরে, রাই মুনিয়াকে একটু অপেক্ষা করতে বলে দ্রুত মেয়েটাকে কী কী হবে বুঝিয়ে দিয়ে চা বসাতে বলে তারপর লিভিংরুমে এসে বসল। গুরুতর ব্যাপার আছে বলেই মনে হয়, নাহলে মুনিয়া এতদিন পর নীচের জমাটি আড্ডায় না গিয়ে ওর কাছে এসেছে!

মুনিয়ার চোখ গোল গোল ঘুরছে, সারা বাড়ির যতটা দেখা যাচ্ছে সব দিকে। অনেকদিন পরে এসেছে, নতুন কী কী হয়েছে তার জরীপ করে নিচ্ছে। রাই আসতেই বলল, -"শোনোনা, এই ঘড়িটা নতুন কিনলে? আগে তো দেখিনি। বেশ লাগছে কিন্তু, অ্যান্টিক পিসের মতো।"

-"হ্যাঁ, ঐ মেলা বসেছিল না স্টেডিয়ামে নতুন বছরে, সেখান থেকে নিয়েছি। বাপন কেমন আছে? ওর এবারে ইলেভেন হল না?" বাপন মুনিয়ার ছেলের নাম।

ছেলের নামে মুনিয়া একটু উদাস হয়ে পড়ল। -"হ্যাঁ,ইলেভেন হল। পড়াশোনার খুব চাপ পড়েছে। হস্টেল থেকে কোচিং যাতায়াত করতেও খুব স্ট্রেন পড়ছে। ভাবছি সামনের বছর হস্টেল থেকে নিয়ে এসে মার কাছে রাখব। আমিও মাঝে মাঝে গিয়ে থাকব।"

রাইয়ের এখন খোশগল্পের সময় নেই। মুনিয়া কিজন্য অসময়ে তার বাড়ীতে তা আগে জানতে হবে। কিন্তু আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করাটা অভদ্রতা। কথা ঘুরোতে বলল, -"মুনিয়া, তুমি আজ নীচে যাওনি? আমরা সবাই তো নীচে আড্ডা মারছিলাম।"

কাজের মেয়েটা চা নিয়ে এল। আলোক শোবার ঘরে টিভি খুলে বসেছে, তার চা সেখানেই পাঠিয়ে দিল। মুনিয়া একটু আপত্তি করে শেষে জোরাজোরিতে কাপ তুলে নিল হাতে।

-"আরে আমি নীচেই যাচ্ছিলাম। ভাস্কর পাঠালো তোমার কাছে। তুমি অর্ককে চেন?"

রাই বুঝতে পারলনা, মুনিয়ার বর কেন তাকে ওর কাছে পাঠাবে। কোনো অফিসিয়্যাল ব্যাপার হলে নিজে কেন আসবেনা! তবে মুনিয়াকে দেখে মনে হচ্ছেনা কোনো সিরিয়াস ব্যাপার, ও বেশ গল্পের মুডেই। রাইও তাই একটু এলিয়ে, চায়ে চুমুক দিয়ে বলল,

-"না গো। কে অর্ক? আমাদের অফিসের? তা ভাস্করও এল না কেন?"

-"ভাস্কর বাজারে গেছে, চুলটুল কেটে আসবে,দেরী হয়ে যাবে। অত রাতে তো তোমার বাড়ি আসা ঠিক হবেনা তাই। অর্ক বাঙালী, ভাস্করদের ওখানেই কাজ করে । ওর বউ সাউথ ইন্ডিয়ান, পুজোর সময় দেখোনি? কালো হলেও খুব মিষ্টিমতন মুখটা, দারুন দারুন কাঞ্জিভরম পরে আর ভালো বাংলা বলে। পরে শুনলুম ওর মা নাকি বাঙালী তাই এত ভালো বাংলা বলে।"

রাই এরকম কোনো মেয়েকে মনে করতে পারল না। অর্ককেও সে চেনেনা। সে আর আলোক দুজনেই ছোট থেকে প্রবাসী,বাঙালীয়ানার বাড়াবাড়ি নেই,পুজো টুজোতে যায় এই পর্যন্ত।

মুনিয়াকে এখন বেশী জিজ্ঞেস করলেই সে এককথায় দশটা কথা বলবে। তাই বেশী এদিকসেদিক না করে ও সরাসরি জিজ্ঞেস করে,

-"তা কী হয়েছে সেই অর্কর? আমার কাছে কেন?"

ওর মনে অফিসের চিন্তাটাই আসছে। ভাস্করদের কোম্পানী এই প্রথম নতুন সেক্টরে ঢুকছে, তার জন্য তাদের অফিস থেকে বেশ কিছু লোককে ভালো অফার দিয়ে নিয়ে গেছে। অনেক ব্যাপারে ভাস্করের পুরনো অফিস থেকে কোনো কিছু দরকার হলে সে তার বা আলোকের শরণাপন্ন হয়। রাই বিরক্ত হল, ভাস্কর নিজে না আসতে পারলেও ফোন করতে পারত। মুনিয়াকে পাঠানো মানে সময় নষ্ট। এমনও হতে পারে মুনিয়া নিজেই যেচে ভাস্করের জায়গায় এসেছে, রাইদের হাঁড়ির খবর পায়নি অনেকদিন তাই।

-"অর্কর বউ মানে রাজী আজ দিন পাঁচেক হল নিখোঁজ। দুজনে শান্তিবিহার গিয়েছিল দোকান করতে। ফেরার সময় অর্ক আর বউকে খুঁজে পায়নি।"

রাই এবার ভালো করে উঠে বসল। হাতের কাপটা সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে তাকালো মুনিয়ার দিকে।

-"খুঁজে পায়নি মানে? শান্তিবিহারে গিয়েছিল দোকান করতে, অত দূরে কেন? বউটার অ্যাফেয়ার ট্যাফেয়ার ছিল নাকি,কারো সঙ্গে পালিয়ে যায়নি তো ?"

এতগুলো প্রশ্ন একসাথে শুনে মুনিয়া হেসে ফেলল। -"আরে বললাম না ওর বউ সাউথ ইন্ডিয়ান। শান্তি বিহার তো ওদেরই এলাকা। ওর বউ তো বিয়ের আগে বাবা মার সাথে শান্তিবিহারে থাকত। এখন রিটায়ার করে ওর বাবা দেশে চলে গেছে। ওদিকের কোন সাউথ ইন্ডিয়ান দোকানে ওরা মাসকাবারী দোকান করতে যায় প্রত্যেক মাসে।

ভাস্করের সঙ্গে অর্কর আলাপ অল্পদিনেরই। আমাদের সঙ্গে এমনি পারিবারিক যোগাযোগ খুব একটা নেই। অনেক জুনিয়র, সার্কল আলাদা। ভাস্কর একবার আমার সঙ্গে অফিসের একটা অনুষ্ঠানে অর্ক আর তার বউয়ের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। এই আমাদের পাশের সেক্টরেই থাকে, ঐ নতুন সোস্যাইটী, গার্ডেন সিটীতে। বছর তিনেক হল বোধহয়,নিজেদের কেনা ফ্ল্যাট। কাজেকম্মে আমাদের শপিং কমপ্লেক্সেই আসে তো। দেখা হলে একটা দুটো কথাও বলেছি। এমনিতে তো সবাই হ্যাপী কাপল বলেই জানে, গোপন কিছু থাকলে জানিনা। তবে কাউকে কিছু বলতে শুনিনি কখনো।"

রাই একটু ভাবল। সেই তো, মুনিয়া, শম্পা এদের মত পাবলিককে লুকিয়ে অ্যাফেয়ার চালানো এ এলাকায় অসম্ভব। ওদের চ্যানেলে কোথাও না কোথাও থেকে ধরা পড়ে খবর ছড়াবেই। কিন্তু দোকান করতে গিয়ে ছেলেটার বউ হারিয়ে গেছে বা পালিয়ে গেছে যাই হোক তা তাতে রাইই বা কী করবে? -"তা তুমি আমাকে বলতে এলে কেন? আমি এতে কী করব? পুলিশে খবর দিয়েছে?"

মুনিয়া মুখটাকে সিরিয়াস করে বলে, -"হ্যাঁ, সমস্যা তো সেখানেই। দুদিন ধরে সব জায়গায় খোঁজ করে শেষে পুলিশে খবর দেয়। মেয়েটার বাবামা চলে এসেছে, তারা এসে ছেলেটাকেই দোষ দিচ্ছে। পুলিশের কাছে সেইমত বলেছে, অফিসেও নালিশ করেছে। এখন সবাই অর্ককেই সন্দেহ করছে, এরকম বাজার করতে গিয়ে কেউ নিখোঁজ হয় নাকি! সবার ধারণা অর্ক কিছু লুকোচ্ছে। পুলিশ ওকে শহরের বাইরে যেতে বারণ করে দিয়েছে। রেগুলার হ্যারাস করছে। অর্কর মা এসেছেন, উনি খুব কান্নাকাটি করছেন। ভাস্কর গেছিল ওদের বাড়ি।

ভাস্কর বলছে অর্ক ভালো ছেলে, একটু সিরিয়াস আর অ্যামবিশাস, আর কোনো দোষ নেই। তোমার তো পুলিশের সাথে জানাশোনা আছে, সোস্যাইটীর সবাই জানে। একটু বলে দেখবে।"

রাই বিব্রত হল। শম্পার দৌলতে আগের ঘটনাটা জেনে ফেলে এদিকের সবাই তাকে গোয়েন্দা ও পুলিশের লোক ঠাউরেছে! এদিকে মুশকিল হল তার বন্ধু অফিসার অভিনব বদলি হয়ে চলে গেছে এখান থেকে। ওর সাথে যোগাযোগ অবশ্য আছে কিন্তু এতদুর থেকে ও কিভাবে সাহায্য করবে! তবু একটু কৌতূহল হচ্ছে পুরো ঘটনাটা জানতে। মেয়েটাকে কি দেখেছে ও, কেজানে! হয়ত মুখ দেখলে চিনতে পারবে! পুরো ব্যাপারটা জানতে হবে, আর সেটা ঠিক মুনিয়া বলতে পারবে বলে মনে হয়না।

ঘরের কাজ পড়ে আছে অনেক, বসে গপ্প করলে চলবেনা। তাই ও বলে, -"মুনিয়া, আমার বন্ধু অভি তো এখন এখানে নেই, বদলি হয়ে গেছে। আমি আর পুলিশের কাউকেই সেরকম চিনিনা। তবু তুমি একবার ভাস্কর ফিরলে বোলো আমাকে ফোন করতে।"

কিছুক্ষণ গল্প করে মুনিয়া চলে যেতে রাই জামাকাপড় ছেড়ে ঘরের কাজে লেগে পড়ল। নানা কাজে আর খেয়াল রইলনা মুনিয়ার কথাটা। রাত তখন প্রায় দশটা বাজে। খাওয়াদাওয়া সেরে টিভিতে নিউজ দেখছে দুজনে। টুপাই নিজের ঘরে শুয়ে গল্পের বই পড়ছে। ইন্টারকম বেজে উঠল, আলোক একবার ওর দিকে তাকালো। রাই বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে, ওঠার লক্ষণ নেই। আলোক রাজ্যের বিরক্তি দুচোখে জড়ো করে বসার ঘরে গেল ফোন তুলতে।

-"রাই, ভাস্কর। তোমাকে ডাকছে।" জোরে হাঁক শুনেই রাইয়ের মনে পড়ে গেল সন্ধ্যের কথা। তাই তো, সে মুনিয়াকে বলে দিয়েছিল ভাস্কর যেন ফোন করে।

ফোনের কাছে যেতে যেতে ততক্ষনে আলোক আর ভাস্কর নিজেদের অফিসের গপ্প জুড়ে দিয়েছে। দুমিনিট কথা বলার পর আলোক রাইকে ফোনটা দিল।

হেলো বলতেই ওদিক থেকে ভাস্করের গলা, -"আরে রাই, ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি? এত দেরী হল ফোনে আসতে? নাকি অসময়ে বিরক্ত করলাম?"

হ্যা হ্যা করে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল। রাই ভাস্করের এধরণের কথাকে খুব একটা পাত্তা দেয়না। সোজাসুজি কাজের কথায় এল।

-"ভাস্কর, মুনিয়া ঐ তোমার পরিচিত অর্কর কথা সব বলল। ও তো দেখলাম খুব বেশী কিছু জানেনা। আমি পুরো ব্যাপারটা জানতে চাই, এমনিই ইন্টারেস্টিং লাগছে। তবে পুলিশের ব্যাপারে সাহায্য কিছু করতে পারবনা। আমার বন্ধু তো আর এখানে নেই, গোরখপুরে বদলি হয়ে গেছে।"

ভাস্কর একটু হতাশ ভঙ্গী করল। -"কিছু করতে পারলে ভালো হত। ছেলেটা ভালই, একটু ফেঁসে গেছে। এসব ক্ষেত্রে যা হয়, সবাই ওকেই সন্দেহ করছে।"

-‘‘তা ওদের মধ্যে কি কোনো গন্ডগোল চলছিল, কিছু জানো?"

-"যতদুর জানি সেরকম কিছুই না। আসলে সমস্যাটা সেখানেই। ওর বন্ধু, প্রতিবেশী সবাই বলছে ওদের মধ্যে কোনো গন্ডগোল ছিল না, অন্তত থাকলেও কেউ কিছু জানতে পারেনি। মেয়েটা খুব ভাল ছিল, নরমসরম ভদ্র, বাচ্চা মেয়ে। বছর চারেকের মত বিয়ে হয়েছে, দুই পরিবারে অনেকদিনের জানাশোনা। অর্কর মাও কিছু জানেন না, উনি তো মাঝে মাঝে এসে থাকতেন।"

-"তাহলে যে মুনিয়া বলল মেয়েটার মাবাবা অর্ককে দুষছে?"

-"সেটা খুব একটা সিরিয়াস কিছু না। এমনিতে ওরাও কোনো গন্ডগোলের কথা জানেনা। তবে একমাত্র মেয়ে, এভাবে নিখোঁজ, স্বভাবতই তাদের মাথার ঠিক নেই। আমি পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ আনতে পারেনি, সবই ভেগ। দোকানদার পুলিশের কাছে বলেছে অর্ককে মাল দেওয়ার কথা, রাজীও সঙ্গে ছিল। দোকানের দুটো ছেলে অর্কর সঙ্গে গিয়ে মাল তুলেছে গাড়ীতে। এর কিছুক্ষণ পরে অর্ক এসে দোকানে রাজীর খোঁজ করে, তারপরে সামনের ফুলওয়ালিকে জিজ্ঞেস করে। অর্ক যখন মাল নিয়ে গাড়ীর দিকে যাচ্ছিল, রাজী তখন ফুলবিক্রেতা মহিলার সামনে দাঁড়িয়ে মালার দর করছিল। ফুলওয়ালি অবশ্য কিছু বলতে পারেনি, তার কাছে সন্ধ্যে থেকে অনেক মেয়েই ভীড় করেছে, সে অর্ককে চেনেনা। এরপর ওখানে আশেপাশের দোকান গুলোতে অর্ক খুঁজেছে। পুলিশ খোঁজখবর করে জেনেছে।"

-"অর্ক সেই রাতেই কেন পুলিশকে খবর দিলনা?"

ভাস্কর একটু ভাবল, তারপরে বলল, -" আমি ঠিক জেরা করিনি অর্ককে, আমার সে এলেমও নেই। পুলিশ ওকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। আমি অর্ককে এমনি চিনি, খুব ক্লোজ না। আমার তো ঐ অফিসে বেশীদিন হয়নি। অফিসে দেখাসাক্ষাত হলে একটু কথা, ক্যান্টিনে কখনো বসেছি একসাথে চা নিয়ে। তবে বিদেশে বাঙালী ঝামেলায় পড়েছে, একটু দেখতে তো হয়, আবার অফিসেরই ছেলে। খুব ভেঙে পড়েছে, একে বউয়ের কী হল সে নিয়ে দুঃশ্চিন্তা তারওপরে এই পুলিশের ঝামেলা। পুলিশ ঠিক কী ভাবছে, সেটাও যদি পরিস্কার হত তাহলে ওদের সন্দেহটা দুর করার চেষ্টা করা যেত। রাজী কে আমি দেখেছি দু চারটে অফিসের ফাংশানে, পার্টিতে। খুবই ভালো লেগেছে, দুজনে চমৎকার মিলমিশ। এই তো কবছর বিয়ে হয়েছে, আনন্দ করার বয়স সব।"

রাই একটু অন্যমনস্ক, কী যেন ভাবছে ভাস্করের কথার মাঝেই। শেষ বাক্যটা ভাস্কর জোরে বলতে হুঁশ হল।

-"মেয়েটার নাম রাজী? খুব সুন্দর নাম তো।"

ভাস্কর হাসল,

-"আসলে রাজেশ্বরী, ডাকে সব রাজী বলে। মেয়েটাও সুন্দর, ভালোয় ভালোয় ফিরলে বাঁচি। পুলিশের উচিৎ অর্ককে ছেড়ে আগে মেয়েটার হদিশ করা।"

রাই আর কিছু বলেনা, ভাস্করকে কোনো আশ্বাসই দিতে পারেনা। অভি আশেপাশে কোথাও থাকলে তবু নাহয় চেষ্টা করা যেত। ফোন রেখে শুতে গেল যখন আলোক নাক ডাকাচ্ছিল। টিভি বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুতে যাবে, আলোক জেগে গেল।

– "কেসটা কী? ভাস্কর আবার কী ঝামেলা পাকাচ্ছে?"

রাই ওকে সব কথা বলল,

– "তুমি চেন এই অর্ককে?"

আলোক ঘাড় নেড়ে বলল,

– "তবে কেসটা বেশ মিস্টিরিয়াস তো। ধরা গেল মেয়েটা কোনো প্রাক্তনের সাথে ভেগেছে, কিন্তু ব্যাকড্রপটা এমন চুজ করল কেন? শান্তিবিহারের ভীড় বাজার! অর্ক তো ট্যুরে যায়, অফিসেও অনেকক্ষন থাকে। সেইসময় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারত। অথবা বাপের বাড়ি যাবার নাম করে বেরিয়ে যেতে পারত। ইন ফ্যাক্ট, এভাবে বাজার থেকে গায়েব হওয়া তো রিস্কের। অর্ক ওকে একা নাও ছাড়তে পারত। ওর সঙ্গে সঙ্গে থেকে ওকে নিয়েই গাড়ী অবধি যেতে পারত। এতো একটা চান্সের ব্যাপার হয়ে গেল।"

রাই ও আলোকের বিশ্লেষণে সায় দিল।

– "ভাস্কর খুব কিছু জানেনা। পুলিশ কী ভাবছে জানতে পারলে হত! আমি শান্তিবিহারের বাজার দেখেছি। সেখান থেকে ঐ ভর সন্ধ্যেয় ভীড়ের মাঝে মেয়েটাকে কেউ তুলে নিয়ে যাবে, এটাও খুব আনলাইকলি। মেয়েটা নিজের ইচ্ছেয় হারানোর ব্যাপারে তোমার যুক্তিগুলো আছে। পাঁচদিন হয়ে গেছে, মেয়েটা নিজে গেলে বাবা মার সাথে যোগাযোগ করবে না?"

আলোক বিছানায় উঠে বসল,

– "এমন তো নয়, ওর বাবা মা সব জানে। ছেলেটাকে প্ল্যান করে হ্যারাস করা হচ্ছে। তুমি এক কাজ কর না, অভিকে একবার ফোন কর। যতই হোক পুলিশের বড় অফিসার, এদিকে ছিল তিনবছর। চেনাশোনা নিশ্চয়ই আছে। ভেতরের ব্যাপারটা জেনে নিয়ে তোমাকে জানাতে পারবে।"

কথাটা মনে ধরল রাইয়ের। অভিরা এখান থেকে চলে যাওয়ার পর প্রথম দিকে খুবই ফোন হত। এখন একটু কমে এসেছে, তাও হয় রেনুর সাথে। ওখানে অভি খুবই ব্যস্ত, ক্রাইম খুব বেশী, বিহার নেপাল বর্ডার কাছাকাছি। তবু একবার চেষ্টা করতে দোষ কী!

সকালের হাওয়াটা বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা, গা শিরশির করে উঠল রমার, পায়ের দিকে রাখা চাদরটা টেনে গায়ে জড়ালেন। রাতে কদিনই ঘুম হচ্ছেনা ঠিক মত। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন সাড়ে পাঁচটা বাজে। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর আর ইচ্ছে করলনা। উঠে পড়লে, পায়ে পায়ে হল পেরিয়ে বারান্দায় দিকের দরজাটা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালে। ভোরের আকাশটা কী সুন্দর লাগছে, চারিদিক কী শান্ত। এমন একটা সকালে নিস্তব্ধ এই বাড়ী দেখলে কেউ বুঝতেই পারবেনা এখানকার বাসিন্দাদের মনে উথালপাথাল সমুদ্রের ঝড়। মনে পড়তেই মাথার মধ্যে কেমন করে উঠল, রেলিং ধরে টাল সামলালে, ঝর ঝর করে দুচোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এল। কোথায় যে গেল মেয়েটা! সবাইকে কাঁদিয়ে এভাবে লুকোচুরি খেলছে কেন, কেন!

দুটো শক্ত হাত পিছন থেকে সবলে জড়িয়ে ধরল রমাকে।

-"মা, প্লিজ তুমি আবার এমন করছ? এবারে কিন্তু তোমাকে ব্যাঙ্গালোরে পাঠিয়ে দেব। এখানে এভাবে থাকলে তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে।"

ছেলের বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন আস্তে আস্তে। চোখ মুছে বললেন,

-"তুই উঠে পড়েছিস? কিছু ভাবতে হবেনা, আমি ঠিক আছি রে। যাই চা বসাই।"

অর্ক আর কিছু বলল না। মাকে ছেড়ে লিভিং রুমে গিয়ে বসল, কাগজ আসেনি এখনো। একটা ম্যাগাজিন তুলে নিল সেন্টার টেবিল থেকে। মা এল চা নিয়ে।

-"কাল রাতে জিনুর সঙ্গে কী কথা হল রে? সুজনের কোন আত্মীয় যে কলকাতা পুলিশে আছে, কিছু যোগাযোগ করা গেল তার সঙ্গে।"

অর্ক একটু ভাবল। মা দিনরাত এইসব নিয়ে চিন্তা করে চলেছে, এটা ঠিক নয়। এমনিতেই বাবা চলে যাবার পর থেকে মা মনমরা হয়ে থাকে, তারওপর এই ব্যাপার। সে একটু হাল্কা সুরে বলল,

-"কলকাতা পুলিশের লোককে এদিককার পুলিশ পাত্তা দেবে কেন! ও আমি সুজনদাকে বারণ করে দিয়েছি কিছু বলতে। দিদি পরের সপ্তাহে আসছে। ওর এক বন্ধু টাইমসএ জার্নালিস্ট। তার সঙ্গে প্রাথমিক কথা বলেছে। এসে দেখা করবে। পুলিশ রাজীকে না খুঁজে যদি আমাদেরই হয়রান করতে থাকে তাহলে কাগজে নিউজ করার চেষ্টা করতে হবে। অফিসের ভাস্করদা এসেছিল না? ওর এক পরিচিতা আছে এখানেই, তারও নাকি পুলিশে জানাশোনা আছে। ভাস্করদা বলছিল ভদ্রমহিলা ডিটেকশন করে কেস সলভও করেছে। রাজীকে খোঁজার জন্য ওর সাহায্য নেওয়ার কথা বলছিল।"

মা একটু আনমনা হয়ে বলল,

-"শুভা আর গিরীশ যে এরকম অবুঝ হবে শেষমেশ আমি ভাবতেও পারিনি। শুভাকে আমি বোনের মত দেখতাম। ওর অনুরোধেই রাজীকে বউ করি, নাহলে বাঙালী মেয়ের কি অভাব পড়ে গেছিল! ওরা কী করে ভাবল তুই রাজীর ক্ষতি

করেছিস? আমি তো জানি তুই কিরকম সহ্য করিস। রাজীর ইদানীংকার ব্যবহার যা হয়েছিল, আমার ছেলে বলে সব সয়েছে। ওরা সেসবের খবর রাখেনা, নিজের মেয়ের দোষ দেখতে পেল না এখন তোকে দুষতে এসেছে।"

অর্ক উত্তর করল না। বাইরে কাগজ ফেলার শব্দ হল। ও উঠে গিয়ে কাগজটা নিয়ে এল। মা খালি চায়ের কাপ নিয়ে রান্নাঘরে রাখতে গেল। সাড়ে ছটা বেজে গেছে। একটু পরেই কাজের মেয়ে এসে যাবে। অর্কর চোখ গেল পুজোর জায়গাটার দিকে। সকালে স্কুল থাকত বলে রাজীর এতক্ষণে রেডি হয়ে পুজো টুজো সারা হয়ে যেত। অর্ক যখন ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপ আর কাগজ নিয়ে বসত তখন সারা বাড়ীময় মাইসোর ধুপের গন্ধের সাথে মিশত প্রদীপের তেলের সুবাস। এখন মা সারাদিন বাড়িতে, তাই সে অফিস গেলে ধীরেসুস্থে চানটান করে পুজো করে, দেরীতে। ভোরের সেই পুজোর গন্ধ, একটা কেমন পবিত্র চারধার, রাজীর খোলা চুলের গিঁট, সে মিস করছে, হ্যাঁ ভীষণ মিস করছে!

কাগজ আদ্যোপান্ত শেষ করে ঘড়ির দিকে তাকালো, চানের সময় হয়ে গেছে। মা কাজের মেয়েটাকে নিয়ে রান্নাঘরে ব্রেকফাস্ট তৈরীতে ব্যস্ত। উঠতে যাবে এমন সময় মোবাইল বেজে উঠল। ভাস্করের ফোন। কথাটথা বলে চানে ঢুকছে মা এল।

-"কার ফোন এল রে?"

মা এখন ফোন এলেই উৎকন্ঠিত হয়ে পড়ে।

-"ভাস্করদার।"

একটু শান্তি, ডাইনিং টেবিলে রুটির ক্যাসারোল রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করল,

-"কী বলল?"

অর্ক একবার ভাবল মাকে বলবে কিনা। তারপরে মনস্থির করে বলে,

-"মা, ঐ ভদ্রমহিলার কথা বলেছিলাম, ভাস্করদার চেনা, ওর আগের অফিসের। উনি হয়ত আজকালের মধ্যে বাড়ি আসবেন। পুরো ব্যাপারটা আমার বা আমাদের মুখে শুনতে চান।"

মুখ দেখে মনে হল মার ঠিক ব্যাপারটা বোধগম্য হচ্ছেনা। অর্ক আর না দাঁড়িয়ে চানে ঢুকে গেল। শাওয়ারের ধারার নীচে দাঁড়িয়ে শূণ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সামনের দেওয়ালের ব্লু টাইলসের দিকে। সেই কী সব বুঝতে পারছে? কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে তার জীবনে এসব!

আজ কাজের ফাঁকে ফাঁকে শুধুই ঘড়ি দেখছে রাই। আলোক কাগজ পড়তে পড়তে একবার মুখ তুলে তার হাবভাব দেখে হেসে ফেলল।

-"কেসটা কী? তুমি প্রাণের বন্ধুকে ফোন করবে তা এত সময় দেখার কী আছে, এখুনি কর।"

রাই ধরা পড়ে গিয়ে হেসে ফেলল। তারপরে সোফায় বসে মোবাইলের বাটনে চাপ দিল। একবারেই লেগে গেল লাইন, দুতিনবার রিং হয়ে যাবার পর রাই কেটে দিল।

-"কে জানে, হয়ত কাজের চাপে ঘুমোতে দেরী হয়েছে অথবা সকালে উঠেই কোথাও কারো পেছনে তাড়া করেছে। এভাবে সাতসকালে কাজের লোককে ফোন করে বিরক্ত করতে আমার খুব অস্বস্তি হয়।"

একথার জবাবে আলোক মজা করে কী একটা বলতে যাবে, ফোন বেজে উঠল। অভির ফোন। রাই একগাল হেসে ফোন তুলে নিল।

-"হেলো, তুই কোথায়? বাড়িতে?"

অভিকে বেশ চিন্তিত শোনাল, এত সকালে বন্ধুর ফোন পেয়ে।

-"কিরে কী ব্যাপার? হঠাৎ এত সকালে ফোন করলি যে? সব ঠিক আছে তো?"

রাই বন্ধুকে আশ্বস্ত করে। সবাই ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। চিন্তা দুর হলে অভির সেই পরিচিত হাসি, সাতসকালে আশাতীতভাবে রাইয়ের গলা শুনে মেজাজ খুশ! কিছুক্ষণ এদিক ওদিক কথা হল। একবার ফোন আলোকও নিল। সব শেষে রাই অভিকে অর্কর কথা বলল। সবকথা শুনে অভি প্রথমে একটু মজা করল। সে নেই তবু রাইয়ের মাথায় গোয়েন্দাগিরির ভুত এখনও রয়ে গেছে। ঠাট্টার মাঝেও কিন্তু পুলিশী মাথা সজাগ।

-"কোথায় হয়েছে বললি, শান্তিবিহারে? তা কেসটা কারা দেখছে, তোদের ওখানকার থানা না শান্তিবিহার?"

রাই এতসব জানেনা, ভাস্করের কাছে এসব বিশদ জানা হয়নি। অভি একটু ভেবে বলল,

-"ঠিক আছে। আমি এক কাজ করছি, ভার্মাকে ফোন করছি। ভার্মা এখন তোদের ওখানকার থানা ইন-চার্জ, তোকে ও চেনে। যদি ওদের কেস নাও হয় তবু ও খোঁজখবর নিয়ে তোকে জানাবে। ওতো তোর খুব ফ্যানও, অসুবিধে হবেনা।"

রাই এবার হাত কামড়ালো। এই বুদ্ধি নিয়ে ও গোয়েন্দাগিরি করবে! ভার্মার কথাটা ওর মনেই আসেনি। ওর জানা ছিলনা যে ভার্মা এখন এখানে ইন-চার্জ। অবশ্য ফোন নাম্বারও নেই ওর কাছে, অভি দেবে। অভির কাছ থেকে ভার্মার ফোন নাম্বারটা নিয়ে নিল। তবু ও অভিকে অনুরোধ করল ভার্মার সঙ্গে কথা বলতে, যতই হোক অভি ভার্মার সিনিয়র, তার কথার ওজন বেশী।

অভির সঙ্গে কথা বলে মেজাজ তর হয়ে ফটাফট কাজকম্ম সেরে নিয়ে অফিস যাবার জন্য তৈরী হয়ে নিল। রাস্তায় যেতে যেতে তার একটা কথা মনে হল, এতদিন হয়ে গেছে, এবিষয়ে কোন আলোচনা শোনেনি কেন কে জানে! গার্ডেন সিটীতে তো তাদের অফিসের অনেকে আছে, বাঙালীও আছে, আর এরকম গসিপ তো হাওয়ায় ওড়ে। আলোককে বলতে সে বলল,

-"একেবারে যে কানাঘুষো হচ্ছেনা তা বোধহয় নয়। ঐদিন ক্যান্টিনে গার্ডেন সিটীর বাসুদা এই নিয়েই কী সব বলছিল। আমি অন্য টেবিলে ছিলাম, ঠিক কান করিনি। এখন মনে পড়ল।"

বিকেল চারটে বাজে তখন। একটা ফাইলে ডুবে আছে, মোবাইল বেজে উঠল। তাকিয়ে দেখে অচেনা নাম্বার,ল্যান্ডলাইনের। এরকম সচরাচর ব্যাঙ্ক, ক্রেডিট কার্ড এসবের ফোন হয়। কাজের সময় বিরক্ত হল, কাটতে গিয়েও কী ভেবে তুলল ফোনটা রাই, চোখ ফাইলের পাতায়।

-"ম্যাডাম, নমস্তে। ভার্মা বলছি, ভাল আছেন তো?"

ব্যস, রাইয়ের মন একধাক্কায় ফাইল থেকে বেরিয়ে এল। ভাগ্যিস ফোনটা কাটে নি!

-"ভার্মা, কেমন আছেন আপনি? খুব ভালো লাগছে আপনার ফোন পেয়ে।"

-"গুপ্তা সাব ফোন করেছিলেন, আপনার নাম্বার দিলেন। আপনি মিসেস রাজেশ্বরী ব্যানার্জীর নিখোঁজ হওয়ার কেসটা নিয়ে ইন্টারেস্টেড বললেন।"

অর্করা তাহলে ব্যানার্জী। রাই জিভ কাটল, এটাও সে জানতনা।

-"আসলে ওর হাজব্যান্ডের কোলীগ আমাদের খুব বন্ধু, এছাড়া কাছেই পাশের সেক্টরে থাকে ওরা। তাই একটু ইন্টারেস্ট নিচ্ছি আর কি। যদি কোনো অসুবিধে না থাকে, আপনি যা জানেন, মানে পুলিশে যা ব্যবস্থা নিয়েছে এখনও অবধি, এসব ব্যাপারে একটু জানা গেলে ভালো হত।"

ভার্মা একটু সময় নিল পরের কথাটা বলতে।

-"এমনিতে ম্যাডাম আমার কাছেই কেসটা আছে। ভদ্রলোক এই থানাতেই এফ আই আর করে। তবে যেহেতু ঘটনাটা শান্তিবিহারে ঘটেছে, শুধু যে থানা আলাদা তাই নয়, অন্য রাজ্য, আমাদের ওদের সঙ্গে মিলে কাজ করতে হচ্ছে। আর সেটাই এ কেসে সমস্যা হয়ে গেছে। ওরা খুব একটা কোঅপারেট করছেনা, যদিও এমনি সামনে ভালোই ব্যবহার করছে, কমপ্লেন করার মত নয়। মহিলার বাবা মাও আবার ঐ থানায় অভিযোগ করেছে তাদের মেয়ে নিখোঁজ বলে। ওরা নাকি জামাইকেই সন্দেহ করছে, জামাইয়ের অত্যাচারে মেয়ে চলে গেছে বলছে। সব মিলিয়ে ব্যাপারটায় বেশ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। তবে আমি যা জানি তা আপনাকে বলতে কোনো অসুবিধে নেই।"

রাই দ্রুত চিন্তা করল, ভার্মার সাথে দেখা করা দরকার, ফোনে সব কথা হয় না।

-"আপনার কখন সুবিধে হবে, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করে নেব?" সে জিজ্ঞেস করল ভার্মাকে।

তাই শুনে ভার্মা একটু ইতস্তত করতে লাগল,

-"আপনি থানায় আসবেন ম্যাডাম, অসুবিধে হবে আপনার? তাছাড়া আমার এভাবে টাইম দেওয়া একটু রিস্কের, হঠাৎ কোনো জরুরী তলব এসে গেলে। তারচেয়ে আমি আপনার বাড়ি চিনি, সময় করে চলে যাব কালপরশুর মধ্যে। যাওয়ার আগে ফোন করে নেব,যদি আপনি ব্যস্ত থাকেন।"

উত্তম প্রস্তাব, এর থেকে ভালো কিছুই হয়না। এমনিতেও অভি এখানে নেই, এখন থানায় যেতে রাইয়ের খুব একটা ইচ্ছে ছিলনা।

এবার পুলিশের সঙ্গে কথা বলার আগে অর্কদের সঙ্গে দেখা করবে না পরে সেটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে কাজে মন দিল।

অর্ক ঘরে ঢুকে সোফায় বসা মহিলার দিকে তাকালো। তার চোখে নিজের অজান্তেই বোধহয় একটা অবিশ্বাসের দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল, রাই সে দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। রাইয়ের চেহারা ছোটখাটো, নরমসরম মায়াবী। সন্দেহ স্বাভাবিক, দুই থানার বাঘা বাঘা পুলিশেরা এখনও কিছু করতে পারলনা আর এই মহিলা নাকি রাজীকে খুঁজে বার করবে!

ভাস্কর আগেই ফোনে বলে দিয়েছিল। রাই একাই এসেছে, তার বাড়ি থেকে হাঁটাপথ। রমার এক দেখাতেই মেয়েটিকে ভালো লেগে গেছিল। চা আর পাটিসাপটা নিয়ে দুজনে বেশ গল্পে মেতে গেছে,দেখে মনে হল অর্কর। কারোর সঙ্গে কথা বলতে পেরে মায়ের মুখচোখ অনেক স্বাভাবিক, অর্ক খুশী হল।

অর্ককে নিজের পরিচয় দিল, একটু গল্প হল, অফিস ইত্যাদি নিয়ে টুকটাক কথা। রমা ছেলের জন্য চা বসাতে গেলেন। অর্ক ওর অনুমতি নিয়ে পোষাক পাল্টাতে ভেতরে গেল।

রাই উঠে একটু ঘুরে ঘুরে আশপাশ দেখতে থাকল। ছিমছাম সাজানো ফ্ল্যাট, বসার ঘরের একপাশে পুজোর জায়গা, ঘন্টা, বড় পিতলের প্রদীপ, দক্ষিণের স্টাইলে সাজানো। সাইড টেবিলে অর্ক আর রাজীর যুগল ফোটো ফ্রেমে। সত্যিই খুব সুইট জোড়ী, মেয়েটার মুখটা কী মিষ্টি!

অর্কর মায়ের সঙ্গে ওর কথা হয়ে গেছিল। সবাই যা বাইরে থেকে দেখে তা যে পুরোপুরি সত্যি নয়, সেরকম একটা আঁচ সে পেয়ে গেছে। উনিও ঠিক জানেননা কী হয়েছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তবে রাজীর মধ্যে ইদানীং অনেক পরিবর্তন এসেছিল। সবকিছুতে বাড়াবাড়ি রকমের গোঁড়া মালয়ালীর মত ব্যবহার করত এ অর্কই বলেছে মাকে। রমাও দেখেছেন, খাওয়াদাওয়া, আচার ব্যবহারে রাজীর গোঁড়ামি বেড়ে গিয়েছিল। রাজীর বাবার বাড়ি আচারনিষ্ঠ ব্রাক্ষণ পরিবার, আমিষ চলেনা, যদিও ওর বাবা মা সবই খেত এখানে থাকাকালীন, এখন দেশে গিয়ে হয়ত খায়না। রাজী মাছ মাংস খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, চাইত অর্কও না খাক। অর্কর খুব অসুবিধে হচ্ছিল। রমার খুবই খারাপ লাগত তবু কিছু বলতে পারতেন না, নিজেকেই দোষী মনে হত। ইদানীং এও মনে হত যে রাজীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে না দিলেই হত। ওর ঠাকুমা খুবই গোঁড়া দক্ষিণী ছিলেন, রাজীর মাকে উনি কোনোদিনই ঠিক মেনে নেন নি। একমাত্র ছেলের মেয়ে, তাই রাজীর প্রতি অবশ্য স্নেহের কমতি ছিলনা। তবু তার বাঙালীর সঙ্গে বিয়েতে উনি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এসব জেনেও রমা বিয়েতে রাজী হয়েছিলেন এই ভেবে যে যতই হোক বাঙালী মায়ের মেয়ে, অর্ধেকটা তো আছেই বাকীটা ওদের বাড়িতে এসে হয়ে যাবে। কিন্তু ও যে ওর মায়ের মেয়ে না হয়ে হঠাৎ করে এরকম ঠাকুমার মত ব্যবহার শুরু করবে রমা কল্পনাও করেন নি!

রাই একটু চিন্তা করে, আপাতদৃষ্টিতে সকলের কাছে ব্যাপারটা সেরকম কিছু না মনে হলেও, ভাববার মত বিষয়। চারবছর বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামীর বাড়ির ধরনধারনে অসুবিধে হলে সে তো প্রথম থেকেই হবে। আড়াই তিনবছর সবকিছু মানিয়ে থাকার পরে হঠাৎ কেন এ বিদ্রোহ! এছাড়া, মেয়ে দেখতে সুন্দর, মোটামুটি অবস্থাপন্ন বাপমায়ের একমাত্র মেয়ে, সেরকম বুঝলে সেতো এরকম একটা ফ্যামিলিতে বিয়ে নাই করতে পারত।

যে যাই বলুক কিছু একটা হয়েছে, কোনো ঘটনা,যার জন্য মেয়েটার এ পরিবর্তন।

অর্ক এল, পাজামা পাঞ্জাবি পরে বেশ দেখাচ্ছে। রমা চা নিয়ে এলেন,

-"রাই, তুমি আর একটু নেবে চা, আধ কাপ?"

রাই বারণ করল, সে বেশী চা খায়না। ওদের দুজনকে কথা বলতে দিয়ে রমা গেলেন সন্ধ্যে দিতে।

ভনিতা না করে সরাসরি প্রসঙ্গে এল রাই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেদিন সন্ধ্যের কথা জেনে নিল অর্কর কাছ থেকে।

-"তোমরা তো প্রতিমাসে যেতে দোকান করতে, তা প্রতিমাসেই কি রাজী ফুলের মালা কিনত দোকানের পরে?"

-"হ্যাঁ, মালা প্রতিমাসে কিনত, বেশ অনেকগুলো, বাড়ি এসে ফ্রিজে রেখে দিত।"

-"আচ্ছা অর্ক, তুমি সেদিন রাতেই কেন পুলিশে গেলেনা? দুদিন অপেক্ষা করলে কেন? তোমার মা আমাকে বলেছেন রাই ইদানীং বদলে গিয়েছিল, আচার বিচারে বাবার দেশের হয়ে উঠেছিল। অবশ্য সেটা এমনিতে এমন কিছু গুরুতর অপরাধ নয়। তবু এনিয়ে কি তোমাদের মধ্যে অশান্তি হচ্ছিল? সেইদিন বিশেষ কিছু সমস্যা হয়েছিল, ঝগড়াঝাঁটি?"

অর্ক একটু গম্ভীর হয়ে গেল, খানিক চুপ। হয়ত ভাবছিল কতটা কি বলবে। রাই অপেক্ষায় নীরব।

-"মার কাছে যা শুনেছেন মোটামুটি ঠিক। তবে আসলে আপনি যা বললেন তাই, এটা এমন কিছু গুরুতর অপরাধ নয়। মায়ের বয়স হয়েছে, বাবা মারা গেছেন বেশী দিন হয়নি, অল্পতেই আপসেট হয়ে পড়ে। রাজীর বাবামা কেরালা শিফট হয়েছেন ওর বাবা রিটায়ার করার পরে। রাজী তারপরেই বেশ কিছুদিন করে কয়েকবার গিয়ে ওদের কাছে থেকে আসে। ওখানে ও নানারকম ওদেশীয় রান্নাবান্না, আচার ইত্যাদির সঙ্গে এই প্রথম বড় হওয়ার পর ভালো করে পরিচিত হয়, আত্মীয়স্বজনের সাথেও। হয়ত ওর সেসব ভালো লাগে, এখানে ফিরে ও আমাদের সংসারে সেসব চালু করতে চায়। হ্যাঁ,

আমার অসুবিধে হয়েছে, এনিয়ে কথা কাটাকাটিও হয়েছে কয়েকবার। তবে সিরিয়াস কিছু নয়। আমি এটাকে ওর সাময়িক খেয়াল বলেই মনে করেছি, কিছুদিন পরে আপসেই ঠিক হয়ে যেত। সেইজন্যেই আমিও ওর কথামত ওকে শান্তিবিহারের দোকানে নিয়ে যেতাম। যদি আমি জোর দিয়ে বারণ করতাম রাজী হয়ত মেনে নিত, আমি তা চাইনি।"

রাই দেখল অর্কর এক্সপ্ল্যানেশন যথেষ্ট ফেয়ার। ও এ নিয়ে আর কিছু বলল না।

-"আর পুলিশের ব্যাপারটা? দুদিন পরে গেলে কেন?"

-"দিদি, আমি আপনাকে দিদিই বলছি, আমি অনেক ছোট। আসলে রাজীর মধ্যে অনেক বাচ্চা বাচ্চা ব্যাপার আছে। এমনি আমার মা বা বাইরের কারোর সামনে ও খুব দায়িত্বশীল দেখাত, কিন্তু আমার সঙ্গে একান্তে ও একটু আদুরে ইমম্যাচিওর ধরণের ব্যবহার করত মাঝে মাঝে। বাবামায়ের খুবই আদরের একমাত্র মেয়ে তো। আমার কেমন মনে হচ্ছিল ওর হয়ত পুরনো জায়গায় গিয়ে মন কেমন করেছে মাবাবার জন্যে। আসলে বিয়ের পরেও অনেকদিন ওর মা বাবা তো এখানেই ছিল, কাছাকাছি । ওঁরা পাকাপাকিভাবে কেরালা চলে যাওয়ার পর থেকেই রাজী ওদেরকে খুব মিস করে, মন খারাপ করে। ইদানীং ওর ঠাকুমার অসুখের সময় থেকেই খুব ঘন ঘন যাচ্ছিল কেরালায়। তাই ভেবেছিলাম যা ছেলেমানুষ, স্টেশন খুব বেশী দুরে নয়, রাত্রে ঐ সময় একটা ট্রেনও আছে, হয়ত স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চড়ে বসেছে। টাকাপয়সা ওর পার্সে সবসময় ভালোই থাকত, সেদিক থেকে অসুবিধে নেই।

কিছুদিন আগেই ফিরেছে, এক্ষুনি আবার যাবার কথা আমায় বলতে পারেনা। আমি এই কারণেই অপেক্ষা করেছিলাম, ওর বাবা মাকেও জানাইনি, পুলিশকেও নয়। দুদিন পরে ঐদিনের ট্রেন পৌঁছনোর খবর নিয়ে তারপরে ওর বাড়ীতে ফোন করেছি। ওরা যখন বলল ওখানে যায়নি, তখন আর দেরী করিনি পুলিশে খবর দিয়েছি, সবাইকে খবর দিয়েছি। হয়ত ভুল করেছি। হয়ত কেন, এখন মনে হয় ভুলই করেছি। ওর বাবা মা পুলিশ সবাই আমাকে ভুল বুঝছে। আসলে রাজী নিজে এভাবে আর কোথাও চলে যাবে বা ঐ ভীড় থেকে কেউ ওকে তুলে নিয়ে যাবে এ সম্ভাবনা আমার মাথাতেই আসেনি। অন্য কারোর সাথে এমনটা হলে হয়ত আমি বিশ্বাসই করতে পারতাম না।"

এ পর্যন্ত বলে অর্ক মাথা নীচু করে বসে রইল। রাই কী বলবে ভেবে পেলনা। ওর ভাই নেই, শুনেছে অর্কর এক দিদি আছে। খুবই খারাপ লাগছিল। তবু রাজীর বাবা মার জন্য মনখারাপ ও হুট করে এভাবে ট্রেনে চড়ে বসার সম্ভাবনার ব্যাপারে অর্কর যুক্তিটা সেরকম জোরালো মনে হলনা। একী বাচ্চা মেয়ে নাকি আর কেরালা কী এইটুকু রাস্তা! রাজীর সম্বন্ধে সব শুনে তাকে এতটা খামখেয়ালী ভাবা যাচ্ছেনা। যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেয় যে সাময়িক খেয়ালে বা ঝোঁকে সে এরকম স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চেপে বসতে পারে, তবু স্বামীর সঙ্গে মোবাইলেও একবার যোগাযোগ করবেনা ঐ দুদিনে, এটা বেশ অস্বাভাবিক!

একমাত্র সম্ভব যে ওদের মধ্যে সেদিন কিছু সিরিয়াস ঝামেলা হয়েছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতেই অর্ক অনুমান করেছিল রাজী রাগ করে বাপের বাড়ীর ট্রেনে উঠেছে!

তবু অর্ককে ঠিক কোনোভাবে দোষী মনে হচ্ছে না, কী যে করা!

চেয়ে দেখল অর্কর মা ওদের কথা ঠিকমত শুনতে পাচ্ছেনা বোধহয়, তাই রান্নাঘর থেকে এদিকে তাকিয়ে আছে হাতের কাজ থামিয়ে।রাই ঘড়ি দেখল, এবার উঠতে হবে। অর্ক সামলে নিয়েছে, মুখ তুলে বলল,

-"আপনার দেরী হয়ে যাচ্ছে, না?"

-"না,না, কাছেই যাব। আর দু চারটে জিনিস জেনে নিয়েই চলে যাব। অর্ক, কিছু মনে কোরোনা, এই প্রশ্ন গুলো এক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিকভাবেই আসে। হয়ত পুলিশ তোমাকে অলরেডী জিজ্ঞেস করেছে। রাজীর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু কাছাকাছিতে কে বা কারা

আছে? তাদের কাছে কি তুমি খোঁজ করেছিলে? বিয়ের আগে বা পরে কারো সাথে কি ওর কোনো বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল বা হয়েছিল? তোমার কি কখনো কিছু মনে হয়েছে এ নিয়ে?"

এবার অর্কর আগের সেই ইমোশন্যাল ভাবটা চলে গিয়ে মুখে একটা রাগী যুবকের ভঙ্গিমা এল। একটু কঠিন স্বরে বলল,

-"আপনি যা বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি। এরকম কিছুই ছিলনা। রাজী এমনিতে অত্যন্ত মডার্ন ও স্মার্ট মেয়ে, ওর মা বাবাও তাই। আগে কারো সঙ্গে সেরকম সম্পর্ক থাকলে ও তাকেই বিয়ে করত, কোনো বাধা ছিলনা। আমাদের দুজনের সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো। ছোটখাটো যা সমস্যা নিয়ে মা বলেছে, সেগুলো আমাদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে কোনো গুরুত্ব পায়নি, ওগুলো খুবই মামুলী ব্যাপার।রাজীর বন্ধু বলতে ওর স্কুলের দু একজন টীচার, বাকী বিয়ের আগের, কলেজের বন্ধুরা সব এদিক ওদিক চলে গেছে। এখানে কারোর সাথে সেরকম যোগাযোগ দেখিনি। ও আসলে ওর মায়ের সাথে খুব ক্লোজ, বন্ধুর মত। বিয়ের পরে আমার সাথেও তাই, সবকথা আমাকে বলে।"

রাই অর্কর আগের কথা গায়ে মাখলনা। এরকম কথায় এ প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক।

-"ওর কোনো আত্মীয় স্বজন আছে কাছে পিঠে? ওর বাবামা এখানে এসেছেন শুনেছি, কোথায় উঠেছেন ওরা?"

-"ওর মামার বাড়ী সি আর পার্কে। কিন্তু সেখানে এখন কেউ থাকেনা। বড়মামা বিদেশে, ছোটমামা সন্ন্যাসী। বাড়ি ভাড়া দেওয়া আছে। শুধু ছাতের ওপর দুটো ছোট রুমের একটা বর্ষাতি খালি পড়ে থাকে। ওর মামারা যখন দিল্লীতে আসে, তখন থাকে। ওর মায়ের কাছেও চাবি থাকত, উনি মাঝেসাঝে যেতেন বাড়ির তদারকি করতে। এখন ওর বাবা মা সেখানেই উঠেছেন।"

-"তা ওর মা তো এখন দিল্লীতে থাকেননা, ঐ বাড়ির চাবি কি রাজীর কাছে থাকে?"

-"হ্যাঁ, একটা চাবি রাজীর কাছে থাকে, তবে ও কোনোদিন যেতনা। একজন কেয়ারটেকার আছে, সেই পুরো বাড়ীর দেখাশোনা করে। আমি পরদিনই গিয়ে ওবাড়ীতে খোঁজ করেছিলাম, রাজী ওখানে ছিলনা।"

বৌ ট্রেনে চেপে বসেছে সন্দেহে পুলিশে খবর দেয়নি বা তার বাপের বাড়িতে জানায়নি অথচ নিজে খোঁজখবর করতে করতে তার খালি মামাবাড়ি পৌঁছে গেছে। রাই আবার নিঃসন্দেহ হল অর্ক পুলিশে না যাবার যে কারণটা বলছে সেটা যথেষ্ট নয়, হয়ত ভয় পেয়ে যায়নি বা চটকরে পুলিশের চক্করে পড়তে চায়নি!

অর্কের মার কাছে বিদায় নিয়ে ও উঠে পড়ল। অর্ক ওর সঙ্গে নীচে গেট অবধি এল। রাই দোনোমোনো করে শেষমেশ ওকে ভার্মার কথা কিছুটা বলল। অর্কর মুখটা উঙ্কÄল হয়ে গেল ওর কথা শুনে,

-"এখানকার পুলিশ অফিসার আপনার চেনা? প্লীজ, আপনি ওদের একটু রিকোয়েস্ট করুন যাতে ওরা রাজীকে আগে খুঁজে বার করে । কতদিন হয়ে গেছে, কী হতে পারে আমি কিছু বুঝতে পারছিনা। আপনার কী মনে হয়, ওর কি কিছু হয়েছে?"

রাই ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গীতে বলল,

-"ওরা চেষ্টা করছে, পুলিশকে আমরা যতটা ভাবি ততটা বুরবক ওরা নয়। কিছু হলে তো সেটা আগে জানা যেত। কিছু জানা যখন যায়নি, তখন আমার তো মনে হচ্ছে রাজী ঠিকই আছে।"

অর্কর কৃতজ্ঞ দৃষ্টির থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির রাস্তায় পা বাড়াল। সে কী সত্যিই মনে করে মেয়েটা ঠিক আছে বলেই কোনো খবর নেই?

ভার্মার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত রাইয়ের দেখা সম্পূর্ণ হবেনা, এখনো ও এক চোখেই দেখছে, অর্ক ও তার শুভানুধ্যায়ীদের চোখ। রাজীর চোখটা দরকার, তবেই ঘটনাটা আন্দাজ করার মতো অবস্থায় আসবে।

কুন্দনের ভৈঁসটার তবিয়ত আজ ঠিক নেই। গেলবছর গায়ভৈঁসদের কী যেন মড়ক লেগেছিল গাঁয়ে। ওদের দুটো ভৈঁস তখন মরে গিয়েছিল। বাপুর অনেক নুকসান হয়ে গিয়েছিল। ফসল ওঠার পর এই নতুন ভৈঁসটা কেনা হয়েছিল সেই কতদূরে খতৌলীর পশু হাটে গিয়ে। বরাবরই ভৈঁসের দেখভাল, তাদের চান করানো, খাওয়ানো সব কুন্দনই করে। ও তো বাপ ভাইদের মত ক্ষেতে কাজ করতে পারেনা, একটা পা ওর বিকল, পোলিও না কী বলে তাই হয়েছিল। ইস্কুলে পড়েছিল কিছুদিন, কিন্তু মাথায় তেমন কিছু ঢুকতনা। পন্ডিতজীর নিত্য ডান্ডা আর ফেল করলে বাড়িতে বাপের মার, শেষকালে গোঁ ধরল আর ইস্কুল যাবেনা। পড়ালিখা করবেনা তো এরকম ছেলে করবে টা কী! শেষে সবাই পরামর্শ করে ওকে ভৈঁসের দেখাশোনার কাজ দেওয়া হল। নাহলে ওর ছোট ভাই তো ইস্কুলে পড়ে, ভালো ছাত্র,তাকে কেউ বাড়ির কোনো কাজ করতে দেয়না।

ভৈঁস চরাতে কুন্দনের খুব ভালো লাগে। সকাল বেলায় নিজে নাস্তা করে ভৈঁসকে চারা খাইয়ে নিয়ে আসে এই যমুনার নহর পারে। যমুনা তো আর নদী নয় এখানে, নালা মাত্র। এই নহরটা কিন্তু বেশ চওড়া, পাড় বাঁধানো, দুধারে সবুজের সমারোহ। পাড়ের ধারে রাস্তাটা এককালে পিচের ছিল কিন্তু এখন ভেঙেভুঙে গিয়ে মাটির রাস্তার মত। রাস্তাটা সোজা যায় সেই দিল্লী। রাস্তা থেকে নেমে পাড় ঘেঁসে ঘাসের বনে ভৈঁসকে বেঁধে দিয়ে সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। কিছুটা গেলেই বনবিভাগের সংরক্ষিত এলাকা। ঢোকার মুখেই গার্ডদের চৌকি, সেখানে গিয়ে আড্ডা মারে, ওদের ফাইফরমাস খেটে দেয়। ক্ষেতে যখন কাজ চলে বাপ ভাইয়েদের কাছে চলে যায় পায়ে পায়ে। হাল্কা কাজে ওদের সাহায্য করে দেয়, দুপুরে ওদের সাথেই খায়। আবার অনেক সময় সারাদিনটা শুধু আলস্যেই কাটিয়ে দেয়, কোনো গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে নেয়। দুটো রুটি আর আচার বেঁধে নিয়ে আসে, দুপুরেও বাড়ি যায়না।

আজ ভৈঁসটা তেমন খেল না বলে কুন্দনেরও মন ভার। ভৈঁসদের সে খুব ভালোবাসে,মানুষের চেয়ে বেশী। ওদের ডাকের মানে, ওদের তাকানো সব বুঝতে পারে। তাই আজ কোথাও না গিয়ে ভৈঁস কে বেঁধে দিয়ে কাছের একটা গাছের তলায় গায়ের কাপড় বিছিয়ে শুয়ে রইল। ঠান্ডা হাওয়ায় কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই। দুপুরে সূর্য যখন মাথার ওপরে তখন রোদের তেজও বেশী, মুখে রোদ এসে পড়ল সরাসরি। রোদের আঁচে তার ঘুম ভেঙে গেল। উঠেই তার চোখ গেল ভৈঁসের দিকে, নাঃ বাঁধাই আছে সে নিজের জায়গায়।

তড়িঘড়ি উঠে পড়ল, মেঠো রাস্তা পেরিয়ে নহরের দিকে গেল। মুখ হাত ধুয়ে এসে রুটি খাবে, তারপর নাহয় চৌকি থেকে ঘুরে আসবে একবার। তার পায়ের জন্য সে যেখান সেখান দিয়ে জলে নামতে পারেনা। একটু এগিয়ে গিয়ে একটা ঘাট মত আছে, গাছের শিকড় ছড়ানো সিঁড়ি। গাছের গুঁড়ি ধরে ধরে আস্তে আস্তে সেখান দিয়ে নামে। নেমেই একটা চর মত আছে, ভৈঁসকে চান করায় যেদিন সেদিন সে এখানেই আসে। আজ একাই এল, মাথাটা রোদের গরমে তেতে গেছে, মুখে চোখে জল দিয়ে মাথাটা ধুয়ে নেবে।

নেমে জলের দিকে এগোতে গিয়েই থমকে গেল কুন্দন।

একটা লাশ, চরের যেখানটায় কাঁটা ঝোপ তাতে আটকে আছে। নদীতে ভেসে এসেছে মনে হয়। চারিদিকে একটা কেমন আঁশটে দুর্গন্ধ। প্রথমেই পেয়েছিল তবে যমুনা নালায় এরকম বদবু অস্বাভাবিক কিছু নয় তাই কিছু মনে হয়নি। এখন লাশ দেখে কুন্দনের গন্ধটা আরও তীব্র মনে হল, সারা গা গুলিয়ে উঠল। সে আর পারলনা, একপাশে গিয়ে বসে পড়ে উলটি করতে লাগল।

বমি হয়ে যাওয়ার পরে নিজেকে একটু হালকা লাগল, আর সে ওখানে দাঁড়াল না। কোনোরকমে হাঁচোড়পাচোড় করে শিকড়ে পা রেখে রাস্তায় উঠে এল। একটু দিশেহারা, কী করবে বুঝতে পারছিলনা। একবার মনে হোলো বাড়ি গিয়ে গাঁয়ের লোকেদের ডেকে আনে। কী মনে করে শেষে খুঁতো পা টাকে জোরে টেনে টেনে হাঁটা দিল গার্ডেদের চৌকির দিকে।

বনের চৌকির দুই গার্ড বিরজু আর সুখরাম সবে তখন দুপুরের খানা খেতে বসেছে চৌকির সামনে আমগাছের তলার চারপাইয়ে, দেখে মুসেরী গাঁয়ের ল্যাংড়া কুন্দন হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে। একটু অবাক হল, এটা ওর আসার সময় নয়, এলে সকালেই আসে নয়ত বেলা পড়লে। দুজনেই উঠে দাঁড়াল, ছেলেটা কাছে আসতে দেখে মুখখানা একদম ফ্যাকাশে।

-"কী হয়েছে রে, এ কুন্দন?"

-"লাশ, ভাইয়া একটা লাশ ভেসে এসেছে, ঐ পিপল গাছের কাছের ঘাটের চরায়।"

সুখরাম কুন্দনকে বসতে দিল, লোটা থেকে জল দিল খেতে। কুন্দন জলটা খেয়ে চোখ বন্ধ করে রইল। বিরজু ওদের মধ্যে সিনিয়র, সে খুব একটা ঘাবড়ালো না। যমুনার নহরে বছরে এরকম দু একটা লাশ ভাসতে দেখা যায়। আজ অবশ্য লাশ ভেসে এসে তাদের এলাকায় ঠেকেছে, তাই একটু ঝামেলা। সে বসে পড়ে খেতে শুরু করল, সুখরাম কেও ইশারা করল খেয়ে নিতে। সুখরামের বয়স কম, উত্তেজনা বেশী। সে খেতে বসলনা, বলল,

-"বিরজুভাই যাবেনা দেখতে? সাহেবকে খবর দিতে হবে তো।"

বিরজু মুখে রুটি পুরে পেঁয়াজে একটা বড় কামড় দিয়ে বলল,

-"যাব, আগে খানা খেয়ে নে। অত পরেশান হওয়ার কিছু নেই, নহরে লাশ ভেসে আসা কি নতুন নাকি! কুন্দন তুইও একটা রোটি খা।"

কুন্দন না না করেও তুলে নিল একটা রুটি সবজি জড়িয়ে। বমি করেছে বলেই হয়ত তার এখন খিদে খিদে লাগছে। সুখরামও আর কিছু না বলে খেয়ে নিল। খাওয়াদাওয়া সারা হওয়ার পর কিন্তু বিরজুর অন্য রূপ। সুখরামকে পাঠিয়ে দিল সাইকেলে দু কিলোমিটার আগে ওদের বনবিভাগের অফিসে। সেখানে ফরেস্ট অফিসারকে খবর দিয়ে, ওনাকে বলে, থানায় গিয়ে পুলিশ নিয়ে আসতে হবে।

নিজে কুন্দনকে নিয়ে চলল লাশের ওখানে। পথে দেখল কুন্দনের ভৈঁস বসে আয়েশ করে জাবর কাটছে, চোখ বোজা। কুন্দনের সেদিকে নজর নেই, জোরে জোরে চলল বিরজুর সাথে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে। ঘাটে নেমে বিরজু লাশের কাছে গেল, কুন্দন নামেনি, সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল। বিরজু ভালো করে দেখল, জলে ভেসে ফুলে গেছে, গন্ধ ছাড়ছে। .... যুবতী মেয়েছেলের লাশ .... । মনে হচ্ছে বেশ কয়েকদিনের হবে!

শনিবার ছুটির দিন হলেও হাজারটা কাজ থাকে। একটু ব্যাঙ্কে যাওয়া ছিল, যদি ভার্মা আসে তাই রাই গেলনা। আলোক একাই বেরিয়ে গেল, দু চারটে আরো অন্য কাজ সেরে আসবে। একা বাড়িতে বসে অধৈর্য্য হয়ে পড়ছিল। একবার ভার্মাকে ফোন করবে কিনা এই ভাবনাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে ঠিক সেই সময়ই থানা থেকে একটি লোক এল। ভার্মা পাঠিয়েছে,

হাতে একটা বেশ বড়সড় খাম। ভেতরে বসলনা, খামটা দিয়ে বলল ভার্মাসাব বলে দিয়েছেন ম্যাডাম যেন খামটা পেলে একবার ফোন করে নেন সাবকে।

লোকটাকে বিদায় দিয়ে খামটা হাতে নিয়ে বসার ঘরে এল। সেলোটেপের বন্ধনমুক্ত করেও কী ভেবে খামের ভেতরে দেখার আগে ফোনের বোতাম টিপল রাই।

-"হ্যালো, ভার্মাজী।"

-" ম্যাডাম নমস্তে। খাম পেয়েছেন?"

-"হ্যাঁ, এই তো আমার হাতে। কী আছে এতে?"

-"ম্যাডাম,ওতে সবার জবানবন্দির কপি আছে, এফ আই আরেরও একটা কপি আছে। আমার কিছু নোটস আছে। আপনি এগুলো দেখুন আগে। আশা করছি সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে আপনার সঙ্গে দেখা করে আপনার আর যা জিজ্ঞাস্য সেসব নিয়ে আলোচনা করব।"

জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হবেনা মনে হলেও রাই কৌতূহল চাপতে পারেনা।

-"আপনি এখন কোথায়? খুব ব্যস্ত কি?"

-"আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, দূরে না, ঘন্টা দুয়েকের পথ। ফিরে এসে আপনার ওখানে আসব, সন্ধ্যেবেলায়। ঠিক আছে?"

ভার্মা কিছু খুলে বলল না, আর কথা বাড়ানো অভদ্রতা হয়। ফোন রেখে রাই খাম খোলে, ভেতরে একতাড়া কাগজ। ওপর ওপর চোখ বোলাল, এফ আই আর ও আরও কিসব হিন্দীতে, হাতে লেখা, পুলিশী ভাষা। ভালো করে খুঁটিয়ে পড়তে হবে। সে সব তুলে রেখে দিল। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ধীরে সুস্থে বসা যাবে।

অর্ক আর তার মায়ের বয়ানে খুব একটা নতুন কিছু নেই। বরং ওরা তার কাছে যা বলেছে রাজীর ইদানীংকার ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে সেসব কিছু পুলিশকে বলেনি। রাজীর বাবা মার বক্তব্য পড়ে যা মনে হয় তা হল ওরাও খুব কিছু জানেনা, যেন অভিযোগ করতে হয় তাই করা। অর্ককে ওরা দায়ী তো করছে কিন্তু তার কোনো ভিত্তি নেই। ওদের কথা হল সেদিন বাজারে অর্ক কেন রাজীর ওপর লক্ষ্য রাখেনি। এটা একেবারেই হাস্যকর, একটা পূর্ণবয়স্কা মহিলা, বাচ্চা নয়, তার ওপর নজর না রাখলে সে বাজারে হারিয়ে যাবে!

এমনিতে অর্ক আর রাজীর সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্নতে ওদের উত্তর থেকে মেয়ে জামাইয়ের মধ্যে কোনো গন্ডগোলের কথা ওরা জানে এমন মনে হয় না।

এরা ছাড়া পুলিশ অর্কদের ফ্লোরের দুদিকের প্রতিবেশী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের জবানবন্দি নিয়েছে, রাজীর স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ও দুজন কোলীগের, শান্তিবিহারের সেই দোকানদারের। কোনো কিছুতেই কোনো বিশেষত্ব নেই। খুব ভালো মেয়ে, ভালো বন্ধু, প্রতিবেশিনী, মুখে হাসি লেগেই আছে। দুজনের মধ্যে সেরকম কোনো গোলযোগ কারো চোখে পড়েনি। অর্কর অনুপস্থিতিতে রাজীর কোনো বন্ধু বিশেষ করে ছেলে বন্ধুকেও আসতে দেখেনি কেউ। এ কোনো গুন্ডার দলের বা বদমাইশ লোকের কাজ বলে তাদের ধারণা।

ভার্মার নোটে শান্তিবিহার বাজারের আরও নানা লোকের উল্লেখ আছে, ফুলওয়ালী, দোকানের দুটো ছেলে ইত্যাদি। কেউ সেদিন কোনো গাড়িতে কাউকে জোর করে তোলা হচ্ছে এরকম কিছু দেখেনি। তবে ঐ বাজারের মধ্যে এদিক সেদিক করে অনেক অন্ধকার গলি আছে। সেখানে সবার অলক্ষ্যে কিছু হলে কেউ টেরও পাবেনা। অর্ক যে জায়গাটায় গাড়ী রেখেছিল সেটাও এরকমই একটা অন্ধকার গলিমত ছিল। এফ আই আরেতেও সেরকম কিছু নেই, অর্ক কোনো সন্দেহের কথা বলতে পারেনি।

রাই একটু বোর হল পড়তে পড়তে। এত কষ্ট করে পুলিশের ভাষা থেকে সার উদ্ধার করতে গিয়ে দুপুরের ঘুমটা মাটি করল, কিন্তু সেরকম লাভ কিছু হলনা। এখন ভার্মাই ভরসা, যদি সন্ধ্যেয় এসে নতুন কিছু বলতে পারে। রাজীর স্কুলটা এদিককার বেশ পুরনো স্কুল, আগে খালি প্লে স্কুল ছিল এখন কেজি সেকশনও খুলেছে। রাইয়েদের সোস্যাইটীর মিসেস সঙ্গীতা গোয়েল আগে ওখানে পড়াত, তবে এখন বোধহয় ছেড়ে অন্য স্কুলে আছে। ডাইরেক্টরী দেখে রাই ইন্টারকমে মিসেস গোয়েলকে ফোন লাগাল।

ভার্মা আসার আগে ফোন করেছিল, এল বেশ দেরীতেই, প্রায় রাত নটায়। ফোন পেয়ে ভার্মা আসছে শুনে রাই তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া মিটিয়ে নিয়েছিল। ভার্মা এল যখন কফি রেডী। তিনটে মাগে কফি নিয়ে এসে বসল ও, ততক্ষনে আলোক ভার্মাকে বসিয়েছে।

ওর সঙ্গে দেখা হয়ে ভার্মার গলা বেশ খুশী খুশী,

-"অনেকদিন পরে দেখা হল ম্যাডাম। সরি, এত রাত হয়ে গেল আসতে। আপনারা ভালো তো? কফির কোনো দরকার ছিল না।"

ভার্মার সঙ্গে এর আগেরবারে ভালো পরিচয় হয়ে গেছিল, তখনই দেখেছে পুলিশের অফিসার হয়েও আপাদমস্তক ভদ্র লোকটি। রাই ওকে আশ্বস্ত করে,

-"আরে সামান্য কফিই তো, আর কিছু না। আপনি কি এখন সোজা আসছেন, না থানা হয়ে? কিছু খাবেন?"

ভার্মা হাঁহাঁ করে উঠল।

-"না না ম্যাডাম ব্যস্ত হবেন না, আমি নাস্তা করেছি। আসলে আমি সন্ধ্যেয় ফিরেছি, থানায় দেরী হয়ে গেল।" ভার্মা একটু ইতস্তত করছে বুঝতে পেরে আলোক উঠে পড়ল।

-"ভার্মাজী সরি, আমার কিছু কাজ ছিল, আমি ভেতরে যাই। আপনারা আলোচনা করুন, পরে দেখা হবে।" ভার্মা এবার একটু স্বচ্ছন্দ হল মনে হল। আসলে আলোকের সঙ্গে আজই তার প্রথম আলাপ হয়েছে, তাই একটু কিন্তু ভাব। রাই চুপ করে ভার্মার মুখ খোলার অপেক্ষা করতে থাকল কফি খেতে খেতে।

-"ম্যাডাম, মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলার লাশ পাওয়া গেছে।"

-"সেকী?"

রাইয়ের সারা শরীর কেমন একটা অবশ হয়ে এল! ও এটা আশা করেনি। তারপরেই খেয়াল করল ভার্মার কথাগুলো।

-"মনে হচ্ছে মানে? আপনারা শিওর নন?"

-"যমুনার ক্যানালে ভেসে আসা এক মহিলার লাশ পাওয়া গেছে এখান থেকে প্রায় একশ কিলোমিটার দুরে পালওয়ালের কাছে। জায়গাটা জঙ্গলের মধ্যে, বনদপ্তরের আওতায় পড়ে। এদিককার জঙ্গল তো,খুব গভীর নয়। একদিকে আবার গাছটাছ কেটে ক্ষেত হয়ে গেছে অনেককাল। এখন বনবিভাগ একটু মাথাটাথা ঘামাচ্ছে বন সংরক্ষণের ব্যাপারে।

গতকাল দুপুরে কাছের গ্রামের একটা ছেলে ক্যানালের ধারের ঘাসজমিতে ভৈঁস চরাতে এসেছিল, সেই দেখে লাশ। সে দেখতে পেয়ে সামনের চৌকিতে বনকর্মীদের খবর দেয়। সেখান থেকে খবর পেয়ে লোক্যাল থানার পুলিশ আসে। আমরা থানায় থানায় মিসেস ব্যানার্জীর খবর পাঠিয়েছিলাম আগেই। ওদের সন্দেহ হওয়াতে খবর দেয়। আমি ও শান্তিবিহার থানার ওসি রাজপাল দুজনে খবর পেয়েই রওনা হই।

মনে হচ্ছে এজন্য বলছি ম্যাডাম, লাশ এতদিন জলে ভেসেছে, ফুলেটুলে বীভৎস অবস্থা, চেনা যায়না। পরনের পোষাকের রঙও আদতে কী ছিল বোঝা যাচ্ছেনা। অবশ্য এ ব্যাপারে মিঃ ব্যানার্জী প্রথম থেকেই খুব একটা নিশ্চিত নয়। শুধু সালোয়ার কামিজ পরনে ছিল এটুকুই উনি বলেছিলেন, রঙ কেমন তা ঠিক বলতে পারেন নি। মহিলার গলায় একটা সোনার মঙ্গলসূত্র আছে, মিসেস ব্যানার্জীর গলায় চেন বা মঙ্গলসূত্র কিছু একটা ছিল বলে এফ আই আরে লিখিয়েছেন মিঃ ব্যানার্জী।

এ অন্য কেউও হতে পারে, তবুও সবরকম দেখে আমার সন্দেহ এ মিসেস ব্যানার্জীরই লাশ।লাশ আনা হচ্ছে শান্তিবিহারে। মিঃ ব্যানার্জী আর ভদ্রমহিলার বাবাকে খবর দেওয়া হয়েছে। কাল সকালে এসে লাশ দেখে যদি আইডেন্টিফাই করতে পারে। তারপর পোস্টমর্টেম করতে পাঠানো হবে। "

-"সোনার মঙ্গলসূত্র গলায় ছিল এতদিন জলে ভাসার পরেও, কেউ নিয়ে নেয়নি? বনকর্মীরা বা ঐ রাখাল ছেলেটি বেশ সৎ বলতে হবে তো!"

একজন মেয়ে হয়ে প্রথমেই গয়নার কথাটা মনে হোলো রাইয়ের। ভার্মা হেসে ফেলল,

-"সোনা বলেই তো মনে হল, অবশ্য পরীক্ষা করে দেখবে ফরেনসিক রা। আমার কাছে নেই এখন, বডি ও আর সবকিছু শান্তিবিহারের রাজপালের ব্যবস্থাপনায় দিল্লীতে গেছে। ওদের ওখানে ফরেনসিক পদ্ধতি অনেক আধুনিক, পোস্টমর্টেমের দিকটাও ওরাই দেখবে। রাজপাল আমার আগেই পৌঁছে গেছিল লাশের ওখানে, ঐ সব বন্দোবস্ত করেছে। ডিটেল রিপোর্ট আমার হাতে এলে আপনাকে জানাব।"

এসব শুনতে রাইয়ের খুব খারাপ লাগলেও সে ভাবটা ঝেড়ে ফেলে সে পাকা গোয়েন্দার মত কাজের কথায় এল।

-"ভার্মাজী, আমি আপনার পাঠানো কাগজ গুলো পড়লাম। ওনিয়ে কথা বলব, কিন্তু তার আগে আপনি পুরো ব্যাপারটা আপনার মতো করে বলুন তো।"

ভার্মা মোটামুটি গুছিয়ে যেভাবে ঘটনাটা যা বলল তার সবটাই প্রায় রাই আগেই জেনেছে। শুধু একটা নতুন কথা শুনল। শান্তিবিহারের বাজার থেকে কিছুটা এগিয়ে আইয়াপ্পা মন্দির আছে। অর্ক ও রাজী মাঝেসাঝে এই মন্দিরেও যেত বাজার করে ফেরার পথে। এটা অর্কই বলেছে।

মন্দিরের সামনে একটি অনাথ মেয়ে বসে ভিক্ষা করে সকাল বিকেল, এমনিতে সবাই বলে মেয়েটির অল্পবিস্তর মাথার দোষ আছে। রাজীর মা যখন এখানে ছিলেন এই মেয়েটিকে কাপড় পয়সা খাবার এসব তিনি দিতেন। মা চলে যাবার পর রাজীও যখনই মন্দিরে যায় একে কিছু না কিছু দেয়। মন্দিরে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে কেউই তেমন কিছু বলতে পারেনা যদিও অনেকে ফোটো দেখে রাজীর মুখ চিনতে পারে। মন্দিরের এক পূজারী পরে শান্তিবিহারের পুলিশকে জানায় যে ঐ মেয়েটি সেদিন সন্ধ্যেয় নাকি রাজীকে মন্দিরে আসতে দেখেছিল।

পরে ভার্মা গিয়ে মেয়েটিকে প্রশ্ন করতে সে বলে ঐদিন সন্ধ্যেয় দিদি মন্দিরের বাইরের গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল, সে ডাকতেও তার কাছে আসেনি বা তাকে কিছু দেয়নি। পরে একটা গাড়ীতে উঠে চলে যায়। মেয়েটি এই চোদ্দ পনের বছর বয়সী হবে, একেবারে পাগল না হলেও বয়সের তুলনায় অপরিণত,কথাবার্তাও ঠিক গোছানো নয়, অসঙ্গতি আছে। অতএব

কথাটা সত্যিও হতে পারে আবার প্রলাপও হতে পারে। মন্দিরের বাইরের গাছতলার দিকটা অন্ধকার, তার নীচে দাঁড়ানো মানুষকে চিনতে ভুল করা বিশেষ করে অপরণিত মনস্ক কারুর পক্ষে, অসম্ভব নয়!

তবে ঘটনাটা যদি সত্যি হয় তাহলে ভাববার বিষয় আছে। সবচেয়ে যেটা গোলমেলে সেটা হল মেয়েটি রাজীদের গাড়ী ভালোই চিনত,কালো রঙের স্যানট্রো গাড়ি সে দেখিয়ে বলেছে, এতে কোনো ভুল নেই। তার কথা অনুযায়ী রাজী যে গাড়ীতে গেছে সেটা ওদেরই গাড়ী,যদিও সে অর্ককে ঠিকমত দেখেছে বলেনি। অবশ্য এরকম গাড়ি এরাস্তায় অনেক চলে, এতে কিছু প্রমাণ হয়না তবু এই ব্যাপার থেকেই পুলিশের সন্দেহ অর্কর ওপর আরো পড়েছে। সাক্ষী এধরণের না হলে আর ঠিকমত মোটিভ পাওয়া গেলে হয়ত অর্ক এতদিনে গ্রেফতার হয়ে যেত!

রাই সব শুনে একটু অবাক হয়, অর্করা এনিয়ে তাকে কিছু বলেনি।

-"ভার্মাজী, আপনারা অর্ককে এনিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন?"

-"করেছিলাম, তবে সরাসরি নয়। জানতে চেয়েছিলাম সে সেরাতে মন্দিরের রাস্তা দিয়ে ফিরেছিল কিনা আর মেয়েটিকে চেনে কিনা। অর্ক সেদিন ঐ রাস্তা দিয়েই ফিরেছিল, মেয়েটীকেও সে চেনে, রাজী ওকে প্রায়ই পয়সা এটাসেটা দেয়। তবে সেদিন সে ওর দিকে লক্ষ্য করেনি, রাজীর জন্য ভাবনাতে অন্যমনস্ক ছিল।"

রাই বিস্ময়ের গলায় বলল,

-"সেক্ষেত্রে অর্ক মন্দিরে খোঁজ করলনা কেন? রাজী তো মন্দিরেও থাকতে পারত। এত জায়গায় দেখল বাজারে, প্রতিটি দোকানে, আর মন্দির যেখানে তারা প্রায় যেত সেখানে খুঁজে দেখলনা। এটা তো খুবই অস্বাভাবিক।"

ভার্মা একটু হাসল,

-"ঠিক বলেছেন ম্যাডাম, আমরাও এই কথাই জিজ্ঞেস করি ওনাকে। উনি বললেন মন্দির আটটায় বন্ধ হয়ে যায়, তখন নটা বেজে গেছিল। অত রাত্তিরে কাউকেই মন্দিরের ভেতরে যেতে দেওয়া হয়না। তাই মিঃ ব্যানার্জী মন্দিরে যাননি বা খেয়াল করেননি।"

রাই একটু চিন্তা করে ঘাড় নাড়ল।

-"সবই ঠিক, তবু এটা একটু ভাবার মত। মন্দির বন্ধ হোক, মন্দিরের আশেপাশেও একবার দেখবেনা এটা কেমন যেন!"

-"আপনিও কি তাহলে ভদ্রলোককেই সন্দেহ করেন?"

রাই এবার হেসে ফেলল,

-"আর কাউকেই যে সন্দেহ করার মত পাচ্ছিনা ভার্মাজী। যাইহোক, লাশ শনাক্ত হলে আর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এলে একটু জানাবেন।"

ভার্মা ওকে আশ্বস্ত করল, তাড়াহুড়ো করে ওরা কিছু করবেনা। এই মৃতদেহটি যদি রাজীর বলে প্রমাণ হয়ে যায় তাহলে তদন্তের দিকটাই ঘুরে যাবে। সে এখন থেকে যা হবে তা রাইকে জানিয়ে যাবে।

আকবরপুরে এতবছর কাটানোর পরে যখন দিল্লীর এই থানায় বদলি হয়ে এলো, রাজপালের মেজাজ গিয়েছিল বিগড়ে। দিল্লী শহর এমনিতেই তার নাপসন্দ, তায় শান্তিবিহারের মত জায়গা। দিল্লী শহরে এত ভালো ভালো এলাকা আছে, গুন্ডাগিরি রাহাজানি ও আরও কত রকমের কাণ্ডকারখানার জন্য বিখ্যাত, কত ওস্তাদ ক্রিমিন্যালদের আড্ডা, সেসব ছেড়ে তার জায়গা হল কিনা এইখানে! পুলিশ মহলে এ অঞ্চলের বিরাট বদনাম নামে ও কাজে এক হওয়ার জন্য। এমন শান্তিপূর্ণ এলাকা কখনো রাজপালের মত খানদানী থানেদারের কাম্য হতে পারেনা। আশেপাশে কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে কখনো কিস্যু হয়না। এই এলাকায় ঢুকলেই যেন লোক ভেড়ুয়া হয়ে যায়,দায়িত্বশীল নাগরিক সব!

রাস্তাঘাটে গাড়িঘোড়ায় টক্কর আর তা নিয়ে দাঙ্গা যা এ শহরে হমেশাই দেখা যায় তাও নয়। হাত নিশপিশ করে চোরের মার মারার জন্য, কিন্তু তেমন চোর কোথায়! ভীষণ ভীষণ বোরিয়ত হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু কিছু করার নেই। আগের থানায় সামান্য গড়বড় করে ফেলায় সাসপেন্ড হতে হতে বেঁচেছে কর্তাদের হাতেপায়ে ধরে। এই শান্তিবিহার থানায় পোস্টিং হয়েছে সেই গলদ কাজের শাস্তি স্বরূপ। এদিকে বেশ বদনাম হয়ে গেছে তার, তাই বছর ঘুরতে না ঘুরতেই যদি আবার বদলির আর্জি নিয়ে যায় কেউ শুনতে চাইবেনা।

এদিকে শহরে খরচখরচা বেশী অথচ আয়ের পথ তেমন নেই, মেজাজ তাই সবসময় খিঁচড়ে থাকে। ছেলেমেয়েদের বায়নাক্কার আর শেষ নেই! অবিশ্যি একেবারে যে আয় হয়না তা নয় তবে তা বেশীরভাগই দলীয় আয়, ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে হাতে যা আসে তা তেমন কিছু বলার মতো নয়। সেসব দিয়ে রাজপালের মত সিংহের খোরাক হতে পারেনা।

এই প্রথম একটা কেসের মত কেস এসেছে। যা বুঝছে ভদ্রলোকের ভালই পয়সাকড়ি আছে। একমাত্র মেয়ের খোঁজ পেতে ভালই খরচপাতি করবে। প্রথমে যখন সেক্টর আটত্রিশ থানার ভার্মা ফোন করে এ কেস সম্বন্ধে কথা বলে তখন রাজপাল তেমন পাত্তা দেয়নি। বাজার থেকে এক মহিলা উধাও হয়ে গেছে। মেয়েটার স্বামী এফ আই আর করেছে ওদের কাছে। খুঁজলে দেখা যাবে দুজনে ঝগড়াটগড়া হয়েছে, দুদিন বাদে মাথা ঠান্ডা হলে ফিরে আসবে। ভার্মাকে সে চেনে, তার থেকে জুনিয়র, তবে সুনাম আছে ভদ্র সৎ অফিসার বলে, বড় কর্তাদের পছন্দের লোক। রাজপাল এধরণের পুলিশদের পছন্দ না করলেও সামনাসামনি খুবই খাতিরটাতির করে।

এক রাজ্যের বাসিন্দা, ঘটনা ঘটেছে অন্য রাজ্যে। তবে এখানে এরকম প্রায়শই হয়, বর্ডারের কাছে বলে, নতুন কিছু নয়। সেও ভার্মা এলে তার সাথে বাজার ঘোরে, লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। স্বামীটা একেবারে আনকোরা, বয়স বেশী না, একটু ভয়টয় দেখিয়ে কিছু খিঁচে নেওয়াও কঠিন হতনা যদি না মাঝখানে ভার্মা থাকত।

এই জন্যে বেশী উৎসাহ দেখায় নি প্রথমে। কিন্তু দুদিন পরে যখন মেয়েটীর বাবা মা এসে তার সঙ্গে দেখা করে, তখন তার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়ে যায়। এই পরিবার দীর্ঘদিন এ এলাকায় বাস করে গেছে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরে, চেনাজানা আছে নানা মহলে, এখানকার এম এল এ স্বয়ং ফোন করে নির্দেশ দিয়েছে এদের সবরকম সাহায্য করতে। ব্যস, রাজপালের মাথায় পোকা নড়ে ওঠে, সে দুপক্ষ থেকে উপরির জোগাড়ের বন্দোবস্ত করতে লেগে যায়।

গিরীশের মাথায় রাজপালই বুদ্ধি দেয় জামাইয়ের নামে প্রাথমিকভাবে একটা পাকাপাকি অভিযোগ করে রাখতে। ভদ্রলোক একটু নিমরাজী মত ছিলেন প্রথমে তবে শেষমেশ এফ আই আর করে ফেলেন। তারপরেই রাজপাল অর্ককে থানায় ডেকে পাঠিয়ে বেশ করে কড়কে দেয়। ভার্মা অবশ্য এ নিয়ে কিছু বলেনি তবু রাজপাল ঠিক করেছে ভার্মা যদি অর্কর তরফদারী করে সে ছেড়ে কথা কইবেনা। চাই কি ওপরওয়ালাদের কাছে ভার্মার বিরুদ্ধে নালিশও করে ফেলবে। ভার্মা শান্ত কমকথার লোক, ওর মনে কী আছে রাজপাল ঠিক বুঝতে পারেনা। হতে পারে ভার্মাও অর্ককেই সন্দেহ করছে। মন্দিরের ঐ মেয়েটা যদি ঠিকঠাক ভরসার সাক্ষী হত, এতদিনে লক আপে ঢুকিয়েই দিতে পারত লোকটাকে!

হপ্তা ঘুরে এখনও মেয়েটির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছেনা। ওর বাবা মা দুজনে অথবা কখনো বাবা একা থানায় এসে ঘুরে যাচ্ছে রোজ। রাজপাল নিজে খুব একটা উদ্যোগ নিচ্ছে না, খাটাখাটনি যা করার ভার্মাই করুক। সে মাঝে মাঝে শুধু ভার্মাকে ফোন করে খবরাখবর জেনে নেয়, কদ্দুর কী এগোলো। কাল রাতে খবর এসেছে যে পালওয়ালের কাছে একটা যুবতী মেয়ের লাশ পাওয়া গেছে। রাজপাল বেশ খুশী মনে সকাল সকাল থানায় এসেই গাড়ী তৈরী করতে বলে, পালওয়াল যেতে হবে। ভার্মাকে ফোন করে নেয় একবার। তাকেও খবর দিয়েছে পালওয়াল থানা থেকে, সেও যাচ্ছে।

গাড়ির অপেক্ষায় বসে কী মনে করে মেয়েটার বাবা গিরীশকে ফোন লাগায়, সবই আছে রিপোর্টে তবু আর একবার খুঁটিয়ে জেনে নেয় মেয়েটিকে চেনার উপায়, লাশ পাওয়ার কথা অবশ্য বলেনা। লাশ যদি ঐ মেয়েটারই হয় তাহলে কেসটা বেশ জমে যাবে, ছেলেটাকে লক আপে পুরে ফেলতে পারলে আর দেখতে হবে না। ভালো চাকরি করে, তিনদিন লকাপে থাকলে সার্ভিস রেকর্ডে উঠে যাবে এই ভয় দেখিয়ে মোটা টাকা আদায় করা যাবে।

দেওয়ালীর খরচখরচার জোগাড় তাহলে মোটামুটি হয়ে যাবে, বউ একটা সোনার হার তো কিনবেই ধনতেরাসে, এছাড়া ছেলেমেয়ের চাই এলসিডি টিভি। কী করে কী করবে ভেবে ভেবে তার ঘুম হচ্ছিলনা কদিন!

ছোট অফিসার ধাওয়ান আসতে রাজপাল তাকে সব বুঝিয়ে স্টেশনে থাকতে বলল আজ। পালওয়াল এখান থেকে কম দুর নয়, রাস্তাও ভালো নয়। ফিরতে ফিরতে বিকেল গড়িয়ে যাবে মনে হচ্ছে। কনস্টেবল সালিখরাম এসে খবর দিল জীপ রেডি, সালিখরাম সঙ্গে যাবে। বাইরে এসে দেখে অন্য কনস্টেবল যতিন্দর একজন বয়স্কা মহিলার সঙ্গে কথা বলছে। রাজপাল পাশ কাটিয়ে গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছিল, যতিন্দর ডাকল,

-"স্যর।"

আদ্ধেকটা শরীর জীপে ড্রাইভারের পাশে ঢুকিয়ে দিয়ে রাজপাল একটু খেঁকিয়ে উঠল,কাজে বেরোনোর সময় পিছুডাক সে পছন্দ করেনা,

-"কী? কী হয়েছে?"

-"স্যর, এই ম্যাডামজী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান ঐ যে মহিলা নিখোঁজ হয়ে গেছে সে আগে এনাদের বিল্ডিংয়ে থাকত।"

গাড়ীতে বসেই রাজপাল মহিলার দিকে তাকায়, প্রায় পঁচাত্তর আশির কাছাকাছি বয়স হবে। কী আর বলবে, নির্ঘাত মেয়েটাকে ঐদিন কোথাও দেখেছে বলবে। আদৌ দেখেছে কী ভীমরতি তাই বা কে বলে! সে যতিন্দরকে মহিলাকে ধাওয়ানের কাছে নিয়ে যেতে বলে গাড়ী ছেড়ে দিতে ইশারা করল।

ধাওয়ান তার সামনে চেয়ারে বসা মহিলাটিকে দেখছিল। সে অনেকদিন আছে এই থানায়। বয়স বেশী নয়,কাজে খুব বেশী উৎসাহ দেখায় না, তবে উপরওয়ালা যা নির্দেশ দেয় তা শোনে। তার বাড়ি বেশী দুরে নয়, বাড়ির কাছে পোস্টিং, এতেই সে খুশী। বেশী ভালো কাজ বা খারাপ কাজ কোনোটাই করে সে এখান থেকে অন্য জায়গায় যাবার ব্যবস্থা করতে রাজী নয়। এই মহিলাকে দেখে কেমন চেনা লাগে তবে মনে পড়েনা, চেষ্টাও করেনা মনে করার। মহিলার বয়স হয়েছে প্রায় আশির কাছেই হবে, চেহারায় খুব মোটা না, রং ফরসা টুকটুক করছে, মাথার সাদা চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। পরণে ঢোলা মত কামিজ আর রঙিন পাজামা, হাতে একটি ওয়াকিং স্টিক।

ভদ্রমহিলাও চশমার ফাঁক দিয়ে ধাওয়ানকে জরিপ করছিলেন। ধাওয়ানের কথাবার্তা এমনিতে ভদ্র,ব্যবহার সভ্য, রাজপালের মত কাঠখোট্টা অভদ্র নয়। সে একটু অপেক্ষা করল ও তরফের মুখ খোলার জন্য। কিন্তু দেখল ইনি এনার বয়সী অন্যান্য মহিলার মত বলিয়ে টাইপের নয়। উনিও যেন ধাওয়ানেরই শুরু করার অপেক্ষায়।

-"আমাদের ইন চার্জ এখন একটু কাজে বেরিয়েছেন। আপনার যা বলার আমাকে বলতে পারেন, আমিও এ থানার একজন অফিসার। আপনার পরিচয়টা?"

মহিলাটি এবার একটু সোজা হলেন, তারপর আশপাশ দেখলেন। তাদের আশেপাশে কেউ ছিলনা। কনস্টেবলরা বাইরে গুলতানী করছিল, বড় সাহেব নেই। আরো দু একজন এদিক সেদিক ছিটিয়ে ছিল।

গলা একটু সাফ করে বললেন,

-" আমি বেটা, মিসেস থমাস, শেলী থমাস। এখানে ঐ সি ব্লকে অভিজ্ঞান অ্যাপার্টমেন্টসে থাকি, একশ বারো নম্বরে। আমি একাই থাকি, ছেলে গাল্ফে আর মেয়ে গুরগাঁওতে থাকে। এমনিতে আমাদেরও বাড়ী কেরালাতে, তবে সেখানে এখন কেউ নেই, সব বিক্রি হয়ে গেছে। স্বামী এখানেই চাকরি করতেন, ছেলেমেয়ে এদিকেই বড় হয়েছে। আমিও এখানেই থেকে গেছি মেয়ের কাছাকাছি থাকব বলে।

যে মেয়েটী নিখোঁজ হয়েছে, রাজী, ওর ঠাকুমা আমার বন্ধু ছিল। আমাদের সোস্যাইটীতেই থাকত ওরা, ওকে আমি জন্মাতে দেখেছি।"

ধাওয়ান খুব একটা উৎসাহিত হলনা, কেসটা মূলত রাজপাল নিজে দেখছে। সে এব্যাপারে খুব কিছু জানেটানে না। তবু কিছু না বললে এই ভদ্রমহিলা হয়ত তাকে সারাদিন বসিয়ে ঐ মেয়েটীর ছোটবেলার গল্প শোনাবে। সে বুঝে নিল একা বয়স্ক মহিলা, জীবনে কোনো রকমফের নেই। এসময়ে এরকম একটা ঘটনা যার কুশীলবরা মহিলার একদা পরিচিত। উনি বোধহয় ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা অনুভব করে আর ধৈর্য্য ধরতে পারেননি, থানায় ছুটে এসেছেন সব জানার জন্য।

সে মুখটাকে নীরস করে উৎসাহে জল ঢালা গলায় বলল,

-"আপনি কি কিছু দেখেছেন বা শুনেছেন এ ব্যাপারে? যা বলার একটু চটপট বলুন, আমি নোট করে রেখে দেব, বড় সাহেব এলে তাকে দিয়ে দেব। তারপর তিনি যদি মনে করেন আপনার সঙ্গে কথা বলে নেবেন। ঠিকানাটা কী যেন?"

মিসেস থমাস এখানেই হোলি চাইল্ড স্কুলে পড়াতেন, সারাজীবন অনেক ছাত্রছাত্রী ও তাদের গার্জিয়ানদের চরিয়ে মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান অসীম। উনি ধাওয়ানের ইঙ্গিতগুলো বুঝতে ভুল করলেন না। মুখটাকে শক্ত করে উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে,

-"অফিসার, আপনি যখন এ কেস সম্বন্ধে কিছু জানেন না তখন আপনার সঙ্গে কথা বলার কোনো মানে হয়না। এক কাজ করুন, আমার বক্তব্যের জায়গায় শুধু আমার নাম শেলী থমাস ও ঠিকানা একশ বারো অভিজ্ঞান অ্যাপার্টমেন্ট লিখে রেখে দিন। ও, আর তার সাথে এও লিখুন যে আমি নিখোঁজ রাজেশ্বরীর পরিবারকে অনেক দিন ধরে ভালোভাবে চিনতাম, তাই তাদের সম্বন্ধে কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে পুলিশ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। এবার আমি আসি।"

উনি আর কোনোদিকে না তাকিয়ে একহাতে স্টিকটাকে শক্ত করে ধরে আর অন্যহাতে কাপড়ের ঝোলাটা নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন। ধাওয়ান এই আকস্মিক ব্যবহারে একটু হতভম্ব হয়ে গেল, তাই যতিন্দর মিসেস থমাসকে যেতে দেখে "কী হয়েছে" বলে যখন এগিয়ে এল তখন সে হাত দুটো উল্টে দিল, মুখে কিছু বলল না।

যতিন্দর ছোট সাহেবের দিকে তাকিয়ে যেন অবস্থাটা অনুভব করে একটা চুক চুক শব্দ বের করল মুখ থেকে,

-"এই মেমসাব তো খুব ভালো, অনেককাল এলাকায় আছেন। টীচার ছিলেন, লোকে খুব শ্রদ্ধা করে। কোনো ব্যাপার না হলে এমনি এমনি উনি সময় বরবাদ করতে থানায় আসবেনা।"

ধাওয়ান এমনিতে সহজে বিচলিত হয়না, পুলিশের চাকরিতে তার উচ্চাশা কিছু নেই, যতটুকু না করলে নয় ততটুকু করে। তবু আজকের এই ব্যাপারটা একটু কেমন কেমন লাগল, মুখটায় একটা তেতো ভাব! সে চিন্তা করতে থাকল ঘটনাটা রাজপালকে বলা ঠিক হবে কিনা।

রাজপাল যখন ফিরল রাত্তিরে তখন সকালের ঐ বয়স্ক মহিলা তার মাথার কোথাও নেই। সে তখন ব্যস্ত লাশের পোস্টমর্টেম ও ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের সাথে আলোচনা নিয়ে। এমনিতে অনেক কথা বলল,বেশ চনমনে, খুশী খুশী। থানার কিছু মামুলী ব্যাপার নিয়েও কথা হল ধাওয়ানের সাথে,কিন্তু এবিষয়ে কোনো কিছুই বলল না। তাই দেখে ধাওয়ানও ব্যাপারটা চেপে যাওয়াই স্থির করল, তবে কী ভেবে নাম ঠিকানা লেখা কাগজটা ফেলে না দিয়ে ড্রয়ারের ভেতর দিকে ঠেলে দিল!

মর্গ থেকে বেরিয়ে এসে অর্ক আর পারলনা, রাস্তার একধারে গিয়ে পেটের ভেতরের সবকিছু উগরে দিল। এতদিন সিনেমা টেলিভিশনেই দেখেছে, এই প্রথম সে কোনো সত্যিকারের মর্গে পা দিল।

সঙ্গের পুলিশটি ভার্মার জুনিয়র, একটা জলের বোতল নিয়ে তার দিকে এগিয়ে এল। বোতল থেকে জল নিয়ে মুখেচোখে দিয়ে একটু ধাতস্থ হয়ে সে একটা কৃতজ্ঞ দৃষ্টি দিল ছেলেটির দিকে।

-"আপনি গাড়ী চালিয়ে যেতে পারবেন না আমি আমাদের ড্রাইভারকে বলব ভ্যানে করে ছেড়ে আসতে?"

ছেলেটির গলায় সহানুভূতির স্বর। অর্ক তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আস্তে আস্তে একটু দুরে পার্ক করা গাড়ীর দিকে গেল। লক খুলে গাড়ীর এসিটা চালিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। একটু দুরে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের ভ্যান। জুনিয়র অফিসারটি কনস্টেবলকে নিয়ে গাড়ীতে উঠতে যাবে, তার মোবাইল বেজে উঠল বোধহয়। ফোন কানে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ড্রাইভারকে কী ইশারা করে অর্কর গাড়ীর দিকে এল। ওকে আসতে দেখে অর্ক কাঁচটা একটু নামালো,

-"আপনার মোবাইল কি সুইচ অফ করা আছে? ভার্মা সাহেবের ফোন। নিন, কথা বলুন।" অর্কর খেয়াল হল মর্গে ঢোকবার আগে ফোন অফ করে দিয়েছিল। পকেট থেকে বার করে সুইচ অন করতে করতে ভার্মার ফোন ধরল। কথা শেষ হলে ছেলেটিকে ফোন ফেরত দিল। একটু হেসে ছেলেটি বিদায় নিয়ে চলে গেল। ওদের ভ্যানটা বেরিয়ে যেতেই অর্কও গাড়ী চালু করল। একটু ভালো লাগছে এখন। ভার্মা থানায় যেতে বলেছে একবার, কী সব ফর্মালিটীজ আছে। এমনিতে আজকে তার অফিস থেকে ছুটি নেওয়া আছে। যদি কাজ মিটে যায় তাহলে কী অফিস চলে যাবে সেকেন্ড হাফে না খেয়েদেয়ে বাড়ীতে আজ বিশ্রাম নেবে ভাবতে ভাবতে বর্ডার পেরোল।

থানায় পৌঁছতেই একজন ওকে ভার্মার ঘরে নিয়ে গেল। অর্ক প্রথম থেকেই দেখেছে ভার্মার ব্যবহার একটু বেশী ভদ্র, ওর অন্যান্য জাতভাইয়েদের মত নয়। শান্তিবিহারের রাজপালের দৃষ্টির সামনে দাঁড়ালেই ওর কেমন যেন কোনো অপরাধ না করেও নিজেকে অপরাধী স্বীকার করে ওর হাতে সঁপে দিতে ইচ্ছে করে, এমনই এক মানসিক যন্ত্রনার উদ্রেক হয়!

শুধু এদের সাহায্যেই রাজীকে খুঁজতে হবে, তাই চুপ করে ঐ রাজপালকে সহ্য করে। আজ দিল্লীর মর্গে যাবার সময় সে বেশ অস্বস্তিতে ছিল, হয়ত রাজপালের সঙ্গে বা রাজীর বাবামা কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। এমনিতে রাজীর বাবা মা ওর বাড়ী আসেনি, ওর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টাও করেননি। একদিন শুধু রাজীর বাবার উপস্থিতিতে রাজপাল ওকে ডেকে পাঠিয়েছিল শান্তিবিহার থানায়। একদা স্নেহপ্রবণ শ্বশুরের ওরকম ঠান্ডা কাঠকাঠ ব্যবহার দেখে অর্ক অবাক। উনি ওর সঙ্গে একান্তে কথা বলার চেষ্টাই করলেন না, সব কথা ঐ রাজপালের মাধ্যমে। ওর অপরাধ কী? সেদিন রাতে সঙ্গে সঙ্গে ওদের জানায়নি, পুলিশে খবর দেয়নি, সেজন্যে সে নিজেও তো এখন আফশোষ করছে, কিন্তু ওরা বুঝছে না, একবার বোঝাবার সুযোগও দিচ্ছেনা!

-"আসুন ব্যানার্জী সাব। চা খাবেন না কফি?"

কিছু খাবেনা বলা সত্বেও ভার্মা কফি আনাল। জোর করেই খাওয়াল। স্টিম্যুলান্ট, নার্ভ স্টেডি করতে সাহায্য করবে। ইচ্ছে না করলেও কফিটা জোর করে খেল অর্ক। গরম খাবার পরে কিন্তু অনেকটা চাঙ্গা লাগছিল। ভার্মা শান্তভাবে অপেক্ষা করছিল তার কফি শেষ হওয়ার। অর্কই শুরু করল,

-"ইন্সপেক্টর, কী বীভৎস দৃশ্য! কিন্তু আপনারা ভুল করছেন, ও বডি রাজী মানে আমার ওয়াইফের নয়। আমি আপনার অফিসারকেও বলেছি।"

ভার্মা অবাক হয়না, এতদিনের পুরনো জল খেয়ে ফুলে ওঠা লাশ দেখে এরা সহজে চিনতে পারবে সে আশা করেনি। রাজপালের কাছে শুনেছে মেয়েটার মা আসেনি, বাবা এসেছিল। তিনি অবশ্য এর মত জোর দিয়ে কিছু বলেননি তবে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সে এবার ড্রয়ার থেকে একটা প্যাকেট বার করে খুলে অর্কর সামনে রাখে। গলার মঙ্গলসূত্র। কানেটানে গয়না ছিলনা বা জলে পড়ে গেছে, হাতে একটা সোনার চুড়ি আছে তবে সেটা খোলা যায়নি, পোস্টমর্টেমের সময় দেখা যাবে। খুব নরমস্বরে ভার্মা বলে

-"দেখুন তো সাব, এটা চিনতে পারেন কিনা?"

অর্ক একটু তাকিয়ে রইল। রাজীর গলার মঙ্গলসূত্র! হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। রাজী এক মঙ্গলসূত্র খুব বেশিদিন পরেনা। একাধিক সোনার চেন ও মঙ্গলসূত্র আছে, সেও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরতে ভালোবাসে। গয়না খুব বেশি আগে পরতনা, ইদানীং পরতো, তবে ভিড় বাজারে যাবার আগে খুলেই যেত বোধহয়। ওর গয়না সব রাজীর মায়ের শান্তিবিহারের ব্যাঙ্কের লকারে থাকে। অর্ক কোনোদিন খুঁটিয়ে দেখেনি ওর গয়নাগাঁটি শুধু ওর নিজের দেওয়া একটা হীরের আংটি মনে আছে। সেও রাজী সবসময় আঙুলে পরতনা।

-"এই গয়না কিস্যু প্রমাণ করেনা। এরকম গয়না তো যার হোক হতে পারে। আমি এদেখে কিছু বলতে পারছিনা।"

ভার্মা চুপ। এবার অর্ক একটু অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে,

-"আপনারা বিশ্বাস করুন আমি বলছি ঐ বডি আমার স্ত্রীর নয়। আপনারা এসব করে সময় নষ্ট করছেন, যেভাবে হোক কেস চাপা দেবার চেষ্টা করছেন। প্লীজ এসব না করে আমার স্ত্রীকে খুঁজে বার করুন।"

এবার ভার্মা নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে। তারপর ধীরে কিন্তু একটা কঠিন পুলিশী স্বরে বলে,

-"আপনার স্ত্রীর কেস আমরা খুব সিরিয়াসলী নিয়েছি মিঃ ব্যানার্জী সে আপনি আমাদের যাই মনে করুন। এই হারটা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন। মঙ্গলসূত্র টা টিপিক্যাল দক্ষিন ভারতের, লকেটে লক্ষ্মীমূর্তি, ভারী সোনার, এদিকে এরকম ডিজাইনের চল নেই। আপনার স্ত্রীর মাকেও দেখানো হবে। উনি হয়ত আপনার চেয়ে ভালো বলতে পারবেন। গয়নাতে দোকানের মার্ক আছে। ওনাদের কাছে দোকানের নাম জেনে সেটাও কনফার্ম করা যাবে।"

অর্ক এতগুলো কথা শুনে কেমন থম মেরে যায়। তারপরে একটু তেরিয়া হয়ে চ্যালেঞ্জের সুরে বলে,

-"একই দোকানের গয়না বলে প্রমাণ হয়ে গেলে কি আপনারা ধরে নেবেন এই মহিলা রাজী? অন্য কোনো মহিলা একই দোকানের গয়না পরতে পারেনা? এই শহরে দক্ষিণীদের পপুলেশন জানেন আপনি?"

ভার্মা এবার আরও কড়া হয়ে বলে,

-"আপনিই বা কেন এত শিওর হয়ে বলছেন যে বডিটা আপনার স্ত্রীর নয়? বডির অবস্থা দেখে চেনা যাচ্ছেনা, এছাড়া আর কোনো কারণ আছে কি? এমন তো নয় যে আসলে আপনি জানেন আপনার স্ত্রী কোথায় বা তার বডি কোথায়, আপনিই তার পরিণতির জন্যে দায়ী। যেভাবে সব ঘটনা ঘটছে তাতে লোকের তো এরকমই মনে হবে আর জেনে রাখুন হচ্ছেও।আমি আপনার ওয়েল উইশার হিসেবে বলছি ব্যানার্জী সাহেব, পুলিশের কাজে সম্পূর্ণ সহযোগীতা করুন, এরকম অসহিষ্ণু হয়ে উল্টোপাল্টা কিছু করবেননা, শুধু কেসের জন্যেই নয়, নিজের ভালোর জন্যেও। "

ওঝার মন্ত্রপড়া জল পড়লে সাপ যেমন ফণা নামিয়ে নেয়, অর্কও সেরকম মাথা নামিয়ে ফেলল। ভার্মা সুরটাকে একটু নরম করেও বেশ পুলিশী চালে বলল,

-"আমরা আপনার কাছে এই কেসে কো-অপারেশন চাইছি মিঃ ব্যানার্জী। আপনি পুলিশকে তার কাজ তার মত করে করতে দিন। শুধু গয়না দিয়েই আমরা প্রমাণ করবনা এ লাশ আপনার স্ত্রীর। আরো অনেক উপায় আছে, সমস্ত দিক দিয়ে নিঃসন্দেহ হলে তবেই আমরা পাকাপাকি ঘোষণা করব এ লাশ কার। তবে আপনি চিন্তা করুন যে এরপরে পোস্টমর্টেম করা হলে সেখানে কী রিপোর্ট আসবে। যদি এ মার্ডার হয় তবে তা কোনো চোর ডাকাতের কাজ নয়। তারা এত ভারী ভারী গয়না ছেড়ে যেতনা। খুনের মোটিভ কী হতে পারে, আপনার স্ত্রীর বা আপনাদের কারো সাথে কোনো শত্রুতা ছিল কিনা এসব নিয়ে ভাবুন বাড়ী গিয়ে। আমাদের কাজ আমরা করি, আপনিও আমাদের সাহায্য করার চেষ্টা করুন।

অর্কর সব গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে, মাথার মধ্যে কিচ্ছু ঢুকছেনা। আর কোনো কথা না বলে ও উঠে পড়ল। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল থানার দরজা দিয়ে। ভার্মা একবার অর্কর যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে ফাইলে চোখ রাখল। কিন্তু মন দিতে পারলনা, চোখের সামনে ভেসে উঠছে অর্কর অসহায় দৃষ্টি, ওর ধীরে ধীরে চলে যাওয়ার ছবিটা। ভার্মার কপালে চিন্তার রেখা, এ যদি অর্কর অভিনয় হয় তো ও বলিউডের বড় বড় অভিনেতাদের চ্যালেঞ্জ দিতে পারে। আর তা যদি না হয়, এ কেস জটিল হচ্ছে। কি ভেবে সে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল, পোস্টমর্টেম জলদি করিয়ে রিপোর্টটা চাই, রাজপালের সঙ্গে কথা বলতে হবে!

বসের চেম্বারে অনেকটা ফালতু সময় কেটে গেল। একটা ফাইল নিয়ে কথা বলতে গিয়েছিল রাই। ওনার রিটায়ারমেন্টের বেশী দেরী নেই। সেসব নিয়ে, ছেলেমেয়ের চাকরির কথা, বাড়ির কথা, অনেকক্ষণ ধরে ভ্যাজালেন। রাই হাসিহাসি মুখ করে বসেছিল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে অসম্ভব বিরক্তি। ভদ্রলোক কাজের নন একেবারেই, অথচ ওপরচালাকি আর চুকলিবাজিতে ভীষণ দড়। অল্পদিন হল ওদের ডিপার্টমেন্টের হেড হয়ে এসেছে রিকোয়েস্ট দিয়ে। এইটুকু সময়েই সবার যাকে এদেশীরা বলে জীনা হারাম করে দিয়েছে, নিত্য অশান্তি, অব্যবস্থা। আর মাস দুয়েকের মত থাকবে, তাও যেন ওরা আর পারছে নাআআ।

সীটে এসে দেখল মোবাইলটা পড়ে আছে, খেয়াল করে হাতে নিয়ে ভেতরে ঢোকেনি। এতক্ষণের বকবকানি শুনে মাথা ধরে গেছিল, ফোন করে চা আনতে বলল। তারপরে মোবাইলটা তুলল বাড়িতে মেয়েটা ফিরল কিনা জানতে। একটা মিসড কল পড়ে আছে, নাম্বারটা অচেনা, ল্যান্ডলাইনের। বাড়িতে ফোন না করে আগে ঐ নাম্বারটাই টেপে। একটি অচেনা পুরুষ গলা রুক্ষভাবে জিজ্ঞেস করে ওঠে,

-" কী চাই, কী দরকার?"

দমে যায় রাই, তবু একটু জোরে বলে,

-" এই নাম্বার থেকে একটা ফোন এসেছে আমার ফোনে, এটা কোথাকার নাম্বার?"

এবার লোকটি গলাটা একটু স্বাভাবিক করে বলে,

-" এই ফোন থেকে? এটা তো থানার ফোন। আপনি কে, কোথা থেকে বলছেন?"

রাইয়ের মাথায় সঙ্গে সঙ্গে ভার্মার নাম এল। থানা থেকে ভার্মা ফোন করেনি তো! সে আন্দাজেই বলল,

-"থানা? ওখানে কি ভার্মা সাহেব আছেন? থাকলে তাকে বলুন আমি রাই ম্যাডাম কথা বলছি।"

লোকটা এবার কী বলল শোনা গেলনা। একটু স্তব্ধতা, তারপরেই ভার্মার শান্ত ভদ্র গলা ভেসে এল,

-"ম্যাডাম, আমিই আপনাকে ফোন করেছিলাম। অফিসে ব্যস্ত, ডিসটার্ব করেছি?"

-"আরে না না। আসলে আমি একটু অন্য জায়গায় কাজ করছিলাম, মোবাইলটা আমার সীটে এখানে পড়ে ছিল। কিন্তু সেকথা থাক, কী ব্যাপার বলুন তো?"

ভার্মা গলার স্বর নামিয়ে বলল,

-"পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট এসে গেছে। গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। মার্ডার বাই স্ট্র্যাঙ্গুলেশন, তবে একটা জিনিস, ফাঁস লাগানো হয়েছে পিছন থেকে, হয়ত বা অতর্কিতে এবং বেকায়দায়। এমন কোনো অবস্থায় যে ভদ্রমহিলা কোনো বাধা দিতে পারেননি, কোনো স্ট্রাগলের চিহ্ন অন্তত মহিলার শরীরে কোথাও নেই। আপনি কি রিপোর্ট দেখবেন? অবশ্য তাতে অনেক ডাক্তারি টার্মস থাকলেও সার আমি যা বললাম তাই।"

রাই কথার মাঝখানেই অধৈর্য হয়ে পড়ল,

-"রিপোর্ট যদি দেখান তো দেখব তো বটেই কিন্তু ঐ মহিলাটিই যে রাজেশ্বরী তা কিভাবে প্রমাণ হল?"

ফোনের এদিকে ভার্মার গলা শুনেই ওর গম্ভীর হয়ে যাওয়া মুখটা কল্পনা করে নিতে পারল রাই।

-"না ম্যাম, তা হলনা, বিশেষ করে ওর হাজব্যান্ড তো একেবারেই মানছেন না। সেদিন থানায় ডেকে বোঝালাম তবু আজও আমায় ফোন করেছিল, আমরা যেন ঐ লাশ পেয়ে ওনার স্ত্রী কে খোঁজা বন্ধ না করে দিই। দেখি আমি আজ যাচ্ছি রাজপালের থানায়, একটু কথা বলতে হবে এ ব্যাপারে। মিঃ ব্যানার্জী কেও নিয়ে যাব, ওদিকে ওর শ্বশুরও আসবে।

চুড়িটা যদিও সোনার নয়, মঙ্গলসূত্রটা মিসেস ব্যানার্জীর মা শনাক্ত করেছেন ওর মেয়ের বলে। বিয়ের সময় কেনা, গুরগাঁওর এক নামকরা দক্ষিণের দোকানের শাখা থেকে। সে দোকানেও দেখানো হয়েছে, চার বছর আগের রেকর্ড দেখে ওরা কনফার্ম করেছে এইরকম হার ওরা রাজেশ্বরীর বাবাকে বেচেছেন বলে।"

-"তাহলে এখন কী করবেন?"

-"দেখি, রাজপাল আর এই দুই পক্ষর সঙ্গে মোলাকাতটা হোক। আপনি আর কিছু জানতে পারলেন? মোটিভ কী হতে পারে সে সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া?"

রাই সেরকম কিছুই এখন ভাবতে পারছেনা। মিসেস গোয়েলকে ধরে রাজীর স্কুলে একটু আলাপ করবে ভেবেছিলো, কিন্তু উনি এখন এখানে নেই, বাইরে গেছেন। তবে ওর পাশের ফ্ল্যাটের মহিলা বললেন যে দুএকদিনের মধ্যেই এসে পড়বেন। নিরুদ্দেশের মোটিভ আর খুন হওয়ার মোটিভ দুটো একদম আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে, ভার্মারও তাই মত!

রাইয়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলে ফোন রাখতেই ভার্মা দেখল অর্ক ঢুকছে। এই কদিনে অর্কর চেহারা বেশ খারাপ হয়ে গেছে, সেই ঝকঝকে স্মার্ট ভাব যেটা শুরুতে দেখেছিল ভার্মা সেটা আর নেই, একটু কেমন ঢিলেঢালা ভাব, খোঁচাখোঁচা অল্প দাড়ি, টী শার্ট আর জিনসও কেমন মলিন। ভার্মা দুজনের কফি দিতে বলল। কফি খেয়েই ওরা বেরিয়ে পড়ল পুলিশের জীপে, অর্কর গাড়ি রইল থানার সামনে। রাজপালের ওখানে পৌঁছে গেল মিনিট কুড়ির মধ্যেই।

অর্ক রাজপালের ঘরে ঢুকে দেখল রাজীর বাবা বসে আছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে একেবারে রাজপালের পাশেই টেবিলের ওধারে, বিরোধী পক্ষের মত। ওকে দেখে একটু শীতল দৃষ্টি হেনে চোখ সরিয়ে নিল, রাজীর মা আসেনি।

রাজপাল আজ আবার ভদ্রতা ও বিনয়ের একেবারে অবতার, উঠে দাঁড়িয়ে হাঁকডাক করে ভার্মা আর অর্ককে বসাল, "আসুন ভার্মাজী, ব্যানার্জীসাব, কী সৌভাগ্য", যেন ওর নিমন্ত্রিত অতিথি এসেছে সব!

সঙ্গে সঙ্গে চা এসে গেল। ভার্মা অবশ্য এসবে অভিভুতও হয়না, অস্বস্তি বোধও করেনা। দিব্যি তারিয়ে তারিয়ে দুধ মালাই দেওয়া উৎকৃষ্ট চা শেষ করে তারপর কাজের কথায় আসে। রাজীর বাবার উদ্দেশ্যে বলে,

-"তাহলে সাব আপনি ও আপনার মিসেস, আপনারা শিওর যে গয়না আপনার মেয়েরই ও বডিটাও আপনার মেয়ের? এদিকে মিঃ ব্যানার্জী বলছেন বডিটা ওর স্ত্রীর নয়।"

গিরীশকে কথা বলতে না দিয়ে রাজপাল হাঁ হাঁ করে ওঠে,

-"কী যে বলেন ভার্মাজী, গয়নার দোকানে তো আপনার লোকও গেছিল। একজন অপরিচিত মহিলার কাছে ঐ গয়না আসবে কীভাবে! তর্কের খাতিরে যদি মেনে নিই ঐ মহিলা মঙ্গলসূত্র চুরি করেছে তাহলে একটু বেশি বেশি কাকতালীয় ব্যাপার হবেনা? পোস্টমর্টেম বলছে মৃত্যু মোটামুটি ভাবে রাজেশ্বরীর নিখোঁজ হওয়ার রাতে বা তার কাছাকাছি সময়ে হয়েছে, মহিলাটির বয়স ধরণ গড়ন সবই রাজেশ্বরীর মত, শুধু বডি এতদিন আগের হওয়া ও জলে থাকা জনিত বিকৃতি ছাড়া। আমার মনে হয় এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, আর প্রমাণের আবশ্যকতাও দেখিনা। আমাদের দুই থানার উচিত একসাথে কাজ করে খুনীকে ধরা, যে গেছে তাকে তো আর ফেরানো যাবেনা।"

ভার্মা রাজপালের বক্তৃতার ফাঁকে দুই পক্ষের দিকে লক্ষ্য করে, গিরীশের মুখ ভাবলেশহীন, অর্ককে বেশ উত্তেজিত ও আহত দেখাচ্ছে।

রাজপাল থামতেই অর্ক প্রায় চেঁচিয়ে বলে ওঠে,

-"তার মানে আপনারা আমার স্ত্রীকে খোঁজা বন্ধ করে এই মহিলার খুনীকে খুঁজতে আরম্ভ করবেন?"

এবার সে রাজীর বাবাকে সরাসরি বলে,

-"আপনার মেয়েকে এতদিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা আর আপনি এই পুলিশ অফিসারের কথায় সায় দিয়ে চুপচাপ বসে থাকবেন? আপনি কী করে ভাবছেন ওটা রাজী? হতে পারে ও রাজীর বয়সী বা অন্যান্য মিল আছে কিন্তু আপনিও জানেন ও রাজী নয়। রাজীকে কেউ এভাবে তুলে নিয়ে যাবেই বা কেন আর খুনই বা কেন করবে, একবার কেউ এসব ভাববেন না আপনারা?"

গিরীশকে একটু দিশেহারা দেখাল, সে কিছু বলতে যাবে উত্তরে কিন্তু রাজপাল অর্ককে থামিয়ে দিয়ে কড়া ভাবে বলে,

-'আপনি একটু ঠান্ডা হন মিঃ ব্যানার্জী,আমরা পুলিশের লোক, অনেক কিছু করতে পারি আমরা। আপনার স্ত্রী যদি বেঁচে থাকে তাও খুঁজে বের করব, কিন্তু আপাতত আমরা কী করব সেটা আমার আর ভার্মাজীর ওপর ছেড়ে দিন। আপনি ঠিকই বলেছেন গিরীশ সাব মেয়ের বাবা, ওনার চেয়ে দুঃখ আর কারুর বেশী নয়, আপনারও নয়। আপনি যদি আমাদের সঙ্গে একমত না হন তাহলে আপনার বক্তব্য মেনে নিয়ে আমরা আপনার স্ত্রীর খোঁজ চালু রাখব। আবার উনি যদি মনে করেন এই ওর মেয়ে, তাহলে ওনার হাতে বডি তুলে দেব এবং ওনার মেয়ের খুনের তদন্ত করব। ঘটনা যাই হোক, সত্যি সামনে আসবেই। এমনও তো হতে পারে আপনি দোষী বলেই খুনের ঘটনাটা চাপা দিতে চাইছেন, বডি চিনতে অস্বীকার করে।"

এবার অর্ক একেবারে লাল হয়ে গেল রাগে কী দুঃখে কে জানে, সে পাল্টা কিছু বলতে যাবে, ভার্মা হাত তুলে থামিয়ে দিল।

ভার্মা এতক্ষণ কিছু বলেনি, রাজপালের মত কোনো এক পক্ষ অবলম্বন করে উকিল সাজার ইচ্ছে তার নেই, সে পুলিশী যুক্তি দিয়ে সব কিছু দেখে। এসব বাদানুবাদে সময় নষ্ট করার মত ইচ্ছে বা সময় তার নেই। রাজপালের দিকে তাকিয়ে বলল,

-"এত কথার দরকার নেই রাজপাল জী, আমার সঙ্গে ফরেনসিকের বড় সাব মেহতা সাবের কথা হয়ে গেছে, ওরা ডিএনএ ম্যাচ করাবে। তার রিপোর্ট আসা অবধি আমরা অপেক্ষা করি, তারপরে বডি কার সেটাও কনফার্ম হয়ে যাবে। যদি মিসেস ব্যানার্জীরই হয় তখন কারা বডি নেবে সেটা এনারা ঠিক করে নেবেন আর আমাদের তদন্ত কোন দিকে যাবে সেটা আমরা। এতে আমার মনে হয় কোনো পক্ষেরই আপত্তি থাকার কথা নয়।"

অর্ক আর কিছু বলল না, ঘাড় নেড়ে সায় দিল, কিন্তু রাজপাল বেশ একটু দমে গেল, বড় অফিসারের নাম শুনে। খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বলল,

-"আপনি তো সব নিজে নিজেই করছেন, আমাকে কিছু বলার দরকারও মনে করেননা। মেহতা সাব আমাকেও ফোন করতে পারতেন, কেন শুধু আপনার সঙ্গেই কথা বললেন। এরকম ভাবে তো দুই থানা মিলে কাজ করা অসম্ভব হয়ে যাবে।"

ভার্মা রাজপালের চরিত্র টা এ কদিনে বুঝে নিয়েছিল, কিছু ঘটনাও ওর কানে এসেছে। উঠতে উঠতে একটু আলগোছে বলে,

-"আরে মেহতা সাব তো ট্রেনিং স্কুলে আমার স্যর ছিলেন, এমনিই ফোন করেছিলেন, একথা ওকথায় এই কেসের কথা উঠেছিল। তা আপনার আপত্তি থাকলে আমি ওনার সঙ্গে কথা বলে নেব, কিন্তু আর তো কোনো উপায় দেখিনা এই সমস্যার সমাধানের।"

ফরেনসিকের বড় সায়েব চেনাজানা ভার্মার, আর কাকে কাকে চেনে কে জানে, রাজপাল সামলে নিয়ে একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে এল।

-"আরে না না, এতো খুবই ভালো হয়েছে, উত্তম সিদ্ধান্ত, তবে মানে ..... "

ওর আমতা আমতার মাঝে এই প্রথম রাজীর বাবা কথা বলে উঠল, তার গলার পরিস্কার স্বর শুনে ভার্মা একটু অবাক হয়ে তাকালো,

-"না, এটাই ঠিক, যদিও আমার ভুল হয়নি তবু আমি চাই এনিয়ে কোনো সন্দেহ কেউ কোনোদিন যেন না করতে পারে, বলতে পারে যে আমরা ভুল করেছি। এই টেস্টে যদি প্রমান হয় আমি ভুল তাহলে আমাদের চেয়ে খুশী পৃথিবীতে আর কেউ হবেনা।"

অর্ক সবার আগে রাগ দেখিয়ে পা ঠুকে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে, কাউকে কিছু না বলেই, ভার্মা হাত মেলাতে গেলে রাজপাল আর অসন্তোষ ঢাকতে পারেনা, ফেটে পড়ে,

-"একবার যদি প্রমাণ পাই এই লোকটার বিরুদ্ধে, এক মিনিটও দেরী করবনা, লক আপে পুরব, আপনি দেখে নেবেন ভার্মাজী, হাঁ।"

ভার্মা হাসল, "আরে সে হলে তো আমিও আপনার সাথে হাত লাগাব, কোনো চিন্তা করবেন না। কিন্তু প্রমানটা তো চাই। ততক্ষণ ঠান্ডা থাকুন রাজপালজী, কুল, কুল।"

বেরিয়ে আসতে আসতে চোখের কোণ দিয়ে যে দৃশ্য দেখল ভার্মা তা হল রাজপাল খুব উত্তেজিত হয়ে রাজীর বাবাকে কীসব বলছে, এবং গিরীশ তাকে আশ্বস্ত করছে।

কয়েক দিনেই এই বাড়ীটা আর তার লোকেরা কেমন হয়ে গেছে, একটা ঘটনা কিভাবে সব কিছু বদলে দিয়েছে। আবার সব স্বাভাবিক হবে তো!

অঞ্জনার খুব খারাপ লাগছে আজ এসে থেকে, মনে হচ্ছে না এলেই হত। অথচ এরকম একটা সময়ে মা ভাইয়ের পাশে এসে দাঁড়ানো তার কর্তব্য। অর্ক তো সেরকম কোনো কথাই বলছেনা, গম্ভীর। কালও ফোনে যখন কথা হল তখন রাজীর লাশ পাওয়ার ব্যাপারে কিছু বলেনি দিদিকে। এখানে এসে মায়ের মুখে যখন সব শুনল তখন তো ও হতবাক। ভেবেছিল কলেজের বন্ধু একজন রিপোর্টার আছে, তাকে বলে একটা নিউজ করবে রাজী হারানোর ঘটনাকে নিয়ে পুলিশের গাফিলতির কথা লিখে, তারই জন্যে তড়িঘড়ি এল, বর ছেলেকে রেখে। অর্ক লাশের ব্যাপারটা জানিয়ে দিলে দুদিন পরে কুট্টুর পরীক্ষা শেষ হলে সবাইকে নিয়ে ধীরেসুস্থে আসতে পারত।

অর্ককে ও বুঝতে পারছেনা। অর্ক ওদের সবার খুব আদরের, বিশেষ করে ওর। ছোট থেকে ভাইকে আগলে আগলে চলত, কারুর ভাইকে কিছু বলার জো ছিলনা ওর সামনে। ভাইও দিদি বলতে অজ্ঞান। বড় হয়ে অবশ্য যে যার নিজের জগতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তবু কোনো সমস্যায় পড়লে অর্ক দিদির কাছেই আসত। আর কিছু না হোক অন্তত দিদিকে সব কথা বলে হালকা হতে চাইত।

কিন্তু রাজীর সঙ্গে ওর কোনো মনান্তরের কথা ঘুনাক্ষরেও বলেনি কোনোদিন। বাবা চলে যাওয়ার পরে দুজনেরই মাকে নিয়ে সবসময় চিন্তা থাকে, কথা হয় অনবরতই, মা, কলকাতার বাড়ী এইসব নিয়ে। রাজীর এরকম পরিবর্তনের কথা নিয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি। মার কাছে অল্পবিস্তর শুনে ওর মনে হয়েছে এটা চিরাচরিত শাশুড়ী বউ জনিত সমস্যা। মায়ের রাজীকে নিয়ে নালিশকে কোনোদিনই খুব একটা পাত্তা দেয়নি তাই। আজ মনে হচ্ছে সে কী তবে ঠিক করেনি? আর একটু মনোযোগ দেওয়া উচিৎ ছিল, ভাইয়ের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলা উচিৎ ছিল? তাই বা কী করে করত, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে যেচে মাথা ঘামানো, এতো তাদের শিক্ষাদীক্ষা রুচি বহির্ভূত কাজ হত!

কেমন অদ্ভুত আচরণ করছে ভাইটা ওর, ভুতে পাওয়া মানুষের মতন! বলছে ও লাশ নাকি রাজীর নয়, পুলিশ ভুল করছে। আজ দুপুরে পুলিশ স্টেশনে গিয়েছিল, মা বলল ফিরে এসে থেকে কেমন ক্ষ্যাপার মতন করছে, প্রচন্ড উত্তেজিত। ও আসতে ওকে বলেছে, "দিদি কিছু কর,ঐ শান্তিবিহারের পুলিশ আর রাজীর বাবা মিলে কোনো একটা ষড়যন্ত্র করছে"। এখন আবার একদম চুপ মেরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে, পরিস্কার করে আর কোনো কথাই বলছে না। অঞ্জনা তো কিছুই বুঝতে পারছেনা, রাজীর বাবা কেন ষড়যন্ত্র করবে, কার বিরুদ্ধে করবে? ওনার একমাত্র মেয়ে হারিয়ে গেছে বা মারা গেছে, ওদের অবস্থাও তেমন কিছু ভালো নেই নিশ্চয়ই। অঞ্জনা একজন মা, ও অনুভব করতে পারে রাজীর মায়ের ব্যথা। এর মাঝে অর্কর এই পাগলামি! অর্ক তো খুব বুদ্ধিমান ছেলে, এরকম একটা ব্যবহার করে কী করে!

খুব বিরক্ত লাগে, কী করবে ভেবে পায় না,বন্ধুকে ফোন করে। আগে ব্যাঙ্গালোর থেকে কথা বলে রেখেছিল, এখন তাকে পুরো ঘটনার এই নতুন মোড় সম্বন্ধে জানানো দরকার। বন্ধুটিও ওর মতেই মত দেয়,সত্যিকারের পুলিশ ঐ হিন্দি সিনেমার পুলিশের মত অত বোকা হয় না। তারা সবই করে, সবই করতে পারে তবে হয়ত সবকিছু প্রকাশ হয়না বা দোষীর সাজা হয়না, সে সেই নানা মহলের চাপ ইত্যাদিতে, পুলিশের অকর্মণ্যতায় নয়। আর এক্ষেত্রে তো সেরকম কোনো চাপের ব্যাপারই নেই, অর্ককে হ্যারাস করেছে ঠিক আছে, সেটা হয়ত কিছু পয়সাকড়ির জন্য। কিন্তু একটা লাশকে খামকা মিথ্যে মিথ্যে রাজীর লাশ প্রমান করে পুলিশের কী লাভ! তার চেয়ে নিরুদ্দেশের গল্পটা চালিয়ে গেলে তো ওরা অর্ককে বেশী বিরক্ত

করতে পারত। এরকম নানা আলোচনা করে একটু ভালো লাগল অঞ্জনার। শেষে বন্ধুটি রাজীর একটা ফোটো চাইল,একটা ছোটো নিউজ বার করতে চেষ্টা করবে। হলে ভালোই হবে, পুলিশও জানুক তাদের মিডিয়ায় জানাশোনা!

অন্যান্য বারে ও বা ওরা এলে এখানে কত হইহই হয়, কারণ ওরা আসে বড় কম। বাবা মারা যাওয়ার পরে তো সেরকম সবাই মিলে আসাই হয় নি। এক আধ বার কাজে এসেছে বা মাকে আনতে, সে একদিন দুদিনের জন্য, তবু তাতেও মা ভাই কত খুশী হয়েছে বিশেষ করে ভাই। আর আজ দুজনেই যে যার ঘরে ঢুকে বসে আছে। মা অবশ্য ওকে ডেকেছিল, ও যায়নি, গেলে তো সেই এক কথা রাজীকে নিয়ে আর তার সাথে মায়ের কান্না!

খিদে পেয়ে গেছে, রান্নাঘরে গিয়ে দেখল কী খাবার আছে। সব খাবার টেবিলে সাজিয়ে দুজনকে ডাকল একটু কড়া হয়েই। এভাবে চলতে পারেনা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অর্ককে স্বাভাবিক করতে হবে, তার সামনে পুরো জীবন পড়ে আছে!

অনেক বুঝিয়েও মাকে খাওয়ার টেবিলে বসানো গেলনা। শেষে একটু দুধ আর সঙ্গে একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে শুইয়ে দিল। অর্ক নামমাত্র খেয়ে উঠে চলে গেল নিজের ঘরে। অঞ্জনার ক্ষিদে পেয়েছিল, ভালো করে মাছের ঝোল মেখে ভাত খেল। অনেকদিন মায়ের রান্না খাওয়া হয়নি। ওদিকে সুজন আর কুট্টু টা কী করছে কী খাচ্ছে কে জানে! ওরা অবশ্য কদিন পরেই এসে পড়বে, কুট্টুর পরীক্ষা শেষ শনিবার। খেয়েদেয়ে রান্নাঘর গুছিয়ে আলোটালো নিভিয়ে বসার ঘরে এল। সারা ফ্ল্যাটটা নিস্তব্ধ, অন্ধকার। শুধু টেবল ল্যাম্প জ্বালিয়ে সেন্টার টেবল থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলে নিল। এত তাড়াতাড়ি ওর ঘুম আসবেনা। একবার ভাবল সুজনকে ফোন করে কিছুক্ষণ গল্প করবে, তাহলে হয়ত একটু ভালো লাগবে। তারপরে খেয়াল হল কাল সকালে স্কুল, ভোরে ওঠা, থাক, ঘুমিয়ে পড়ুক তাড়াতাড়ি।

বইয়ের পাতা খোলাই পড়ে রইল কোলের ওপর। বসে বসে রাজীর কথাই মনে হতে লাগল। ওর সঙ্গে রাজীর তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিলনা, আবার কোনো বিদ্বেষও ছিলনা। একমাত্র আদরের ভাইয়ের বউ, সে হিসেবে সম্পর্কটা হয় খুব আদরের বা খুব বিরূপ হওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু সেরকম কিছুই হয়নি। অর্কর বিয়ের অনেক আগেই ওর বিয়ে হয়ে গেছে। ভাইয়ের বিয়ের ব্যাপারে ও কোনোদিন কোনো কথা বলেনি, এনিয়ে ভাবেইনি। মা বাবা যা করেছে তা নিয়ে আর কিছু ভাবার দরকার বলে মনে করেনি।

কয়েক মাস আগে সুজন একদিন অফিস থেকে ফিরে বলল যে সে রাস্তায় রাজীকে দেখেছে। ওতো প্রথমে উড়িয়ে দিয়েছিল, রাজী ব্যাঙ্গালোরে অথচ ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি এ আবার সম্ভব নাকি! তার আগের রাতেই অর্কর সঙ্গে কথা হয়েছে, রাজী ওর মা বাবার কাছে কেরালায়। তবু সুজন বার বার বলল সে রাজীকেই দেখেছে পরিস্কার দিনের আলোয়, শপিং মলের মধ্যে ঢুকছিল। সুজনদের বাস সিগন্যালে দাঁড়িয়েছিল তখন। ওর কথায় শেষমেশ অর্ককে ফোনই করে ফেলেছিল কৌতূহলে। সুজন কী দেখেছে সে কথা না বলে রাজী এখন কোথায়, কবে ফিরবে এসব জিজ্ঞেস করেছিল। অর্ক কোনো সন্দেহ করেনি, সাদা মনেই জানিয়েছে রাজী তার বাবা মার কাছে ত্রিশুরে, দুদিন আগে ফোনও করেছে। সোজাসুজি না জিজ্ঞেস করে ভাইকে বলেছে, বেশী দুরে তো নয় রাজীকে ফেরার পথে ওদের বাড়ি হয়ে যেতে বলতে। কুট্টু মামীকে খুব পছন্দ করে তাই। অর্কও কথা দিয়েছে রাজীকে বলে দেখবে।

সুজন সব শুনে একেবারে ভোম্বোল, শপিং মলের মেয়েটাকে দেখতে অবিকল নাকি রাজীর মত। ও অনেকদিন থেকেই সুজনকে বলছে চশমা নিতে, কম্পিউটারে বসে বসে চোখদুটোর বারোটা বাজিয়েছে। শেষমেশ সুজনও হার মেনে পরদিন চোখের ডাক্তারের কাছে দৌড়েছে!

এখন কেমন মনে হচ্ছে সুজন ঠিক দেখেনি তো! রাজীর জীবনে এমন কিছু কী ছিল যা এরা জানেনা। হয়ত অনেককিছু রাজী নিজে বা ওর মা বাবা সঠিক বলেনি। না হলে একটা সাধারণ মেয়ে এভাবে খুন হবে কেন?

নানা চিন্তা নিয়ে কখন যে সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে জানেনা। ভোরবেলা কাজের মেয়ের কলিং বেলের আওয়াজে ঘুম ভাঙল। উঠে দরজা খুলতে খুলতে মায়ের গলা পেল, রান্নাঘরে। মা চা বসিয়ে মুখ ধুয়ে নিতে বলছে ওদের, একদম স্বাভাবিক, কিছুই হয়নি ভাব। স্বস্তি পাবে না চিন্তিত হবে ভাবতে ভাবতে বাথরুমে ঢুকল অঞ্জনা।

ভার্মার ফোন এল যখন মোবাইলে, রাই অফিসেই ছিল।

-"ম্যাডাম, ডি এন এ টেস্টের রিপোর্ট এসে গেছে। রাজপাল রাজেশ্বরীর বাবা মাকে খবর দিয়েছে। অর্কদের বাড়ি খবরটা দিতে যাব। একটু শক্ত হয়ে কথা বলাও দরকার এবারে, কেসটা জটিল হয়ে গেল। আপনি যেতে পারবেন আমার সঙ্গে? তাহলে আমি যাওয়ার পথে এই সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ আপনাকে তুলে নেব।"

রাই অল্প ধাক্কা খেল। অর্কর সেদিনের মুখটা মনে পড়ে গেল। যদিও একদিনের পরিচয় তবু এসময় রমা, অর্ক এদের সামনে দাঁড়ানোর ইচ্ছে ছিলনা। আবার ভার্মা এরকম একটা অনুরোধ করছে, এই প্রথম, তাকে না করতেও খারাপ লাগবে। দুর্বলতাটা ঠেলে ফেলে সে ভার্মাকে হ্যাঁ করে দিল। তারপরে তাড়াতাড়ি কাজ গুছোতে লাগল, আজ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে। অফিস ছুটির পরে এক দন্ডও দাঁড়াবেনা। আলোককে ফোন করে দেখল তার একটু দেরী হবে। ও ঠিক করল রিক্সা নিয়ে বাড়ি চলে যাবে।

ভার্মা এল কাঁটায় কাঁটায় সাতটায়। ওপরে এলনা, নীচে গেট থেকে ফোন করল। রাই তৈরী ছিল, আলোক সেইমাত্র ঘরে ঢুকেছিল। টুপাইয়ের কাল ম্যাথস টেস্ট, আলোককে বলল চা টা খেয়ে মেয়েকে নিয়ে বসতে।

সোস্যাইটীর বাইরে এসে দেখল ভার্মা একটা ইন্ডিকাতে এসেছে, পুলিশের ভ্যানে নয়। ওদের ওখান থেকে গার্ডেন সিটীর গেটে পৌঁছতে গাড়ীতে ঠিক দুমিনিট লাগল। ভার্মা এর আগেও এসেছে দু তিনবার, সিকিউরিটীরা চিনে রেখেছিল। বড় করে সেলাম ঠুকে গেট খুলে গাড়ী ভেতরে ঢুকতে দিল। অর্কদের বিল্ডিংয়ের নীচে এসে থামল গাড়ী। একটা অস্বস্তি কেমন বুকের চারপাশে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। ভার্মা বোধহয় কিছুটা আন্দাজ করতে পারছিল, লিফটে ঢুকে অল্প হেসে বলল,

-"আপনি ম্যাডাম যতটা ভাবছেন ততটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি নাও হতে পারে। মুখে যাই বলুক ওরা মনে মনে কিছুটা তো তৈরীই ইতিমধ্যে। বডি পাওয়া গেছে একটা, অর্ক আইডেন্টিফাই করতে গেছে। এছাড়া এতদিন হয়ে গেছে, মহিলার কোনো খবর নেই। সব মিলিয়ে এই খবরটার জন্যে কিছুটা প্রস্তুতি তো নিয়েছে ওরা। মিঃ ব্যানার্জী হয়ত একটু রিয়্যাক্ট করবে, অল্প চেঁচামেচি, এছাড়া কিছু হবেনা । আমি ওদের আসছি বলে ফোনও করেছি, আপনি রিল্যাক্স করুন।"

রাই ধরা পড়ে একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসল। অর্কদের বাড়ির দরজা খুললে এক মহিলা, রাইয়ের থেকে কিছুটা ছোটই হবে, পরনে জীনস আর কুর্তি। মুখের মিল আছে অর্কর সঙ্গে, রাইয়ের মনে হল এই অর্কর দিদি হবে। ভার্মা নিজের পরিচয় দিতে যাচ্ছে এমন সময় অর্ক উঠে এল। ওদের নিয়ে বসার ঘরে বসাল। রাই যা ভেবেছে ঠিকই, মহিলা অর্কর দিদি, অঞ্জনা। ওদের মাও বসেছিলেন, তিনজনে বোধহয় কথাবার্তা হচ্ছিল, সেন্টার টেবিলের ওপর খালি চায়ের কাপ। রাই একটু হেসে অঞ্জনাকে বলল,

-"আপনার নাম শুনেছি মাসিমার কাছে, কবে এলেন?"

-"এই তো, দুদিন হোলো। আপনার কথাও শুনছিলাম আমি। আপনি নাকি ডিটেক্ট করেন, খুব ইন্টারেস্টি ংতো?"

রাই বলতে যাবে যে সে সেরকম কিছু করেনা তার পেশা অন্য, তার আগেই ভার্মা বলে উঠল,

-"আমি খুব দুঃখিত, আসলে এরকম একটা খবর দিতে কখনই ঠিক ভালো লাগেনা, যদিও পুলিশের কাজই এরকম। মিঃ ব্যানার্জী, যে বডিটা আপনি দেখেছেন সেটা আপনার স্ত্রীরই, প্রমান হয়ে গেছে। ডি এন এ টেস্টের রিপোর্ট তাই বলছে, সন্দেহের আর কোনো অবকাশ নেই।"

সবাই যে যেমন ছিল বসে রইল, সারা ঘরে এক অদ্ভুত নীরবতা। অর্কও কোনো চিৎকার চেঁচামেচি ওরা যেমন ভেবেছিল কিছুই করল না। রাই সোফার হাতলের দিকে তাকিয়ে থাকে, চোখ তুলে কারো দিকে তাকাতে পারেনা।

কয়েক সেকেন্ড এভাবে কেটে যাবার পরে ভার্মা একটু নড়েচড়ে বসল।

-"আয়্যাম সরি। এসময় আপনাদের বেশীক্ষণ বিরক্ত করতে চাইনা। আমরা এখন উঠব।"

অবস্থা দেখে ভার্মা বোধহয় কড়া ভাবে কথা বলার সিদ্ধান্ত আপাতত মুলতুবী রাখল। রাই তাকিয়ে দেখল অর্কর দুচোখে কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টি, সেটা যে কী বা কেন, বুঝে উঠতে পারল না। রমা মুখ নীচু অবস্থাতেই অল্প ফুঁপিয়ে উঠলেন। অর্কর দিদি অঞ্জনা এবার হাল ধরল। মাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে থাকে সে। রাই আর ভার্মা উঠে দাঁড়াল বিদায় নিতে। অর্ক দেখেও দেখল না, কোনো কথা বলল না। ভার্মা অর্কর হাতদুটো ধরে একটু সান্ত্বনার ভঙ্গীতে ঝাঁকিয়ে দরজার বাইরে এল, পেছন পেছন রাই। দুজনে লিফটের সামনে বোতাম টিপে দাঁড়িয়েছে, অর্কদের দরজা খুলে অঞ্জনা বেরিয়ে এল। মুখটা অল্প দুঃখী দুঃখী। ওদের কাছে এসে বলল,

-"সরি, বুঝতেই পারছেন কী অবস্থা এখন। আপনাদের সঙ্গে সেভাবে কথাই হলনা।" এবারে সে সোজা তাকায় ভার্মার দিকে,

-"বডিটা রাজীর এটা কনফার্মড তো? ভাইয়ের কীরকম সন্দেহ আছে, ওতো লাশ দেখেছে।"

ভার্মা বলে,

-"আসলে সেটাই স্বাভাবিক। এতদিনকার লাশ তারওপর জলে ভাসা। মোটামুটি রিপোর্টে যা সময় দেওয়া আছে তাতে অনুমান, সেদিন রাতেই কোনো এক সময় মারা হয়েছে। রাজীর বাবার সঙ্গে ডি এন এ ম্যাচ করা হয়েছে, এছাড়া মঙ্গলসূত্র রাজীর মা ও জুয়েলারীর দোকান শনাক্ত করেছে। এরপরে আর সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকেনা।"

অঞ্জনা একটু চুপ থাকে তারপর বলে,

-"কিন্তু কেন? গয়নাগাঁটি পড়ে রইল, নিলনা, তারমানে এ সাধারণ চোরডাকাতের কাজ নয়। রাজীকে এভাবে তুলে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলার পেছনে মোটিভ কী থাকতে পারে, আমি তো ভেবেও কূল পাচ্ছিনা। এমনি মানে কোনো দৈহিক অত্যাচার করেনি তো?"

রাই চমকায়, ওর একথা কখনো মনে হয়নি কেন! অবশ্য না জিজ্ঞেস করতেই ভার্মা ওকে সবই বলছে, তাই হয়ত খেয়াল করেনি।

ভার্মা অঞ্জনা কে বলল,

-"না,সেসব কিছু নয়। তাই এটা সাধারণ দুবৃত্তর কাজ মনে হয়না। যাক,আপনি এখন আছেন তো কিছুদিন? কেসের ব্যাপারে আমাদের আরো জানার দরকার হতে পারে, পরে কথা হবে। এখন তো এটা মার্ডার কেস হয়ে গেল, আমাদের এখন অন্যদিকে চিন্তাভাবনা করতে হবে, মোটিভ ইত্যাদি। আপনার মা, মিঃ ব্যানার্জী,ওনারা একটু সামলে নিন, আমরা আবার পরে আসব।"

লিফট এসে গিয়েছিল, রাই কিছু না বলে অঞ্জনার হাতটা একটু ধরল।

অঞ্জনা একটু বিহ্বল, ভার্মার কথা শুনেই বোধহয়, অন্যমনস্কভাবে ওদের বিদায় জানিয়ে বলল,

-"হ্যাঁ, আমাকে এখন কিছুদিন থাকতেই হবে। আমার হাজব্যান্ড ছেলেকে নিয়ে আসছে দুদিন পরে। বডি কবে পাওয়া যাবে?"

এর উত্তর দেওয়ার আগেই লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল, ভার্মা রাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে,

-"আপাতত, উত্তরটা এড়ানো গেল। বডি নিয়ে দুবাড়ীর মধ্যে একটা গন্ডগোল হবে মনে হচ্ছে। বিশেষ করে মাঝখানে যখন রাজপাল আছে। একটা ভালো ব্যাপার, এই বোন মহিলা বেশ শক্ত মনে হয়। রাজপালকে কাউন্টার করতে এরকম একজনকে দরকার।"

রাই কোনো উত্তর করল না। ওর মাথায় নানান চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। ভার্মাকেও বেশ চিন্তাবিষ্ট মনে হল।

-' একবার বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে হবে। মোটিভ কী হতে পারে! মহিলার বাবা মাকে ভালো করে প্রশ্ন করা দরকার, কিন্তু ওরা রাজপালের পরামর্শে কাজ করছে। রাজপাল মহা ধুরন্ধর আর বদমায়েশ, সে থাকতে ওরা আমাকে সব কথা ঠিকঠাক খুলে বলবেনা, সব শেখানো কথা বলবে। রাজপালকে বাদ দিয়ে ওদের সাথে কথা বলতে বড়সাহেবের সাহায্য চাই মনে হচ্ছে।"

রাই শান্তিবিহারের থানা ইন চার্জ রাজপালকে চেনেনা, তবু ভার্মার কথায় কিছুটা আন্দাজ করতে পারছিল। সেও রাজীর বাবা মার সঙ্গে কথা বলতে চায়। রাজীর তরফের কারো কথাই এখনো শোনা হয়নি। বাড়ীর গেটে ভার্মার গাড়ী এসে থামল। রাই নামার আগে ভার্মাকে বলল,

-"যতদূর জানা গেছে ওদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিশাল কিছু সমস্যা ছিলনা। অর্ক সেদিন কটায় বাড়ী ফিরেছিল?"

ভার্মা একটু অবাক হল।

-"আপনাকে বলিনি? অর্ক সেদিন রাত দশটার পরে ফিরেছিল। ওদের সিকিউরিটীকে জিজ্ঞেস করেছিল আমার লোক। তারা আন্দাজ বলেছিল, এর বেশী রাত হলে নাকি খেয়াল করত।"

-"ঘটনাটা ঘটে কটার সময়?"

-অর্কর কথা অনুযায়ী সেদিন ওদের যেতে একটু দেরীই হয়েছিল। ওর ছুটির দিন ছিল, বিকেলে ঘুম থেকে উঠে বেরোতে বেরোতে সাড়ে ছটা বেজে গিয়েছিল। ঐ এরিয়া টা তো একটু ঘিঞ্জি ধরণের, রাস্তায় ট্র্যাফিকও ছিল,তাই গাড়ী নিয়ে পৌঁছতেও বেশ সময় লেগেছিল যদিও দুরত্ব বেশী নয়। দোকান সেরে ও যখন গাড়িতে স্ত্রীর জন্যে অপেক্ষা করছিল তখন পৌনে আটটা বেজেছিল। মোবাইলের রেকর্ডও বলছে অর্কর ফোন আন্দাজ ঐ সময়ই এসেছিল।"

-"পৌনে আটটা থেকে প্রায় দশটা অবধি ও রাজীকে খুঁজছিল? বাজারটা তো বিশেষ বড় এলাকা নয়।"

ভার্মা হাসল রাইয়ের প্রশ্ন শুনে।

-"আমিও এটা জানতে চেয়েছিলাম। অর্ক ফোন করেও কিছুটা সময় অপেক্ষা করে, তারপরে দোকানে যায় আবার। বাজারের দোকানগুলোতে দেখতে, লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে প্রায় ঘন্টা দেড়েক চলে যায়। বাড়ি ফেরে দশটার পরে। খোঁজাখুঁজি তে ঐ সময় লাগাটা অস্বাভাবিক নয় ম্যাডাম, তবে মিথ্যে হতেও পারে। বাজারের লোকেরা খোঁজ করতে দেখেছে তবে প্রত্যেক দোকানে গিয়ে খোঁজ করেছে বা অলিগলি কতটা সময় নিয়ে ঘুরেছে তা কে হলফ করে বলবে! "

-"ভার্মাজী, আর একটা কথা। রাজীর ইমেল অ্যাকাউন্ট চেক করেছিলেন? আজকালকার মেয়ে, ওদের বাড়ীতে কম্পিউটার আছে, নিশ্চয়ই ইমেল ব্যবহার করত। অর্ক যা বলছে তাতে ওর বন্ধুবান্ধব বলতে স্কুলের টীচাররা। এর বাইরে অর্কর কিছু জানা ছিলনা। মেল টেল যদি দেখা যায়, অর্ককে এ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?"

ভার্মা এবার একটু ঘাবড়ালো। তবে সামলে নিয়ে বলল,

-"না, ঠিক এদিকটা দেখা হয়নি। আসলে এতদিন তো কেসটা স্রিফ নিখোঁজের ছিল। সেটাও ভাবা হচ্ছিল, স্বামী স্ত্রীর গন্ডগোল। এবার এসব নানা দিক দেখতে হবে, খুনের তদন্তের মত করে। তবে ওর মোবাইলের কল রেকর্ড নেওয়া হয়েছে সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে থেকে। তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। শেষ কল অর্কর, যেরকম অর্ক বলেছে। পরে আর হ্যান্ডসেটটা ট্রেস হয়নি। হয়ত সিম খুলে ফেলে দিয়ে মেশিনটা কেউ নিয়ে নিয়েছে।"

-"গয়না ফেলে গেল আর মোবাইল নিয়ে নিল?"

-"নাও হতে পারে, মোবাইল খুনী নেয়নি হয়ত। সিম খুলে ফেলেটেলে দিয়েছে হবে, যাতে ট্রেস না হয়।"

-"সিম খুললেও তো মেশিন ট্রেস করা যায়?"

-"যায়, যদি কেউ ফোন টা ব্যবহার করে, এক্ষেত্রে সেটা হয়নি।"

রাই একটু ভাবনার স্বরে বলল,

-"স্বামী স্ত্রীর গন্ডগোল নিয়ে সঠিক জানতে হলেও তো বন্ধুদের খোঁজ জরুরী ছিল। শুধু রাজীর নয় অর্করও। রাজীর স্কুলের এক প্রাক্তন টীচার মিসেস গোয়েল আমার সোস্যাইটী তে থাকেন। তিনি ছুটিতে বাইরে গিয়েছিলেন, আজ ফেরার কথা। আমি কাল তার সাথে কথা বলব। এছাড়া যদি অসুবিধে না হয়, আমি একটু শান্তিবিহারের ঐ বাজার, মন্দির এলাকাগুলো ঘুরে দেখতে চাই। এছাড়া কোনো ভাবে যদি রাজীর মাবাবার সাথে কথা বলা যায়।"

ভার্মা সত্যিই ভদ্রলোক। উনি রাইয়ের কথায় কিছু মনে তো করলেনই না উল্টে কথা দিলেন রাজীর ইমেল সংক্রান্ত খবর বার করতে চেষ্টা করবেন। যাবার আগে এও বললেন যে রাইকে শান্তিবিহার ঘুরিয়ে দেখাবার ব্যবস্থাও করবেন শীগগিরই।

-"আপনি কিছু মনে করছেন না তো আমি এভাবে আপনার কাজে ঢুকে পড়ছি বলে, বিরক্ত করছি না তো?"

-"আরে না ম্যাডাম, আপনি গুপ্তা সাহেবের বন্ধু, ঐ কেসটাতে আপনি অনেক সাহায্য করেছিলেন আমার মনে আছে। এখানেও আপনার কাছে সেরকম সাহায্য পেলে তো আমাদেরই উপকার হবে। শুধু রাজপালের জন্যেই আমার চিন্তা। সে আপনি ভাববেন না, আমি দেখে নেব। এক কাজ করি,শান্তিবিহার থানার কনস্টেবল যতিন্দর আগে আমাদের এখানে ছিল। ও আমার খুব বাধ্য, শান্তিবিহারের লোক্যাল ছেলে, সব চেনে জানে ভালো। ওকে বলে দেব ওর অফ ডিউটিতে আপনাকে ঘুরে সব দেখিয়ে দেবে। আমার এখানের ছেলেদের সঙ্গে দিলে ওরা আপনাকে সব দেখাতে পারবেনা কারণ শান্তিবিহারে আমি একাই গিয়েছি ওখানকার থানার লোক নিয়ে।"

রাইয়ের প্রস্তাবটা ভালো লাগল। ওতো এটাই চাইছিল, ঐ মন্দিরের মেয়েটির সঙ্গে কথা বলবে নিজের মত করে, পুলিশ থাকবে না। সেরকমই কথা রইল যে রাজী সামনের শনিবার শান্তিবিহারে যাবে।

দিল্লীর আন্তর্জাতিক বিমাবন্দরের অ্যারাইভাল এই রাত দুপুরেও বেশ সরগরম, পরপর কয়েকটি ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট এসে পৌঁছেছে। লাগেজের ওখানে ভীড় জমেছে, যুবকটি সেদিকে একবার তাকিয়ে নিজের হাতের ট্রলি স্যুটকেশ আর কাঁধের ব্যাগ

নিয়ে একজিট গেটের দিকে এগিয়ে গেল। প্রায় ছ ফিটের ওপর হাইট,পরণে হলুদ টী শার্ট আর ব্লু ডেনিম। রঙটা একটু চাপা মানে প্রায় কালো বলা যায় এমন হলেও মুখচোখ বেশ আকর্ষণীয়, অবশ্য এখন একটু গম্ভীর, চিন্তাক্লিষ্ট দেখাচ্ছে।

বেরিয়ে একটু ইতস্তত করল, নজর করলে বোঝা যাবে সে এখানে নতুন, এই এয়ারপোর্টে আগে আসেনি। একবার ব্যাগের সাইড পকেট থেকে একটা কাগজ বার করল, নেটে ক্যাব বুক করে রাখা ছিল, নাম্বারটা ওরা মেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেটাই একবার চেক করে নিল। তারপরে দুরে দাঁড়ানো পাহারারত পুলিশটিকে জিজ্ঞেস করল, কোন দিক দিয়ে গেলে সে ক্যাবের কাছে পৌঁছবে। দিল্লী পুলিশের এমনি যতই বদনাম থাকুক, এয়ারপোর্টের পাহারাদার পুলিশ দেখা গেল যথেষ্ট হেল্পফুল। ভালো করে বুঝিয়ে দিল কোথা দিয়ে যেতে হবে, কোথায় বাঁকতে হবে ইত্যাদি।

বাইরে যাওয়ার আগে সামনের মোবাইল ফোনের কাউন্টারে গিয়ে একটা এখানের সিম নিল, আগেই খোঁজখবর করে কাগজপত্র তার রেডি ছিল, অফিসের পাঠানো। অসুবিধে হলনা।

ঘন্টাখানেক পরে ফোন চালু করিয়ে সে বাইরের রাস্তা ধরল। একটু যাওয়ার পরেই বেশ সোজা মনে হল, একদল লোক হাঁটছে, তাদের পেছন পেছন সেও চলল। মাঝে মাঝে শুধু খেয়াল করে নানা সাইন আর দিকনির্দেশক বোর্ডগুলো পড়ে নিচ্ছিল।

এমনি করেই পৌঁছে গেল এয়ারপোর্টের বাইরের রাস্তায়। নতুন এয়ারপোর্টের চারিদিক ঝকঝক করছে,আলোয় ঝলমল, একদিক নানা ট্যাক্সি সার্ভিসের ক্যাবগুলো দাঁড়িয়ে আছে। নাম্বার খুঁজে গাড়ীর কাছে গিয়ে বুকিংয়ের প্রিন্ট আউট দেখাতেই ড্রাইভার সীট থেকে বেরিয়ে এসে প্যাসেঞ্জারের দিকের দরজা খুলে দিল। সে কোনো কথা না বলে লাগেজ নিয়ে ভেতরে বসল। ড্রাইভার গাড়ী স্টার্ট করার আগে একবার গন্তব্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার উদ্দেশ্যেই বোধহয় ঘাড় ঘোরাল,

-"সাব,লীলা হোটেল হী যানা হ্যায় না?"

যুবকটিও উত্তরে ঘাড় ঈষৎ হেলিয়ে সম্মতি জানাল। এর বেশী বার্তালাপে তার অসুবিধে ছিল, সে হিন্দীভাষী নয়। ঘড়ির সময় সে এয়ারপোর্টেই সেট করে নিয়েছিল। এখন ঘড়ি দেখল, এখানের হিসেবে মধ্যরাত্তির। মোবাইলটা বার করে অ্যাড্রেস বুক দেখে দেখে কয়েকটা এস এম এস করল, তারপর গাড়ীর সীটে গা এলিয়ে চোখ বুজে রইল।

রাত হলেও লীলা হোটেলে ব্যস্ততার কমতি নেই, ইন্টারন্যাশনাল হোটেল। বেশ কিছু লোক লাউঞ্জে বসে, তাদের অনেকেই বিদেশী, বাইরে ভাড়াটে গাড়ীর লাইন, রিসেপশনে ব্যস্ত সুবেশ স্মার্ট একাধিক কর্মী। যুবকটি গিয়ে দাঁড়িয়ে তার নামধাম জানাতেই একটি ছেলে টুক করে কম্পিউটার দেখে বিশদ বার করে ফেলল। অফিস থেকে বুক করা হয়েছে। অল্প ফর্মালিটী মিটিয়ে ছেলেটিকে মালপত্র সহ ঘরে পৌঁছে দিয়ে এল পোর্টার।

ছেলেটি যখন ঘুম থেকে উঠল তখন খোলা পর্দা দিয়ে সকালের রোদ্দুর এসে পড়ছে সারা ঘরময়। চোখ খুলে কয়েক সেকেন্ড ভ্রু কুঁচকে চারিদিকে তাকালো শুয়ে শুয়েই, কোথায় আছে তা মনে করার চেষ্টা করল বোধহয়। সামনের দেওয়ালের ঘড়িতে সময় দেখে পাশে সাইড টেবিলে রাখা মোবাইলটা তুলে নিল, কতগুলো মেসেজ পড়ে আছে, একটা এখানের অফিসের হেডের। কাল ওনাকে ও এই নাম্বার জানিয়ে দিয়েছিল এস এম এসে, বেলা নটায় মিটিং!

আর দেরী না করে উঠে পড়ল, বাথরুমের দিকে যাবার আগে কী ভেবে, রুম সার্ভিসকে ফোন করে ব্রেকফাস্ট দিতে বলল, কাল রাত থেকে তেমন কিছু খাওয়া হয়নি, খিদে জবর পেয়েছে।

চান করে, শেভ করে সে যখন বেরিয়ে এল, তখন তার শরীরে ক্লান্তির আর লেশমাত্র নেই। বাইরে যাবার জন্য ড্রেস করার মধ্যেই গরম খাবার, ধোঁয়া ওঠা কফি আর সকালের কাগজ এসে গেল। জানালার পর্দা সরিয়ে দিল, বাইরে বাগান বড় বড় গাছ ঘেরা, অঞ্চলটা রাজধানীর ব্যস্ত এলাকা বলে মনেই হয়না। খাবার শেষ করে কফিতে চুমুক দিতে দিতে কাগজ খুলে ধরল, টাইমস। কয়েক পাতা আলস্যে উল্টোনোর সময় লোক্যাল নিউজের পেজে একদম নীচে কোণার দিকে একটা ছবিতে কেমন চোখ আটকে গেল, তারপরে খবরটা পড়ল, কয়েক লাইনের।

ছবিটা ভালো করে অনেকবার দেখল, তারপর কী মনে করে ঘরের অন্যপ্রান্তে গিয়ে ব্যাগ খুলে ল্যাপটপ বার করল। হোটেলের ঘরে নেট কানেকশন আছে, দ্রুত হাতে কম্পিউটার চালু করে মেল বক্স খুলল। কিছুক্ষণ পরে আবার কাগজ দেখল, এবার ছবির সাথে খবরটাও খুঁটিয়ে পড়ল।তরপরে কী চিন্তা করে মোবাইল তুলে নিয়ে একটা নাম্বার ডায়াল করল।

মিসেস সঙ্গীতা গোয়েলের সঙ্গে চেনা থাকলেও সেভাবে কোনোদিন কোনো অন্তরঙ্গতা হয়নি রাইয়ের। ভদ্রমহিলার স্বামী নেই, মেয়েকে নিয়ে থাকেন, খুব একটা কারোর সাথে মেলামেশা নেই। উনি কেন কে জানে প্রায়ই স্কুল বদলান। শম্পা বলে, আসলে এইসব স্কুলগুলোতে মাইনে খুব একটা ভালো দেয়না, তাই অপেক্ষাকৃত ভালো অফারের চক্করে উনি এদিক ওদিক করেন। অনেকের কাছে এটা শখের চাকরি হলেও মিসেস গোয়েলের কাছে হয়ত তা নয়। রাজীদের স্কুল "লিটল জয়ে" উনি কয়েক মাস আগেও পড়াতেন। রাই একদিন ওনাকে লিফট দিয়েছিল শপিং সেন্টার থেকে, সেদিনই উনি লিটল জয় ছেড়ে প্রয়াগ ইন্টারন্যাশনালে যোগ দিয়েছেন। প্লে স্কুল নয়, প্রাইমারী সেকশনে, বড় স্কুল, মাইনেও বেশী। খুশী ছিলেন তাই আনন্দে সব কথা বলে ফেলেছিলেন রাইকে। রাইও শুভেচ্ছা জানিয়েছিল। ফোনে একবার দেখা করার কথা বলতেই উনি বেশ খুশী হয়েই রাইকে বাড়ী আসতে বললেন।

এখন তাই রাই ওর সঙ্গে ওদের ব্যালকনিতে বসে আছে, সামনে টেবিলে চায়ের কাপ আর নমকীনের প্লেট। ভদ্রমহিলার সাথে দেখাসাক্ষাত করতে বোধহয় বিশেষ লোকজন আসেনা। উনি কী করবেন কীভাবে আপ্যায়ন করবেন তা নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, রাই কোনোক্রমে ওকে থামিয়েছে। একথা সেকথা হতে থাকল দুজনেরই মেয়েদের ও তাদের পড়াশোনা নিয়ে। ওর মেয়ে এখন ইলেভেনে, টুপাইয়ের থেকে অনেক বড়। চা শেষ হতেই রাই আর দেরী না করে তার আসার কারণটা জানাল।

মিসেস গোয়েল যা বললেন তাতে উনি রাজীকে মোটামুটি চিনতেন, ঘনিষ্ঠতা হয়নি। উনি একটু সিনিয়র তাছাড়া ওনার কাছে চাকরিটা দরকারী, অন্যদের মত শখের চাকরি নয়। তাই উনি খুব বেশী মেলামেশায় যেতেননা। অবশ্য প্লে স্কুলে স্টাফ আর কতজন থাকে, জনা পাঁচেক টীচার আর অ্যাকাউন্টের একজন, সুইপার মেড তিনজন। মিসেস প্রকাশ বেশ সিনিয়র, এসেছেন মিসেস গোয়েলের জায়গায়,রাজী আর দুটি মেয়ে মোটামুটি কাছাকাছি বয়সের, এছাড়া অবশ্য প্রিন্সিপ্যাল কাম মালকিন রাধা ম্যাডাম আছেন।

-"রাজীর কার সঙ্গে বেশী বন্ধুত্ব?"

-"ওরা তিনজন জুনিয়র গল্প গুজব সব একসাথেই করত, টিফিন খাওয়া। খুব বেশী কারো সাথে বন্ধুত্ব ছিল বলে জানিনা। রাজীর তো বেশীদিন হয়নি, আর আমিও ও আসার কিছুদিন পরেই ছেড়ে দিয়েছি। তবে রাজীকে দেখেছি অফ টাইমে কম্পিউটারে খুব কাটাত, ইন্টারনেটে।'

-"ইন্টারনেটে? প্লে স্কুলে কম্পিউটারে ইন্টারনেট আছে?"

-"হ্যাঁ আছে তো। একটা কম্পিউটার স্টাফ রুমে আর একটা রাধা ম্যাডামের ঘরে। এখন সব মডার্ন স্কুল, ছাত্রছাত্রীদের মাবাবার সঙ্গে মেলে যোগাযোগ করা হত। ঐ তিন টীচারের কারুকে দিয়েই এসব করাতেন প্রিন্সিপ্যাল। এছাড়া নানা জিনিস সব ডাউনলোড করতে, বাচ্চাদের জন্য খেলতে খেলতে পড়ানোর নানা আইডিয়া নেট খুঁজে দেখত, আমাদেরও দেখাত।"

-"রাজীর কোনো ই মেল অ্যাড্রেস আপনার কাছে আছে?"

-"না, আমার কাছে নেই। তবে আমার কাছে "লিটল জয়ে"র সবার মোবাইল নাম্বার আছে। আপনি বললে আমি ঐ দুজন জুনিয়র টীচার রীটা আর সোনাল কে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি।"

রাই সময় নষ্ট করল না, সম্মতি জানিয়ে সেই দন্ডেই মিসেসে গোয়েলকে অনুরোধ করল ঐ টীচারদের ফোন করতে ।

ফোনে একতরফা কথোপকথন শুনেই রাই ধরতে পারছিল, ওরা কেউ রাজীর ইমেল অ্যাড্রেস জানেনা। একটু হতাশই হল। মিসেস গোয়েল ফোন রেখে বললেন,

-"ওরা তো জানেনা বলছে। তবে রীটা একটা কথা বলল, রাজী মাঝে মাঝে কার সাথে চ্যাট না কীসব করত কম্পিউটারে, কোনো বন্ধুর সাথে বোধহয়। আমার মেয়েও এইসব চ্যাটট্যাট না কী বলে সেই করে বন্ধুর সাথে, সব এযুগের ছেলেমেয়েদের ব্যাপার, আমি বুঝিনা, আপনি জানেন?"

রাই ঘাড় নাড়ল, সে জানে। রাজীর সেরকম কোনো বন্ধুর কথা অর্ক জানেনা। চ্যাট মানেই যে কোনো বন্ধু বা ঘনিষ্ঠ কারুর সঙ্গে করছে তা নাও হতে পারে, কোনো ভার্চুয়্যাল বন্ধুত্ব হতে পারে। তবে এতটা কম্পিউটার স্যাভি যখন তখন রাজীর ইমেল নিশ্চয়ই ছিল, অর্ক জানবে। রাজীর মোবাইলটাও পাওয়া যায়নি। তবে ভার্মা মোবাইলের কল ডিটেলস নিয়েছে সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছ থেকে। তাতে সেরকম কারুর কল নেই, সবই স্বাভাবিক।

-"এই রীটা কোথায় থাকে?"

-"বোধহয় সত্তর সেক্টরে কোথাও থাকে, বিয়ে হয়নি, সোনালের বিয়ে হয়ে গেছে, ও রাজীর থেকে একটু বড় হবে। এখন তো ওরা স্কুলে, কালকে ফাংশন আছে তারই যোগাড়যন্ত্র করছে। আপনি স্কুলে চলে যান না, এই তো কাছেই।"

কথাটা রাইয়ের মনে ধরল। লিটল জয় এখান থেকে কাছেই, হেঁটেই যাওয়া যাবে। সে মিসেস গোয়েলের কাছে বিদায় নিয়ে চলল স্কুলের দিকে।

ছোট্ট একতলা বাড়ি, তবে খুব রঙচঙে, দেওয়ালে নানান কার্টুন চরিত্র পেন্ট করা। গেট দিয়ে ঢুকতেই এক চিলতে বাগানে ছোটদের জন্য দোলনা, স্লিপ ইত্যাদি নানা বিনোদনের সরঞ্জাম। স্কুলের সময় কচিকাঁচার শোরগোলে জায়গাটা ভরপুর থাকে, এখন একেবারে শান্ত। গেটের সিকিউরিটীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, দিদিমনিরা সব হলে আছে। হল কোথায় তাও দেখিয়ে দিল।

হল বলতে একটি বড় ঘর, একপাশে একটু উঁচু করে স্টেজমত করা, ছোট বাচ্চাদেরই উপযোগী। কয়েকটি চেয়ার পাতা, একজন ভদ্রলোক বোধহয় গান শেখাচ্ছেন, হারমোনিয়াম নিয়ে, আর একজন তবলায়। তিনজন মহিলা কোরাস ধরেছেন। রাইকে দেখে সবাই থামল, রাই একটু অপ্রস্তুত হাসি দিয়ে বলে,

-"রীটা ম্যাডাম?'

একটি রোগা মত বছর চব্বিশের জীনস আর টপ পরা মেয়ে এগিয়ে এল।

-"হ্যাঁ আমি। আপনি?"

রাই ওকে একটু বাইরে আসতে অনুরোধ করে। মেয়েটী সবাইকে রিহার্স্যাল চালিয়ে যেতে বলে বাইরে আসে। খুব একটা বিরক্তি নেই চোখেমুখে, উৎসাহও নেই। রাইকে হয়ত কোনো গার্জিয়ান ঠাউরেছে।

-"আমি মিসেস রাজেশ্বরী ব্যানার্জীর মৃত্যুর কেসটা দেখছি। ওর সম্বন্ধে আমার আপনাকে কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল।"

এবার মেয়েটী একটু চঞ্চল হয়ে উঠল,

-"তার মানে রাজেশ্বরী সত্যিই মারা গেছে? আপনি পুলিশের লোক?"

-"সত্যি মানে? আপনি কী শুনেছেন এ ব্যাপারে?"

মেয়েটী সামলে নিল,

-"না, মানে বডি পাওয়া গেছে শুনেছিলাম যেন, তবে তা রাজেশ্বরীর কিনা তা নাকি কনফার্মড নয়।"

রাই অবাক হয়। এত কথা এরা জানল কী করে, এই মেয়েটী তার মানে খোঁজখবর করেছে। মেয়েটীর পরের কথাতেই অবশ্য ব্যাপারটা পরিস্কার হল।

-"আসলে প্রিন্সি ম্যাম থানায় ফোন করেছিলেন। ওনাকে তো কাউকে নিতে হবে রাজেশ্বরীর জায়গায়, তাই রাজীর খোঁজখবর নিচ্ছিলেন পুলিশের কাছে।"

রাই এবার সরাসরি ইমেল ও চ্যাট সংক্রান্ত কথায় এল। রীটা কেন চ্যাটের কথা উল্লেখ করতে গেল মিসেস গোয়েলের কাছে। নিশ্চয়ই আলাদা করে নজর পড়ার মত কিছু ঘটেছিল।

প্রথমটায় রীটা কিছু বলতে চাইছিল না, ক্যাজুয়াল অবজারভেশন বলে কাটিয়ে দিচ্ছিল। রাইও নাছোড়বান্দা। ক্রমাগত প্রশ্ন করে যেতে থাকল। "কার সঙ্গে চ্যাট করত? কতক্ষণ? রোজ না মাঝে মাঝে?"

মেয়েটার বয়স বেশী নয়, বুদ্ধিও সেরকম পাকেনি। নাহলে হয়ত অসুবিধে হত ওর থেকে কথা বার করতে।

-"প্রায়ই করত, ছুটির পরে বসে বসে। সেইসময় ওকে খুব খুশী খুশী দেখাত। আমি তো ভেবেছিলাম হ্যাজব্যান্ডের সঙ্গে চ্যাট করে বোধহয়। সোনাল ম্যামকে সেকথা বলতে ও বলল যে রাজেশ্বরী ম্যামের হাজব্যান্ডের অফিস তো কাছেই, উনি ঐসময় লাঞ্চে বাড়ী আসেন, ওর সঙ্গে চ্যাট করবে কেন!"

-"তোমরা জিজ্ঞেস করনি এনিয়ে কিছু?"

-"সোনাল ম্যাম করেছিল, এমনিই ক্যাজুয়ালি, নেট নিয়ে কীসব কথা বলতে বলতে। তাতে রাজেশ্বরী বলেছিল, ওর কাজিন বাইরে থাকে, তার সাথে চ্যাট করে ও।"

রাই তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে,

-"সেটা তো খুব স্বাভাবিক। তুমি তো প্রথমেই এককথায় বলতে পারতে আমাকে সেকথা। বলনি কেন, তোমার কি কথাটা নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল?"

রীটা একটু ইতস্তত করতে থাকে।

-"আসলে এমনি কিছু না। আমি রাজেশ্বরীর হাজব্যান্ডকে দেখেছি, ভালোই, খুব স্মার্ট। আমরা এ নিয়ে আলোচনাও করতাম। তাই আমার একটু অদ্ভুত লাগলেও তেমন কিছু মনে হয় নি, আমি এর আগে একথা কাউকে বলিনি। কম্পিউটার টেবলটা

স্টাফরুমের এককোণে রাখা আছে। ওখানে বসে কে কী করছে কেউ সাধারণত দেখতে পায়না। একদিন আমি ভুল করে টেবিলে আমার চশমাটা ফেলে এসেছি। আমার পরে রাজেশ্বরী গিয়ে বসেছে সেখানে। আমার কতগুলো হিসেব করার ছিল। আমার পড়তে চশমা লাগে।খাতা খুলে চশমা নেই দেখে কম্পিউটার টেবিলের দিকে গেছি, রাজেশ্বরী টের পায়নি, এত মশগুল ছিল ও। আমি চশমায় যখন হাত দিয়েছি তখন ওর খেয়াল হয়েছে, ও তাড়াতাড়ি উইন্ডোটা মিনিমাইজ করে দেয়। কিন্তু তার আগেই ও কী টাইপ করছিল আমি দেখে নিয়েছি। সেখানে এমন কিছু কথা ছিল যা দেখে মনে হবেনা কেউ কাজিনকে লিখছে। ও বিবাহিত না হলে নিঃসন্দেহে ওটা বয়ফ্রেন্ডের উদ্দেশ্যে লেখা মনে হত।

এর পর থেকেই আমি ওকে নেটে বসলে ভালো করে লক্ষ্য করতাম। যেদিন অনেকক্ষণ কম্পিউটার খালি পেত, খুব খুশী হত, অন্য কেউ পিসি ঘিরে থাকলে অধৈর্য্য, বিরক্ত হত। অথচ ওর বাড়ীতেও কম্পিউটার আছে, নেট কানেকশন আছে। তাহলে এরকমটা কেন করত! "

-"জিজ্ঞেস করনি সে কথা, ও কম্পিউটার খালি না পেয়ে বিরক্তি দেখালে? "

রীটা একটু নার্ভাস হাসি হেসে বলল,

-"হ্যাঁ, করেছিলাম এমনি। একদিন আমাদের অফিসের গুপ্তাজী সকাল থেকে কম্পিউটারে বসে স্কুলের হিসেবপত্র করছিলেন, সেদিন। ও আমার প্রশ্নতে একটু থতমত খেয়ে গেছিল। তারপরে বলল, কম্পিউটারে সবসময় ওর হাজব্যান্ডই বসে থাকেন,তাছাড়া ঘরে এত কাজকর্ম থাকে বলে ওর বসার সময় হয়না। এদিকে স্কুলের ঐ সময়টাই নাকি ওর কাজিন অফিসে ফ্রী থাকে।"

এনিয়ে যখন আর বেশী কিছু জানা গেলনা রীটার কাছে তখন রাই অন্য প্রসঙ্গে এল,

-"রাজেশ্বরী কেমন ছিল, তোমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তোমরা বলতে পারবে? ওর কী সম্প্রতি হাজব্যান্ডের সঙ্গে কোনো গোলমাল চলছিল?"

রীটার মুখ দেখে বোঝা গেল ওর সেরকম কিছু জানা নেই। তবু রাই অপেক্ষা করল কিছু যদি বলে।কিন্তু মেয়েটার আর কিছুই মনে পড়ল না।

এরপরে রাই সোনালকে ডেকে পাঠাল। সেও ভেতরে ছিল, গানের রিহার্সালে। সে এসে রীটার কথাতেই সায় দিল। যদিও সে নিজে কোনোদিন রাজী কম্পিউটারে কী করত লক্ষ্য করেনি। তবে ওদের কথোপকথনের সময় সে উপস্থিত ছিল, বা রীটাও তাকে এনিয়ে বলেছে। এমনি রাজীর ব্যবহার খুবই ভালো ছিল, হাসিখুশী মিষ্টি মেয়ে। যদিও ঘনিষ্ঠতা তেমন হয়নি তবু দু তিনবার ওরা একে অন্যের বাড়ি গেছে কাজে বা এমনিই।

সোনাল রীটার থেকে একটু বড়, বিবাহিত, বুঝদারও বেশী সেটা বোঝা যাচ্ছিল। নানা কথার মধ্যে ও একটা কথা বলল যেটা রাই আগে শোনেনি।

-"ম্যাম, এমনিতে হাজব্যান্ডের সঙ্গে ওর কোনো গন্ডগোল বুঝিনি কখনো, ও বাড়ি নিয়ে খুব একটা কথা বলত না। ওর বাড়ি আমরা গেছি,সুন্দর নতুন ফ্ল্যাট, সাজানো গোছানো। অল্পদিন বিয়ে হয়েছে, সে হিসেবে সব কিছুই ছিল ওদের কাছে, তবু রাজীর টেস্ট সবেতেই এক্সপেন্সিভ ছিল মনে হয়েছে আমার। এমনিতে এ নিয়ে কথা হয়নি, তবে দেখি ও শাড়ি বা ড্রেস সবসময় যাই পরত খুব দামী। ওর এক একটা সাউথ সিল্ক আমাদের স্কুলের এক মাসের মাইনের চেয়ে দামী হবে। গয়নাও তাই, তবে জাহির করত না। ওর শাশুড়ি বা ননদ নাকি খুব সাধারণ জামাকাপড় উপহার দিত ওকে, ওর সেসব পছন্দ হতনা, লোককে দিয়ে দিত।একবার ওর ননদের দেওয়া একটা বেশ ভালো জুট সিল্কের শাড়ি ওর পছন্দ হয়নি, সাউথের সিল্কের মত উঙ্কÄল নয় বলে। আমি ওটা ওর কাছ থেকে নিয়েছিলাম দাম দিয়ে। ওদের গাড়িটাও ছোট বলে ও খুব বিরক্ত হত, অথচ এত অল্প বয়সেই ওর স্বামীর গাড়ি বাড়ি সবই আছে। আমার স্বামীর তো পারিবারিক ব্যবসা , অনেক সিনিয়রও,

আমাদের বাড়ির বড় গাড়ি। ও একবার আমার বাড়ি গেছিল তখন আমাদের গাড়ি দেখে বলছিল। এমনিতে আর কিছু না তবে কম দামী জিনিস নিয়ে ওর একটু নাক উঁচু ভাব ছিল।"

রাই শুনে অবাক হল, এরকম কথা অর্কর মাও বলেননি। উনি কী বোঝেননি কোনোদিন যে রাজী ওদের দেওয়া উপহার পেয়ে খুশী হতনা, দিয়ে দিত! এমনিতে রাজীর বাবাও খুব বিশাল কিছু বড়লোক ছিলনা, দু বাড়িই সমান মাপের মধ্যবিত্তই মনে হয়েছে এখনো পর্যন্ত। তবে এতদিনে বাড়িতে শাশুড়ী ননদের মত মহিলাদের কাছ থেকে চরিত্রের এ দিকটা লুকিয়ে রাখতে পেরেছে মানে মেয়েটির অভিনয় ক্ষমতাও ভালোই ছিল।

এই কাজিনের ব্যাপারটাও বুঝতে পারছেনা। বন্ধু বলতে অসুবিধে কোথায়, চ্যাট করতেই পারে বন্ধুর সাথে, তাকে সম্পর্কের নাম দিতে হবে কেন? তবে কী সত্যিই কোনো কাজিনের সাথে আড্ডা মারত? ছুটির পরে বাড়ি ফিরেও তো বসতে পারত সে কম্পিউটারে, অর্ক তো সন্ধ্যে অবধি অফিসে থাকত, তা না করে ছুটির পর স্কুলে থাকত কেন! তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে স্বামীর লাঞ্চের সময় উপস্থিত থাকতে চেষ্টা করত না কেন, এত কাছে বাড়ি যখন?

রাজীর এই কাজিনের কথা জানতে হবে, যে বাইরে থাকে। যার সঙ্গে রাজীর খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, প্রায় বয়ফ্রেন্ডের মত। এই কাজিনের ব্যাপারে রাজী হয়ত এদের সম্পর্কটা ঠিক বলেছে সম্বন্ধটা লুকিয়ে। রাইয়ের অনেক বন্ধুবান্ধব আছে কেরালার। ওদের দিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেরকম কাজিনের সঙ্গে বিয়েটিয়ে চলে, সেরকমই কেউ হলে রোম্যান্টিক একটা সম্বন্ধ হতেই পারে। সেজন্যই কি রাজী ঘন ঘন মাবাবার কাছে যেত! এটা অর্কর সঙ্গে দুরত্ব বা রাজীর ইদানীংকার পরিবর্তনের কারণ হলেও হতে পারে। সেক্ষেত্রে অর্কর মোটিভটা জোরালো হবে। আজকেই ভার্মাকে বলতে হবে বিদেশী কাজিনটি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে।

ও সোনাল আর রীটা দুজনকেই এরপর জিজ্ঞেস করে ইদানীং রাজীর মধ্যে কোনো চেঞ্জ দেখা গেছিল কিনা! অবশ্য সে অর্কর মার কাছে শুনেছে রাজীর পরিবর্তন যখন থেকে দেখা গেছে তখনই ও এই চাকরিটা নিয়েছে। অতএব নতুন করে এরা হয়ত কিছু দেখেনি।

রাইকে অবাক করে দিয়ে রীটা বলল,

-"অন্য কিছু নয়, তবে রাজী হালে হেয়ার স্টাইল বদলেছিল। ওর চুল বেশ সুন্দর ছিল, কালো লম্বা স্ট্রেট রেশমের মতো, খোলা রাখত নাহলে বিনুনী। কিছুদিন আগে ও চুল অর্ধেক কেটে কার্ল করে, অবশ্য এতেও ওকে সুন্দর দেখাচ্ছিল তবে আমার খুব দুঃখ হয়েছিল ওর লম্বা চুলের জন্য। বলল তো ওর হাজব্যান্ডের পছন্দের হেয়ার স্টাইল, সত্যি মিথ্যে জানিনা।"

সোনাল বড় হওয়ার সুবাদে রীটাকে একটু মৃদু বকুনি দিল, "চুপ রহ, ফালতু কথা,ম্যাডাম ঐরকম বদলের কথা জিজ্ঞেস করেনি। না, ম্যাম, সেরকম কিছু দেখিনি আমরা।"

রাই ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। তেমন সত্যিই কিছু নয় তবে রাজীর শুধু খাওয়াদাওয়া বা বাড়ির ব্যবহারেই যে পরিবর্তন এসেছিল তা নয়, বাইরেও লোকের নজরে পড়ার মত কিছু কিছু বদল হয়েছিল, সাজপোশাকে। কেন, সেকী তবে ঐ নতুন সম্পর্কের জন্যে! একসাথে বাস করে অর্কর নজরে পড়েনি, ও কিছু বুঝতে পারেনি, এও কী সম্ভব ......!

শান্তিবিহার বাজারের মুখটাকে বাঁদিকে রেখে সিগন্যালে ডানদিকে টার্ণ নিল গাড়ী। চওড়া ডাবল রোডটায় আজ ভীড় কম, একটু এগিয়ে বাঁদিকে আইয়াপ্পা মন্দির। যতিন্দর রাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করবে বাজারের মুখে, ভার্মা সেরকমই বলে দিয়েছিল। রাই নিজে গাড়ি চালিয়ে আসেনি, এদিকটা খুব ঘিঞ্জি, কোথায় পার্কিং পাবে না পাবে তাই রেন্টাল থেকে একটা গাড়ি নিয়ে এসেছে। বাজার থেকে মন্দির বেশী দুর নয়, ও গাড়িটাকে বাঁ দিকে দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ল, ড্রাইভারকে বলল

মন্দিরের সামনে গাড়ি পার্ক করে অপেক্ষা করতে। এদিকটা ঘুরে শেষে তো সে মন্দিরেই যাবে, ওখানে রাস্তা একেবারে খালি, গাড়ি রাখার অনেক জায়গা। রাস্তা পার হয়ে বাজারে ঢোকার মুখে যতিন্দরের মোবাইল নাম্বারে ফোন করল। ভার্মা আজ সকালেই ওকে নাম্বারটা দিয়ে দিয়েছিল। সামনেই একটি লম্বা মত বছর তিরিশের লোক দাঁড়িয়েছিল একধারে, ফোন তুলেই সে রাইয়ের দিকে তাকালো, তারপরে ফোন কেটে এগিয়ে এল,

-"রাই ম্যাডাম, ভার্মা সাব?"

রাই হাসল অল্প, লোকটির চেহারাটা এদিককার জাঠ ধরণের, পেটানো, টানটান, তবে মুখটা বেশ বাচ্চা বাচ্চা, হাসিখুশি।

-"যতিন্দর? নমস্তে, বুঝতে পেরে গেছেন?"

রাইকে অবাক করে লোকটি বলল,

-"আমি তো আপনাকে চিনি। গুপ্তা সাহেব যখন ছিলেন, আমি ভার্মা সাহেবের সাথে ঐ থানায় ছিলাম, আপনাকে দেখেছি সাবেদের সঙ্গে, মনে আছে।"

রাইয়ের বেশ ভালো লাগল, ভার্মা আর অভির চেনা লোক মানে এর সাথে সহজে কথা বলা যাবে। অচেনা কেউ হলে সহজে সহজ হতে পারত না, এদেশীরা এখনো মেয়েদের সম্বন্ধে ঠিক সেরকম ভালো ধারণা পোষণ করেনা, বিশেষত রাইয়ের মত লেখাপড়া জানা চাকরি করা মেয়েদের প্রতি এদের একটা জাত অচ্ছেদ্দা থাকে। সেরকম হলে এমনি কিছু না, একটু অস্বস্তি হত।

দুজনে মিলে বাজারে ঢুকল। সকালবেলা ভিড় কম। দোকানপাট যদিও খোলা আছে, রাস্তায় হকার আর ঠেলা নেই, সেসব বিকেলে বসে। ওরা গণেশ ভান্ডার, যেখানে অর্করা দোকান করে সেখানে গেল। রাই একটু জিজ্ঞাসাবাদ করল মালিককে, যতিন্দর সঙ্গে থাকায় ওরা রাইকে পুলিশের লোক মনে করেই কথা বলছিল। সেই ছেলেদুটি যারা অর্কর গাড়িতে মাল পৌঁছতে গেছিল তাদের সাথে ওরা সেই গলিটায় গেল। ফুলওয়ালির সঙ্গে দেখা হলনা, সেও বিকেলে বসে, এটা বোধহয় ভার্মা খেয়াল করেনি।

গণেশ ভান্ডারের পাশে একটা সরু গলি, সেই গলিটা ধরে একটু হাঁটতেই ওরা একটা চওড়া বড় রাস্তায় এসে পড়ল। ঐ রাস্তাটা রাইরা যে রাস্তা দিয়ে ঢুকেছে তার সমান্তরাল। একটু এগিয়ে একটা মোড় এল, সেটা পার হয়ে কয়েক মিটার গেলেই আইয়াপ্পা মন্দির,পাঁচিলঘেরা, অনেকটা জায়গা জুড়ে, রাস্তার ধারেই। রাস্তা আর মন্দিরের মাঝের জায়গাটা সিমেন্ট বাঁধানো, একটা কৃষ্ণচূড়া আর দু তিনটে দেবদারু, একটা অমলতাস এরকম কয়েকটা গাছগাছালিতে জায়গাটা বেশ ছায়াঘন চারধার। সামনের গেট এখন বন্ধ, সকাল দশটায় মন্দিরের সময় শেষ, এখন এগারোটা বাজে,আবার বিকেলে খুলবে। তবু কিছু মানুষের আনাগোণা দেখা গেল, হয়ত কাজে এসেছে, দর্শনার্থী নয়। পাশের জুতো রাখার স্টলটাও বন্ধ। একদিকে একটা আধখোলা সাইড গেট, সেখান দিয়ে অনেকে দরকারে যাতায়াত করে, এছাড়া পেছনের দিকেও গেট আছে আশ্রমিক দের চলাফেরার জন্য। রাই যতিন্দরকে নিয়ে সাইডগেটটা দিয়ে ঢুকে পড়ে, এই মন্দির ও বাইরে থেকেই দেখেছে, কোনোদিন ভেতরে ঢোকেনি। বাইরের গেট দিয়ে ঢুকলে মূল মন্দিরের পাঁচিল ও বড় কাঠের তৈরী কারুকার্য করা দরজা, সেটা এখন বন্ধ। দুই পাঁচিলের মধ্যিখানের চত্বরে দু চারটে দোকানদানি, সিকিউরিটীর কুঠরি, হাত পা ধোবার জায়গা ও পানীয় জল ইত্যাদির ব্যবস্থা। অনেক গাছপালাও আছে আর একেবারে শেষে একটা ছোট কাঠের দরজা, ভেতরের লোকেদের ব্যবহারের জন্য। একজন গিয়ে সে দরজায় ধাক্কা দিতে দরজা অল্প খুলে তাকে ঢুকিয়ে আবার বন্ধ হয়ে গেল।

একটা দোকান খোলা ছিল, সেখানে নানান মূর্তি, ধুপ ও দানী, ঘন্টা প্রদীপ, ধর্মীয় বই সিডি এরকম নানা সামগ্রী রাখা আছে। খদ্দের নেই, দোকানী একজন ফরসা মতন বৃদ্ধ, পরণে ধুতি ও ফতুয়া, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটি ডাস্টার নিয়ে

জিনিসগুলো মুছে মুছে রাখছে। রাই গিয়ে দোকানটার সামনে দাঁড়ালো। দু একটা জিনিস হাতে নিয়ে দাম করতে করতে কথাটা পাড়ে,

-"আচ্ছা, এই মন্দিরের বাইরে একটা পাগলি মেয়ে বসে থাকে, তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?"

ভদ্রলোক প্রশ্নটা শুনে প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেনা, চশমার পুরু কাঁচের মধ্যে দিয়ে অবাক চোখে তাকায়। রাই আবার বলতে, বলেন,

-"পাগল মেয়ে? কোন পাগল মেয়ে?"

রাই ঘাবড়ায়, সেরেছে, এই মন্দিরে কখানা পাগলি মেয়ে আছে রে বাবা! সে আবার কিছু বলার আগেই যতিন্দর তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,

-"ঐ যে, ঐ মেয়েটা যে রোজ বাইরের চাতালে বসে ভিক্ষা করে। ও আসেনি আজকে?"

লোকটি এবার একটু সহজ স্বাভাবিক,

-"ও সোনি? ওতো ঠিক পাগল নয়, পাগলামি কিছু করেনা। আসলে ওর বয়স অনুপাতে বুদ্ধি পাকেনি, অনাথ মেয়ে। বাবা মার সঙ্গে শান্তি বিহারের ফুটপাথে থাকত, দুজনেই কী একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। সেই শকেই বোধহয় একটু অদ্ভুত হয়ে গেছে। এখানে মন্দিরের বাইরে থাকে। মন্দির থেকে দুবেলা খেতে দেয়, রাতে এই শেডের নীচে শুয়ে থাকে। তা ওর সঙ্গে কী দরকার?"

রাই ভদ্রলোকের দিকে তাকালো, মনে হল নেহাতই কৌতুহলের প্রশ্ন, কোনো কিছু সন্দেহ করে নয়। লোকটি বোধহয় যতিন্দরকে চেনেনা। সে যতিন্দরকে ইশারায় চুপ থাকতে বলে একটু মিথ্যার আশ্রয় নেয়,

-"না, আসলে এর আগে একদিন এসেছিলাম, তখন ও জামা চেয়েছিল। সেদিন সঙ্গে ছিলনা, পয়সা দিয়েছিলাম। আজ এদিকে আসার কথায় তাই ওর জন্যে পুরনো জামা নিয়ে এসেছিলাম। আমার কাজে দেরী হয়ে গেল, মন্দিরেও দর্শন হলনা। অন্তত মেয়েটাকে জামা দিয়ে যাই, নাহলে আবার কবে আসা হয়।"

কথা বলতে বলতে একটা প্রদীপ পছন্দ করে ভদ্রলোকে হাতে দিল, উনি প্যাক করতে করতে উত্তর দিলেন,

-"আছে কোথাও, একটু এদিক ওদিক দেখুন। এখন তো মন্দির বন্ধ হয়ে গেছে, দর্শনার্থী আসবেনা, তাই অন্য কোনোখানে গেছে। দুপুরে প্রসাদ খাওয়ার সময় ঠিক এসে পড়বে।"

কেনা শেষ হয়ে গেলে ওরা বেরিয়ে এল। বাইরে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, যদি মেয়েটা আসে।

-"ম্যাডাম, আপনি কি মন্দিরের ভেতরে যেতে চান। আমি তাহলে বলে দরজা খোলাতে পারি।" যতিন্দরের প্রশ্নে রাই একটু ভাবে, মন্দিরের ভেতরে গিয়ে কিছু করার নেই। সেদিন রাজী মন্দিরের ভেতরে যায় নি, কেউই তাকে দেখেনি। ঐ মেয়েটি তাকে দেখেছে মন্দিরের বাইরে। তার ঐ মেয়েটিকে দরকার।

-"না, যতিন্দর, আমি মন্দিরে ঐ মেয়েটির সঙ্গেই কথা বলতে এসেছি। একটু অপেক্ষা করে দেখি, না হলে আর কী করা যাবে।"

-"ম্যাডাম, একটা কথা ছিল, আমি ভার্মা সাহেবকেই বলতাম, কিন্তু সাবের সঙ্গে কথা বলার সময় একদম ভুলে গিয়েছিলাম।"

রাই সোনিকে না পেয়ে খুবই আশাহত হয়েছে, কোনো কিছুই ভালো লাগছিলনা, তবু যতিন্দরের এ কথায় একটু কৌতুহলে তাকায়,কিছু না বলে।

যতিন্দরের একটু আমতা করে না বলে,

-"না, মানে হয়ত সেরকম কিছু দরকারী নয় তবু। এখানে একজন বুড়ি মেমসাব আছেন, মিসেস থমাস, আগে ইস্কুলের খুব বড় ম্যাডাম ছিলেন এখন রিটায়ার করে গেছেন অনেক দিন হোলো। তিনি ঐ যে মেয়েটির কেস, তাদের সোস্যাইটিতেই থাকেন, এই কিছুটা গিয়ে মোড় থেকে ঐ ডানদিকে যেতে হয়, বেশীদুরে নয়। তা তিনি একদিন থানায় এসেছিলেন কী যেন বলার ছিল বলে। বড় সাব বেরোচ্ছিলেন তা ছোট সাবের কাছে নিয়ে যেতে বললেন মেমসাহেবকে। ছোটোসাব আমাদের ঐরকমই, একটু গাছাড়া, যেটুকু না করলে নয়। সে তো মেমসাবকে কী বলতে মেমসাব একেবারে রেগে কিছু কথা না বলেই চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বলে গেসলেন পুলিশের কিছু জানার থাকলে যেন তারা ওঁর কাছে যায়, উনি আর থানায় আসবেন না। তা আমাদের এখান থেকে তো কেউ আর ওনার কাছে যেতে দেখিনি।

আসলে ম্যাডাম, বড়সাব থানায় নতুন, নিজে যা ভালো বোঝেন করেন, কারুর কথা শোনেন না। হয়ত ভাবছেন, বুড়ি মানুষ মাথার ঠিক নেই, কাজ নেই তাই থানার সময় নষ্ট করতে চলে এসেছিল। কিন্তু ম্যাডাম, ঐ থমাস মেমসাব ওরকম আর পাঁচটা বয়স্ক মহিলার মত নয়,খুব ব্যক্তিত্বময়ী, এখানে লোকে খুব শ্রদ্ধা করে। উনি যখন নিজে এসেছিলেন তখন নিশ্চয়ই কোনো কারণ ছিল। তা আমি বলি কী আপনি যখন এসেছেন, ওর সঙ্গে দেখা করুন না একবার। কাছেই, সময়ও কেটে যাবে, ততক্ষণে ঐ মেয়েটা এসে যাবে।"

যেহেতু আগে এই বৃত্তান্ত শোনা ছিলনা, রাইয়ের একটু ধন্দ জাগে। কে মিসেস থমাস, কী বলতে চান! সে যতিন্দরের মত অত উৎসাহী হতে পারেনা, যদি সেরকম হত রাজপাল কী এই সূত্রটা এভাবে খোলা ছেড়ে দিত। ধাওয়ানের মত তারও মনে হয় যে মহিলা হয়ত চেনা মেয়ের কেস দেখে বেশী উত্তেজিত হয়ে থানায় ছুটেছিলেন। আজকে তার সোনির সঙ্গে দেখা করাটা বেশী জরুরী মনে হয়। তবু যতিন্দরকে নিরাশ করতে চায়না, তাই বলে,

-"বেশ তো, কাছেই যখন একবার যাওয়া যাবে নাহয় মিসেস থমাসের কাছে। কিন্তু আগে সোনি আসুক, ওর সাথে কথা বলি তারপর। নাহলে ও যদি এসে আবার কোথাও চলে যায়।"

যতিন্দর আর কিছু বলেনা। সেও অপেক্ষা করতে থাকে রাইয়ের সঙ্গে। প্রায় ঘন্টাখানেক হয়ে গেলে,শেষে আশা ছেড়ে দিয়ে রাই মিসেস থমাসের ওখানে যাওয়া স্থির করে। তাকেও ঘরে পাওয়া যাবে কিনা কে জানে, অবশ্য যতিন্দর বলে যে তিনি সচরাচর বাইরে বেরোন না।

বেলা হয়ে এসেছে, ওরা উল্টোদিকে রাস্তায় দাঁড় করানো গাড়ীতে উঠে বসে, যতিন্দর ড্রাইভারের পাশে বসে বুঝিয়ে দেয় কোথায় যেতে হবে। এটা ডাবল রোড,তাদের মন্দিরের দিকের রাস্তা ধরতে হবে। সামনেই সিগন্যাল, সেখান অবধি গিয়ে ইউ টার্ণ নিয়ে আবার গাড়ীটা মন্দিরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, রাই অন্যমনস্কভাবে পথের ধারে চোখ রেখেছে, মনে মনে সোনির কথাই ভাবছে, কিভাবে ধরা যায় মেয়েটাকে। মন্দিরটা পেরিয়ে কিছুটা গেলে রাস্তার ধারে একটা নতুন বিল্ডিং তৈরী হচ্ছে, সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে বালি জমা করা আছে সেখানে কতগুলো রাস্তার ছেলেমেয়ে মলিন পোশাক, রুক্ষ চেহারায়, কাঞ্চা বা গুলি খেলছে। সামনেই তেমাথার সিগন্যাল তাই গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়েছে, রাইয়ের মন ভার,চোখ বন্ধ। গাড়ীটা ডানদিকে সবে ঘুরেছে, কানে এল,"এ সোনি, এবার তোর চাল"।

সোনি, সোনি, নামটা খুব চেনা মনে হচ্ছে, কোথায় শুনল যেন, বিদ্যুতের ঝিলিকের মত মাথায় আসতেই "রোকো রোকো" করে গাড়ীটা থামাতে বলল হুড়মুড় করে। বিরক্তিতে ড্রাইভারের মুখচোখ বিকৃত হয়ে এল আর একটা বিকট আওয়াজ করে ব্রেক কষল সে, যতিন্দর অবাক হয়ে পিছনে তাকালো। ভাগ্যিস শনিবারের দুপুরে এ অঞ্চলে ট্র্যাফিক তেমন নেই, নাহলে নির্ঘাত পেছন থেকে অন্য গাড়ি এসে ঠুকে দিত। রাই নেমে পড়ল, সঙ্গে যতিন্দরও।

-"তুই সোনি, মন্দিরে থাকিস?" ডাক শুনে উঠে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা, পরনে একটা ময়লা ঘাঘরার মত স্কার্ট আর একটু কম ময়লা কুর্তা। ঘন ছোট ছোট লালচে কোঁকড়া রুক্ষ চুলে মুখখানা ঘেরা, গড়ন দেখে মনে হয় বয়স তের চোদ্দ বছরের মতো হবে তবে ঠিক বলা যায় না, বেশীও হতে পারে। দৃষ্টি চুলের মতই, রুক্ষ, চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে এক হাত কোমরে আর অন্য হাতে কাঁচের গুলি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

-"হাঁ, তো কী হল?"

রাইয়ের আফশোষ হল ব্যাগে কিছুই নেই যে বাচ্চাগুলোর হাতে দেবে, কাছে পিঠে দোকান দেখা গেলে ড্রাইভারকে কিছু আনতে বলত। সব ব্যাপারেই রাই যতটা সম্ভব সোজাসুজি পরিস্কার কথা বলতে পছন্দ করে সে সামনে যেই হোক না কেন, এখানেও তার অন্যথা হলনা। সে সোনিকে জানালো, যে দিদি হারিয়ে গেছে, যার জন্য পুলিশ এসেছিল মন্দিরে, সে ঐ দিদির বন্ধু, দিদিকে খুঁজে বার করতে চায়। প্রথমে বুঝতে একটু সময় নিল মেয়েটা তারপর চোখে মুখে হাল্কা আগ্রহের আভাস। রাই ওকে একটু সরে অন্য দিকে আসতে বলল, খেলুড়েরা খেলা থামিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে, তাদের সামনে কথা বলাটা ঠিক হবেনা মনে করে। সোনি আপত্তি করল না, ওরা সরে গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। রাই একবার যতিন্দরের দিকে দেখে নিল, সে উদাস ভঙ্গীতে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে একমনে আকাশ দেখছে।

-"সোনি, ঐ দিদি যেদিন হারিয়ে গেছিল সেদিন তুই ওকে মন্দিরের কাছে দেখেছিলি রাত্তিরবেলায়?"

-"তুমি পুলিশ?"

-"না তো। কেন? আমি ঐ দিদির বরের বন্ধু।" ও ইচ্ছে করেই রাজীর মৃত্যুর খবর জানাচ্ছিল না সোনিকে।

-"আমি তো মহারাজ কে বলেছিলাম সব। সেদিন মন্দির বন্ধ হওয়ার পরে লোকজন সব চলে গিয়েছে। আমি ভেতর থেকে প্রসাদ নিয়ে এখানে এসে দেখি পীপল এর তলায় কে দাঁড়িয়ে আছে। একটু ঠাহর করে দেখে মনে হল দিদি। এমনিতে দিদি মন্দিরে এলেই আমাকে পয়সা প্রসাদ বা কোনো জিনিস দেয় । সেদিন মন্দিরের দিকে এলোইনা,রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আশপাশ কেউ ছিলনা, আমি ভাবলাম মন্দির তো বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে দিদি বোধহয় আমাকে কিছু দিতে এসেছে। দিদি বলে ডাকলাম,ঠিক তখনই একটা কালো গাড়ি এল আর দিদি তাতে উঠে চলে গেল।"

রাই দুরে মন্দিরের দিকে দেখল। ওরা যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে সেখান আর মন্দিরের মাঝামাঝি জায়গায় উল্টোদিকে পার্কের পাঁচিল ঘেঁসে একটা পীপল গাছ। ও হাত বাড়িয়ে সোনিকে ঐ গাছ টা দেখাল,

-"কোন গাছ? ঐ গাছটার কথা বলছিস?"

-"হ্যাঁ।"

কল্পনা করতে চেষ্টা করল রাই, অন্ধকারে মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ঐ গাছতলায় দাঁড়ানো ব্যক্তিকে সঠিকভাবে চেনা সম্ভব কিনা। বাচ্চা মেয়ে, ওর দৃষ্টিশক্তি ভালোই হবে, তবু মনে হয় হলফ করে বলা যায়না। রাজীর আদলের কাউকেও দেখে থাকতে পারে।

-"তুই কালো গাড়িটা ঠিক দেখেছিলি? কী করে বুঝলি গাড়িটা ঐ দিদিদেরই গাড়ি?"

সোনি এখন অনেক সহজ, প্রচুর উৎসাহ নিয়ে বোঝাতে আরম্ভ করল,

-" হ্যাঁ তো, দিদি আর ঐ সাহেব তো অনেকবার আসত মন্দিরে। যখন মাজী ছিল তখন বেশী আসত, দিদি একাই আসত মাজীর সঙ্গে গাড়ী চালিয়ে। মাজী গাঁও চলে যাবার পরে কম আসে তবু আমি ওদের গাড়ি দেখলেই চিনতে পারি।"

-"তাও, ঐসময় তো অন্ধেরা ছিল, একইরকমের গাড়ি অন্য কারুরও তো হতে পারে, তাছাড়া দিদি হলে তোর কাছে আসবে না কেন? তুই ডেকেছিলি না?"

এবার সোনি একটু দ্বিধায় পড়েছে মনে হল। তারপরে আমতা আমতা করে বলল,

-"না মানে আমি ঠিক জোরে ডাকিনি, মন্দিরের ওখান থেকেই "দিদি" "দিদি" বলেছিলাম। মনে হয় দিদি শুনতে পায়নি।"

-"কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল দিদি ওখানে?"

-"সে জানিনা। আমি তো মন্দিরের ভেতরে প্রসাদ নিতে গেছিলাম। বেরিয়ে এসে দেখলাম দিদিকে। যখন দিদি গাড়ির দিকে যাচ্ছে তখন ডাকলাম, তো দিদি শুনল না, গাড়িতে উঠে পড়ল।"

রাই এবার একটু ভাবনায় পড়ল। ঐ মহিলা যদি রাজী হয় তাহলে সে মন্দির বন্ধ হবার পরে এসেছে অর্থাৎ আটটার পরে। সময়ের হিসেব মত অর্ক তাকে মোবাইলে ফোন করেছে পৌনে আটটা নাগাদ। মন্দির বাজার থেকে মিনিট দশেকের হাঁটা পথ। ধরা যাক অর্ককে বলেই সে মন্দিরে এসেছে এবং ফুলওয়ালীর ওখানে দেরী হতে মন্দির বন্ধের টাইম হয়ে গিয়ে দর্শন না হওয়াতে সে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছিল। মন্দির বন্ধের সময় আর রাজীর নিখোঁজ হওয়ার সময় প্রায় মিলে যাচ্ছে। তাহলে সে স্বামীকে ফোন করবেনা কেন? অর্ক বাজারে খোঁজ করেছে বউয়ের,তার সাক্ষী আছে। অর্কর দেরী দেখেও রাজী ফোন করবেনা! হতে পারে ঐ মহিলা রাজী নয়, রাজীর মতই কোনো মহিলাকে দেখেছে সোনি, আর অন্ধকারে যে কোনো গাঢ় রঙের গাড়িই কালো মনে হবে। মেয়েটি সেঅর্থে পাগল নয়, হয়ত অপরিণতমনস্ক হওয়ার দরুন শিশুর মতই কল্পনাপ্রবণ, রাজীর নিরুদ্দেশের খবর শুনে নিজের দেখাকে মিলিয়ে কাহিনী তৈরী করছে!

সোনির কাছ থেকে এর বেশী কিছু খবর আশা না করেই ও ব্যাগের ভেতর হাতড়াচ্ছিল মেয়েটাকে কিছু দেবে বলে। কত টাকা দিলে কম দেওয়া হবেনা অথচ বাচ্চা মেয়ের কাছ থেকে কেউ নিয়ে নেবে সেরকম ভয় ও থাকবেনা এই ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক ভাবেই প্রশ্ন করে ফেলে,

-"গাড়ি কে চালাচ্ছিল তুই দেখেছিলি, সাহেবই ছিল না অন্য কেউ?"

-"না, পরিস্কার দেখিনি, তবে সাবই হবে?"

হাতটা ব্যাগেই রয়ে যায়, কী বলতে কী শুনল সে! রাই এবার আর অন্যমনস্ক না, একদম পুরো মনোযোগের সঙ্গে জোরেই বলে ওঠে,

-"তুই পুলিশকে বলেছিস তো ঠিক দেখিসনি? এখন আবার বানিয়ে বলছিস? অন্য আর কেউ ছিল গাড়িতে?"

-"পুলিশ তো আমায় শুধু গাড়ি কেমন ছিল জিজ্ঞেস করেছিল। গাড়িটা খুব জোরে বেরিয়ে গেল, মন্দিরের সামনে অত জোরে কেউ গাড়ি চালায় না, ঐ দিদির বরই প্রত্যেক সময় অমন জোরে গাড়ি চালাত। আর কাউকে তো দেখিনি, গাড়ি পুরো বন্ধ ছিল, কাঁচ তোলা।"

রাই আবার মন্দির থেকে জায়গাটা দেখল যেখানে সোনির কথা অনুযায়ী গাড়িটা থেমেছিল।

রাইয়ের হাতে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট উঠে আসে। মেয়েটা স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারেনা, দুই হাতে ঘাগরার দুদিকের খুঁট ধরে নাচের ভঙ্গীতে অর্ধবৃত্তাকার ভাবে ঘুরে ঘুরে কথা বলছে। কথা শুনে পাগল মনে হয়না আবার যে খুব বুদ্ধিসুদ্ধি তাও বোধায় নয়, অপরিণত। খুঁটিয়ে দেখল রাই, বানিয়ে বলছে মনে হচ্ছে না। ও যা বলছে তা ও হয় দেখেছে নয় ও ভাবে ও দেখেছে।

যতিন্দরকে ডেকে নিয়ে গাড়িতে উঠল। আজ আর মিসেস থমাসের ওখানে যাওয়া হবেনা, যতিন্দর একটু হতাশ শুনে, রাই ওকে আশ্বস্ত করে কাল আসবে বলে, যতিন্দরকে ফোনে সময় জানিয়ে দেবে, সে মিসেস থমাসের সাথে কথাও বলে রাখতে পারবে সেই মত।

গাড়ি বাড়ির পানে বাঁ দিকের রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে একবার পিছন ফিরে কাঁচের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে দেখল সোনি আবার ফিরে গেছে ঐ বালির ঢিবির পাশে, ওর ক্ষুদে সঙ্গীদের সাথে খেলায় যোগ দিয়েছে।

সকাল থেকে নানান ঝামেলায় বড় সাহেবের কাছে যাবে ভেবেও যেতে পারেনি ভার্মা। সাহেবও দুদিন ছুটিতে ছিলেন, আজই অফিসে এসেছেন, ঘরে সকাল থেকেই কেউ না কেউ ছিল। বিকেল পাঁচটায় যখন দুজনেই একটু খালি তখন আর দেরী না করে সাহেবের ঘরে ঢুকল। উনি ফোনে ব্যস্ত ছিলেন, হাত দিয়ে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বললেন। মিঃ চৌহানের আর বছরখানেক আছে রিটায়ারমেন্টের, দিল্লীতেই বাড়ি, তাই শেষদিকে বাড়ির কাছে পোস্টিং নিয়ে এসেছেন। ফোনে কথা বলা শেষ করে সহাস্যে তাকালেন ভার্মার দিকে, উনিও ডিপার্টমেন্টের অনেকের মত নিজের অধস্তন এই অফিসারটিকে বেশ পছন্দ করেন,

-"কী ভার্মা, কী খবর,কেমন চলছে কাজকর্ম? ভালো কথা,আমাকে বোধহয় কাল লখনৌ যেতে হবে,মিটি ংআছে, ঐ সামনের মাসে সি এমের ভিজিট নিয়ে আলোচনা।"

-"স্যর,আসলে সেই মহিলার কেসটা নিয়ে একটু আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে এলাম, মিসেস রাজেশ্বরী ব্যানার্জী।"

এবার চৌহানের কপালে ভাঁজ পড়ল, হাসিটাও প্রায় মিলিয়ে গেল। উনি খুব একটা ঝুটঝামেলা পছন্দ করেননা, সারাদিন রিটায়ারমেন্ট পরবর্তী পরিকল্পনা নয়ত লখনৌ তে কর্তাভজনা করতেই ব্যস্ত থাকেন। তবে একটা ভালো ব্যাপার হল,এঁর অধীনে যেসব লোক কাজ করে তাদের খুব একটা ঘাঁটান না, মোটামুটি যতদুর সম্ভব ফ্রি হ্যান্ড দেন। শুরুতে কিছুকাল দিল্লী পুলিশে কাজ করেছেন তাই এদিকে চেনাশোনাও প্রচুর, পুলিশের ওপর মহলে ও রাজনৈতিক মহলেও খাতির ভালোই, তার ফলে ঝামেলা হলে রাগারাগি করলেও সামলে দিতে পারেন শেষ পর্যন্ত। একটু মৃদু তিরস্কারের সুরে বললেন,

-"ভার্মা, ঐ কেসটা নিয়ে তোমার এত মাথা ঘামাবারই বা কী দরকার। দিল্লী পুলিশ তো দেখছে, তুমি ওদের দরকার মত সাহায্য করবে, ব্যস। কোনো মহলের কোনো চাপ কিছু নেই, আর এমনিতেও সাদাসিধে কেস। হয় ঐ স্বামী ভদ্রলোক খুনী, নয় কোনো প্রেমিকের কান্ড। একটু ধীরে সুস্থে খোঁজখবর করলে আর ঐ ভদ্রলোককে একটু কড়া করে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই বেরিয়ে আসবে। তা সেসব ওদেরই করতে দাও, তুমি এব্যাপারে এত মন না দিয়ে বরং সি এম ভিজিটের ব্যবস্থাপনায় আমার সঙ্গে থাক।"

ভার্মা ঘাবড়ালো না, সে এতদিনে বড়সাহেবকে ভালো চিনে গেছে। কিছুক্ষণ সি এম ভিজিট ও সাহেবের আসন্ন লখনৌ যাত্রা নিয়ে কথা হল। মেজাজ একটু হালকা হয়েছে দেখে আস্তে কিন্তু বেশ দৃঢ় ভাবে কথাটা পাড়ল,

-"স্যর, কেসটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে আমার, তাই নিজের মত করে একটু তদন্ত করতে চাই। আপনি তো দিল্লীর রাজপালের কথা শুনেছেন,সে কেমন লোক, কিছু করবে বলে তো মনে হয়না। আসলে আপনার আগে যে গুপ্তা সাহেব ছিলেন, চেনেন তো আপনি, তার জানাশোনা একজনের রিলেটিভ ঐ ভদ্রলোক। গুপ্তা সাহেব তাই একটু ভালো করে দেখতে

বলেছেন কেসটা, বিনা অপরাধে যেন লোকটি শাস্তি না পায়, এই আর কী। অপরাধ প্রমাণ হয়ে গেলে অবশ্য কারুরই কিছু বলার থাকবেনা।"

এবার চৌহান উঠে বসে,অভিনব গুপ্তাকে সে ভালো চেনে, ডিপার্টমেন্টে খুব সুনাম তার,

-"তাই নাকি? তা তুমি আমাকে আগে বলনি কেন? অভিনবও তো আমাকে ফোন করতে পারত।"

-"না, আসলে গুপ্তা সাহেব আপনাকে ফোন করবে বলেছিলেন, কিন্তু আমিই বারণ করেছিলাম, রাজপাল বা ঐ মহিলার মাবাবা যদি জানতে পেরে কিছু গোলমাল পাকায়, তাই গুপ্তা সাহেবের নামটা আনতে চাইনি, এমনিতেই রাজপাল হাত ধুয়ে মিঃ ব্যানার্জীর পিছনে পড়ে রয়েছে।"

-"আমাকে বললে আর ওরা জানত কী করে! তা তুমি কী করতে চাও? নতুন কোনো সূত্র পেয়েছ কী? অভিনবের কেস যখন, দ্যাখো কী করতে পার। ঐ রাজপাল তো একটা মহা বদমাশ লোক, তবে ওর ওপরওয়ালারা সবাই ওর ওপর খুব চটা, তাই আজকাল বেশ বেকায়দায় আছে। বেশী তড়পালে আমার নাম করে চুপ করিয়ে দিও, আমি ওর বসেদের ভালো চিনি।"

-"স্যার, আমি ঐ মহিলার মা বাবার সঙ্গে কথা বলতে চাই কিন্তু সে সুযোগই হচ্ছেনা। ওরা রাজপাল ছাড়া কারুর সঙ্গে কোনো কথাই বলছেনা। ওদের সঙ্গে কথা বলার কথা বলতে গেলেই রাজপাল ঘুরিয়ে দেয়, সে সব জেনে নিয়েছে বলে। ভদ্রলোক আগে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরে ছিল, শান্তিবিহারের এম এল এর সঙ্গে জানাশোনা, আমি ঠিক জোরও করতে পারছিনা। এখন আপনি যদি কিছু উপায় করতে পারেন। ওদের সেভাবে জেরা না করলে তো মেয়েটির স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক, প্রেমিক ইত্যাদি জানাই যাবেনা ঠিকমত। আর ওরা দুজন ছাড়া আর তো কেউ ছেলেটিকে দোষী বলছেওনা, সবাই বলছে খুব হ্যাপী কাপল।"

চৌহান কিছুক্ষণ ভাবল, ঐ এম এল এর কথা শুনেই বোধহয় কিছুটা দ্বিধায়। ভার্মা ব্যাপারটা বুঝে মনে করিয়ে দেয়,

-"স্যার, ওখানে তো অন্য পার্টির লোক।"

সাহেব এবার একটু নড়ে চড়ে কর্তব্য স্থির করে বলে,

-"ঠিক আছে, তুমি চলে যাও। আমি রাজপালের বসের সঙ্গে কথা বলে নেব, রাজপাল এব্যাপারে কিছু বলতে এলে ওকে ওর বসের সঙ্গে কথা বলতে বলে দিও। তুমি শিওর, ওদের সঙ্গে কথা বললে কিছু পাওয়া যাবে?"

এবার ভার্মা সিরিয়াস,

-"স্যার, এই কেসে কিছু একটা আছে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছিনা, কিছু একটা মিসিং লিঙ্ক আমরা মিস করছি এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।"

-"দ্যাখ, আর অভিনবকে বোলো আমাকে একবার ফোন করতে, ওর সাথে আমার দরকার আছে।"

ভার্মা বেরিয়ে এসে রাইকে ফোন লাগাল,

-"ম্যাডাম, বড় সাহেবের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, আমি ভাবছি দেরি না করে কাল সকালেই মিসেস ব্যানার্জীর মা বাবার সঙ্গে দেখা করব। আপনার কাল অফিস আছে তো, তা পারবেন কী যেতে?"

ওপারে রাইয়ের গলাটা একটু কেমন শোনাল, অন্যরকম,

-"অফিস আছে কিন্তু যেতে হবেই ভার্মাজী। ওদের সঙ্গে দেখা করাটা এখন খুব জরুরী হয়ে পড়েছে।"

ভার্মার কেমন লাগল, কিছু একটা হয়েছে, কী হয়েছে!

-"কী ব্যাপার বলুন তো ম্যাডাম। আপনার সঙ্গে তো পরশু কথা হল, ঐ মন্দিরের মেয়েটির কথা নিয়ে। তারপরে আর কি কিছু হয়েছে?"

-"আমি কালও শান্তিবিহারে গিয়েছিলাম যতিন্দরের সাথে একজন মিসেস থমাসের সঙ্গে দেখা করতে। আপনাকে বললাম না সেদিন রাজীর এক প্রতিবেশীর খোঁজ পেয়েছি! উনি রাজীরা যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকত সেখানেই থাকেন। রাজীর ঠাকুমার সঙ্গে ওনার বন্ধুত্ব ছিল।"

রাই একবার বলেছিল বটে কিন্তু সেদিন ভার্মা অত খেয়াল করে শোনেনি, বরং রাজেশ্বরীর বয়ফ্রেন্ড বা কাজিন নিয়ে বেশী চিন্তা হয়েছিল, সেখান থেকেই ওর বাবা মায়ের সঙ্গে দেখা করাটা একান্ত জরুরী মনে হয়েছিল।

এছাড়া শান্তিবিহারের দিকটা রাজপালই দেখছে, সেরকম কিছু বলেনি কখনো। রাজীর বাবা প্রায় বছর দুয়েক হল বাড়ি বিক্রি করে চলে গেছে, এটা জানত। যদ্দুর জানে আশেপাশের প্রতিবেশীরা কেউ কিছু জানে বা রাজীকে দেখেছে কিনা ঐ রাতে সেসব খোঁজখবর শান্তিবিহারের পুলিশ করেছে।

-"হ্যাঁ বলেছিলেন বটে, তবে আমি খুব বেশী গুরুত্ব দিই নি, সরি ম্যাডাম?"

-"আরে না, আমিও তো তেমন গুরুত্ব দিইনি, তাই সেভাবে বলিনি আপনাকে। যতিন্দর বলেছিল ভদ্রমহিলা থানায় গিয়েছিলেন, কিন্তু আপনার রাজপাল বা অন্যরা ওঁকে পাত্তা দেননি, অথচ উনি ওখানকার খুব শ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তিত্ব, প্রাক্তন স্কুলটীচার। আমি ভেবেছিলাম রাজীর মা বাবার সঙ্গে তো দেখা করা যাচ্ছেনা, তাই এনার কাছেই ওদের বাড়ীর দিক সম্বন্ধে একটু খবর যদি পাই।"

ভার্মা অবাক, আগে জানলে রাজপালের এ কথাটা বড়সাহেবকে বলা যেত। কিন্তু ঐ ভদ্রমহিলা এমন কী বললেন রাই ম্যাডামকে!

-"তা উনি কী বললেন ম্যাডাম? নতুন কিছু, দরকারী খবর?"

-"ফোনে বলবনা ভার্মাজী, বুঝিয়ে বলা যাবেনা সবকথা। কাল আমি ছুটি নিচ্ছি, আপনি আমার ওখানে আসুন তারপর প্রোগ্রাম ঠিক করা যাবে। তবে একটা কথা, ওদের কোনোরকম আগে থেকে খবর দেবেননা বা ফোন করবেন না, আমরা হঠাৎ করে গিয়ে পড়ব। আর একটা ব্যাপার, যদি আমার পরিচয় জানতে চায় তো বলবেন অর্কদের আত্মীয়, আমি আপনার সঙ্গে গেছি ওদের সাথে রাজীর শেষকৃত্য নিয়ে কথা বলতে, বডি কারা নেবে ইত্যাদি। আমি অঞ্জনার সঙ্গে ফোনে কথা বলে নিচ্ছি, ওকে বুঝিয়ে দেব। আপনাকে আমি অফিস থেকে বেরিয়েই ফোন করতাম, ভালই হল আপনার ফোন এসে গেল।"

রাই ফোন রেখে দিল, এদিকে ভার্মা পুরো হাঁ। নিজের অফিসের দিকে যেতে যেতে রাই ম্যাডামের কথাগুলোই ভাবতে লাগল। কিছু গুরুতর ব্যাপারের হদিশ পাওয়া গেছে, রাই ম্যাডামের মত শান্ত চুপচাপ মহিলাও বেশ উত্তেজিত হয়েছেন তা উনি যতই গলায় স্থির ভাব ফোটানোর চেষ্টা করুন না কেন!

সি আর পার্কের এই দিকটা একটু ভেতরে, একেবারে শেষের দিকে। নির্জন প্রায় সরু রাস্তার ওপরে দোতলা বাড়ি। ভার্মা একবার ঠিকানাটা মিলিয়ে নিল, গেটের ওপর লেটারবক্স দেখে। একঢালা বাড়ি, একতলার প্রবেশপথ সামনের দিকে যেখানে প্রধান প্রবেশ দ্বার, পাশ দিয়ে আরও একটা গেট, সেখান থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলার ল্যান্ডিং ও তার উপরে ছাদে।

রাই অর্কর কাছে শুনেছিল যে ছাদের ওপর বর্ষাতির দুটো ঘর রাজীর মার আর মামাদের থাকার জন্য রাখা। বাড়িটায় বাগান বলে কিছু নেই, একদিকে যতটা খালি জায়গা আছে সেটা নিয়ে গ্যারাজ বানানো, গ্যারাজের ওপরে একখানা ঘর, তার জানালা খোলা। আর কোনোদিকে কিছু না দেখতে পেয়ে রাই ধরে নিল ঐ গ্যারাজের উপরের ঘরেই এবাড়ির যে কেয়ারটেকার সে বা তার পরিবার থাকে। রাইয়েরা গেট ঠেলে ঢুকতেই গ্যারাজের ওপরের ঘরের জানালায় একজোড়া চোখ দেখা গেল। ওরা কিছু না বলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকল, ঘরের ভেতরের মানুষটি বাইরে এলনা কিন্তু মনে হয় জানালা থেকেও সরলনা। এরা যেই দোতলা পেরিয়ে ছাদের সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে, একজন ঐ ঘরটা থেকে বেরিয়ে এসে লাগোয়া এক চিলতে বারান্দা কাম ল্যান্ডিং এর মত জায়গায় যেখান থেকে গ্যারাজের ওপরে যাবার ঘোরানো লোহার সিঁড়ি নীচে নেমে এসেছে সেখানে দাঁড়ালো।

-"কাকে চাই, ওপরে কোথায় যাচ্ছেন?"

বয়স্ক লোকটি এককালে বেশ লম্বাই ছিল, এখন বয়সের ভারে ইষৎ নুয়ে আছে তবে এমনিতে বেশ সবল, পরনে খাকি বারমুডা আর একটা ময়লা কুর্তা। লোকটির মুখ দেখে রাইয়ের মনে হল এ পাহাড়ের লোক।

ভার্মা পুলিশী চালে উত্তর দিল,

-"আমি থানা থেকে আসছি, মিঃ গিরীশের সাথে দরকার আছে।"

এই প্রথম রাই একজনকে দেখল, একটি সাধারণ লোক, যে পুলিশের নামে ঘাবড়াল না, উল্টে বেশ ডাঁটেই বলল,

-"আপনি ফোন করে এসেছেন? আমাকে তো ওরা বলেনি কেউ আসবে বলে। আপনি কোথাকার পুলিশ?" শেষ কথাটা বেশ একটু তাচ্ছিল্যের সাথেই বলল রাইকে আপদমস্তক দেখতে দেখতে। ভার্মা প্লেন ড্রেসে আছে তার ওপর সঙ্গে রাই, প্রশ্ন আসারই কথা কিন্তু সেটা এর মত কারুর কাছ থেকে আসবে রাই আশা করেনি।

ভার্মা অবশ্য জাত পুলিশ, কোনো কিছুতেই বিচলিত না হয়ে নিজের হাতে কনট্রোল তুলে নিতে ভালোই পারে। সোজা উত্তর না দিয়ে, গর্জন করে বলল,

-"তুই কে, এখানে কী করিস? বাড়িতে পুলিশ কেন আসে, খুন হলে পুলিশ আসবে না কী ব্যান্ড পার্টি আসবে, হাঁ? পুলিশকে খবর দিয়ে চিঠি লিখে আসতে হবে, তাই না? তা এখনি দিচ্ছি খবর, যা গিয়ে খবর দে বাবুকে। তারপরে তোদের সবার খবর নেব আমি।"

রাই তো ভার্মার বুলি শুনে অবাক, লোকটার কিন্তু খুব কিছু হেলদোল নেই, সেও জবাবে সমান তেজে কিছু একটা বলতে যাবে এমন সময় ছাদে ঢোকার মুখে সরু কোলাপসিবলের ঐদিকে একজন লোক এসে দাঁড়াল,

-"কী হয়েছে নেকরাম? কারা এসেছে?"

রাইয়ের মনে হল এ নিশচয়ই রাজীর বাবা। নেকরামের দৃষ্টি অনুসরণ করে ভদ্রলোকের চোখ গেল ভার্মার দিকে, তার আড়ালে ছোটখাটো রাইকে বোধহয় খেয়াল করেনা। গেট খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করে,

-"একী, ভার্মা আপনি? কী ব্যাপার?"

ভার্মা ওপরে উঠতে উঠতে বলে,

-"আপনার সঙ্গে আর ম্যাডামের সঙ্গে একটু কথা ছিল, চলুন ভেতরে গিয়ে বলছি।"

রাই ভার্মাকে অনুসরণ করতে করতে নেকরামের দিকে তাকায়, সে তখন তার ঘরে ঢুকছে, খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখল রাই, বেশ বড় ঘর, সাজানো, এক চিলতে রান্নার জায়গা, একটা দরজা দেখা যাচ্ছে, হয়ত বাথরুমের।

সাধারন কেয়ারটেকারের ঘরের মত খুপরি নোংরা অন্ধকার ঘর নয়। নেকরাম কী একাই থাকে? লোকটাকে বেশ জাঁদরেল মনে হল, ও নিশচয়ই রাজীকে ভালো চিনত, রাজীর কাছেও তো এবাড়ির চাবি থাকত।

দুটো পাশাপাশি ঘর আর কিছুটা ঢাকা বারান্দা মত। সেখানে কতগুলো বেতের চেয়ার টেবিল ছড়ানো রয়েছে, সবুজ রং করা, একদিকে রান্না করার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, সেখানে গ্যাস স্টোভ আর কিছু বাসন পত্র আছে। আরেকদিকে একটি সিঙ্ক আর ছোটো ফ্রিজ। বসার জায়গাটায় একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব, পাশের বাড়ির আম গাছ আর সুপারি গাছের ছায়া পড়ে কিছুটা আলো আঁধারির সৃষ্টি করেছে। রাজীর বাবা গিরীশের মুখের ভাব বেশ অপ্রসন্ন, বোঝা গেল সে একেবারেই খুশী হয়নি ওদের দেখে, বসতেও বলল না। ভার্মা অবশ্য নিজেই বসে পড়ল চেয়ারে, দেখাদেখি রাইও। গিরীশ ভার্মার দিকে তাকিয়ে বেশ কড়াভাবে বলল,

-"আমার স্ত্রী খুব আপসেট, বিছানা থেকে উঠছেনা। ওর সঙ্গে কথা বলা কি খুব দরকার? আমরা তো যা বলার শান্তিবিহার থানায় বলেছি।"

ভার্মাও জবাবে গলাটাকে মধুর কঠিন করে বলল,

-"দরকার না হলে কি আর এসময় এসে আপনাদের বিরক্ত করি সাব? আমি আমাদের বড় সাহেবের কথায় এসেছি, ওনার কথা হয়েছে দিল্লী পুলিশের বড় কর্তার সঙ্গে। শান্তিবিহারের কাজে তারা খুশী নয়, আমাদের আরও একটু সক্রিয় হতে ওনারাই অনুরোধ করেছেন। আপনি রাজপালকে যা বলেছেন তারপরেও কিছু ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সেসব নিয়ে আমি কথা বলতে এসেছি। তা ম্যাডাম অসুস্থ হলে, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে আমরা ঘরে গিয়ে কথা বলতে পারি ওনার সঙ্গে, এই ম্যাডামও থাকবেন সঙ্গে।"

ভার্মা ইচ্ছে করেই ভাবে ভঙ্গীতে বোঝাতে চাইল সেই এখন এ কেসের মুখ্য তদন্তকারী অফিসার, রাজপাল নয়। টোটকায় কাজ হল, ওর কথা শুনে গিরীশের তেরিয়া ভাবটা কমল মনে হল, একটু বিভ্রান্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল,

-"দেখি জিজ্ঞেস করে, যদি উঠে আসতে পারে একবার"।

ভার্মা রাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল, রাইও, ভালোকথা ভালোভাবে বললে কেউ আজকাল পাত্তাই দেয়না!

কয়েক সেকেন্ডেই ফিরে এসে গিরীশ জানাল ওদের, ওর স্ত্রী শুভা আসছে তৈরী হয়ে। কেউ কোনো কথা বলছিল না, সবাই অপেক্ষায়। রাই ভালো করে দেখছিল রাজীর বাবাকে। বয়স হয়েছে কিন্তু এখনও বেশ ভালো দেখতে ভদ্রলোককে, হ্যান্ডসাম বৃদ্ধ। লম্বা টান টান চেহারা, রঙ টা মাজা মাজা, মাথার চুল সব সাদা, মুখচোখ কাটা কাটা, বয়সকালে মনে হয় খুবই সুপুরুষ ছিলেন। রাজীর মুখের সঙ্গে বেশ মিল আছে।

রাই উদগ্রীব হয়ে বসে রইল ওর স্ত্রীকে দেখার জন্যে। মিনিট দুয়েক পরে যে ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন তাকে দেখে কিন্তু ও হতাশ হল, তিনি একেবারেই সে অর্থে সুন্দরী নন। শুভা এসে ওদের দুজনকে নমস্কার করে একটা চেয়ার টেনে বসল। মুখটা ঈষৎ বিষন্ন দেখালেও এমনি চলাফেরা বা চেহারায় অসুস্থতা বা শোকের তেমন লক্ষণ নেই। প্রথম দেখায় সাধারণ লাগলেও রাই ভালো করে দেখে বুঝল ভদ্রমহিলা সব মিলিয়ে কিন্তু টানটান স্মার্ট, বরং ওর স্বামী অত সুপুরুষ হয়েও একটু শিথিল আলুথালু ধরণের, তড়বড় করে কথা বলে। শুভার পরণে বেশ সুন্দর চওড়া পাড়ের শাড়ি, মানানসই অল্প গহনা, চওড়া কপালে বড় একটা টিপ, মুখে হালকা প্রসাধন।

একটা ব্যাপার হল স্বামী স্ত্রী কেউই রাইয়ের উপস্থিতি নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলছেনা অথবা তার পরিচয় জানতে চাইছেনা, ভার্মাও আগ বাড়িয়ে কিছু বলল না। ওদের নজর শুধুই ভার্মার দিকে। ভার্মা একবার রাইয়ের দিকে তাকিয়ে যেন সম্মতি নিয়ে শুরু করল,

-"সরি, আপনি অসুস্থ তাও আপনাদের বিরক্ত করতে হচ্ছে। আসলে আমরা তদন্তের মাঝে মিসেস ব্যানার্জীর স্কুলের বন্ধুদের কাছে জানলাম, উনি ওনার এক বিদেশের কাজিনের সাথে খুব ক্লোজ ছিলেন, প্রায় প্রতিদিনই তার সাথে চ্যাট হত ওনার। এই কাজিনের সঙ্গে আমরা কথা বলতে চাই। ওর যোগাযোগের ঠিকানা, ফোন নাম্বারটা চাই।"

গিরীশ ও শুভা দুজনেই পরস্পরের দিকে দেখে একবার বিস্ময়ে। তারপর শুভা বলে ওঠে,

-"বিদেশের কাজিন? বিদেশে কোনো কাজিন নেই তো।"

তারপরেই আবার কী ভেবে বলে ওঠে,

-"অবশ্য আমার বড় ভাই থাকে বিদেশে, ওর স্ত্রী বিদেশী, ওদের এক মেয়ে আছে। কিন্তু তাদের সাথে রাজীর তেমন কোনো যোগাযোগ ছিলনা, আমারই যোগাযোগ খুব অল্প। ভাই আসে দেশে কাজেকম্মে, ওর বৌ মেয়ে তো আসেও না।"

ভার্মা এবার গিরীশের দিকে তাকায়,

-"আপনার মেয়ে তার বন্ধুদের বলেছে সে কাজিনের সাথে চ্যাট করে, আর এই কাজিন একজন পুরুষ। কে হতে পারে বলে মনে হয় আপনার? আপনার ওদিকের কোনো আত্মীয়স্বজন?"

গিরীশ একবার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নেয়, তারপর বলে,

-"সেরকম কোনো কাজিন নেই রাজীর। আমি এক ছেলে, আমার বাবাও এক ছেলে ছিলেন। আমি অনেককাল দেশে ছিলাম না, আমার ওদিকে আত্মীয়স্বজন, আমার মায়ের তরফের কিছু আছে, তাদের মধ্যে কেউ রাজীর বয়সী বা কাছাকাছি বয়সের নেই, সবাই হয় অনেক বড় বা বেশ ছোট। রাজীও ওদিকের সবাইকে সেরকম চেনেনা, ঘনিষ্ঠ হওয়া তো দুরের কথা। ওতো আমরা ওখানে সেটল করার পর কয়েকবার মাত্র গেছে, সবার সঙ্গে একটু আধটু পরিচয় হয়েছে। এরকম কোনো কাজিনের কথা আমরা জানিনা, ওর বন্ধুদের কিছু ভুল হচ্ছে।"

শুভাও ঘাড় নেড়ে সায় দিল স্বামীর কথায়।

এবার রাই মুখ খোলে।ধীরে, শান্তভাবে,গিরীশের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে,

-"আপনার কেউ নেই, আপনার স্ত্রীরও কেউ ছিলনা, ঠিক জানেন আপনি?"

গিরীশ একটু বিরক্ত, এই প্রথম বোধহয় ভার্মার সঙ্গী মহিলাকে খেয়াল করল ওরা, এটা আবার কে বটে!

-"আগেই শুনলেন তো, শুভার তরফেও সেরকম কেউ নেই।"

-"তাতো শুনলাম, কিন্তু আমি যে আপনার প্রথম স্ত্রী অর্থাৎ রাজীর মায়ের তরফের কথা জিজ্ঞেস করছি মিঃ গিরীশ।"

গিরীশ আর শুভা দুজনেই এ কথা শুনে ভীষণ চমকে কেমন একটা হয়ে গেল, মুখ দেখে মনে হল যেন কোনো বিস্ফোরণ ঘটেছে বা মাথায় বাজ পড়েছে।

রাই আর ভার্মা চুপ করে একদৃষ্টে ওদের প্রতিক্রিয়া দেখতে থাকে। শুভাই প্রথম সামলে নিয়ে মুখ খোলে, চোখটোখ তুলে একখানা নাটকীয় ভঙ্গী করে,

-"না, আমিই রাজীর মা। রাজী আমারই মেয়ে। আপনারা এসব কী আজেবাজে কথা বলছেন, কেন এসেছেন আপনারা, কী মতলবে?"

বলে আঁচলে মুখ ঢেকে কান্নার ভাব করে বসে রইল। গিরীশের মুখটা প্রথমে ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, স্ত্রীর কথা শুনে সম্বিত ফিরে পেয়ে একেবারে বেগুনি হয়ে উঠল। চেয়ার থেকে উঠে শুভার পাশে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে ভার্মার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলল,

-"ইনি কে? এসব কী আজেবাজে কথা বলছেন? রাজী আমার আর শুভার মেয়ে। আপনারা খোঁজ নিন শান্তিবিহারে, সবাই সাক্ষী দেবে। এসব আজেবাজে কাহিনী বানিয়ে আপনি আমাদের ফাঁসাতে এসেছেন অর্কর হয়ে? ওকে এইভাবে বাঁচাবেন ভেবেছেন? আমি ওকে দেখে নেব, ঐ মেরেছে আমার মেয়েকে। আমার মেয়ে কার সঙ্গে চ্যাট করছিল তা তদন্ত করেছেন, অর্কর কারু সঙ্গে কিছু ছিল কিনা সেসব কেন দেখছেন না আপনারা?"

ভার্মাও এবার নিজের মূর্তি ধরল। গিরীশের থেকেও জোর গলায় বলল,

-"আপনারা শান্ত হয়ে বসুন। পুলিশের সঙ্গে বেশী চালাকি করার চেষ্টা করবেন না, লাভ হবেনা। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমরা সব খবর নিয়েই এসেছি।"

শুভার মুখের আঁচল সরে গেছে, চোখে জলের জায়গায় ভয়ের ছায়া। রাই একটু সরে গিয়ে পুরো ব্যাপারটা দেখতে থাকে দর্শকের মত। তার কাজ শেষ, এসব জায়গায় ভার্মাই উপযুক্ত। গিরীশ উত্তেজিত হয়ে আবার কী বলতে যাবে, ভার্মা হাত তুলে থামিয়ে দেয়,

-"মিঃ গিরীশ, রাজেশ্বরী আপনার প্রথমা স্ত্রীর মেয়ে, ইনি আপনার দ্বিতীয়া স্ত্রী, একথাটা আপনি আগে বলেননি কেন? শুধু তাই নয়, মিঃ ব্যানার্জী বা তার বাড়ির কেউও জানেনা একথা, তাদেরও কিছু বলেননি আপনি,। কেন?

শুভা চুপ করে আছে, গিরীশ এখনও তড়পাচ্ছে,

-"সেটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাজীকে শুভা জন্ম না দিতে পারে কিন্তু ঐ রাজীর মা, ছোট থেকে ঐ ওকে এতবড় করেছে, আর আজ মেয়ের অকাল মৃত্যুতে কিরকম আপসেট সেটা তো আপনারা দেখছেনই! আমার প্রথম স্ত্রী যখন মারা যায় তখন রাজী চার মাসের, রাজী শুভাকেই মা বলে জেনেছে চিরদিন। আমরা তাকেও কখনো কিছু বলিনি এ নিয়ে, তাই অর্কদেরও বলার দরকার আছে মনে করিনি। কিন্তু তার সঙ্গে এ কেসের কী সম্বন্ধ?"

এবার রাই আর চুপ থাকতে পারেনা,

-"আপনার প্রথম স্ত্রী মারা গেছিলেন, আপনি শিওর? উনি নিখোঁজ হয়ে যাননি তো?"

গিরীশ হতবাক, রাইয়ের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন কিছু বলতেও ভুলে যায়। এবার ভার্মা বলে,

-"আপনি তো সেইসময় সবাইকে বলেছিলেন আপনার স্ত্রী বাজারের থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, আর ফেরেনি। ঠিক আপনার মেয়ে রাজেশ্বরীর মত। ব্যাপারটা আসলে কী হয়েছিল খুলে বলুন তো মিঃ গিরীশ?"

গিরীশ এবার হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা নীচু করে বসে পড়ে, কিছুই বলেনা। শুভারও মাথা নীচু, এদের দিকে তাকায়ও না, জড়ভরতের মত বসে থাকে একভাবে, নিস্পন্দ। ভার্মা আবার বলে,

-"আমরা অপেক্ষা করছি, আপনি আমাদের আপনার স্ত্রীর কথা সব বলুন। কবে হয়েছিল, কোথায়, সব কিছু। আপনি না বললে যেভাবে আপনার প্রথম স্ত্রীর অস্তিত্বের কথা জেনেছি, বাকীটুকুও জেনে নেব কোনো না কোনো ভাবে, তাই কিছু না লুকিয়ে সব বলুন।"

গিরীশ খুব যেন কষ্ট হচ্ছে এভাবে মাথাটা তুলল।

-"আমরা তখন ফিরোজগাঁও তে থাকতাম। আমি বছরখানেক হয়েছে দিল্লী এসেছি চাকরি নিয়ে। রাজী সবে হয়েছে। তাকে বাড়িতে আমার মায়ের কাছে রেখে আমার স্ত্রী নির্মলা বাজারে গিয়েছিল বিকেলে, একাই যেত বাজারে মাসকাবারী দোকান করতে। অনেকসময় রিক্সা নিয়ে বাড়ি চলে আসত, কখনো আমি অফিস থেকে ফেরার পথে স্কুটারে তুলে নিয়ে আসতাম। সেদিন আমি ফেরার পথে যেখানে ও দাঁড়াতো সেখানে দেখলাম ও নেই। বাড়ি এসে শুনি ও ফেরেনি। তখন আবার বেরিয়ে বাজারে খুঁজলাম, চতুর্দিকে খুঁজলাম, ফিরোজগাঁও ছোট জায়গা, কোথাও পেলাম না। নির্মলা এদিকের রাস্তাঘাট খুব একটা চিনতনা, ওর সেই মাস তিনেক হয়েছিল এদেশে এসে। পরদিন লোক্যাল থানায় খবর দিলাম, তারাও খুঁজল অনেক। পাওয়া গেলনা।"

-"তাহলে উনি মারা গেছেন এমন কোনো প্রমাণ আপনার কাছে নেই?"

গিরীশ রাইয়ের এ প্রশ্নে ঘাড় নাড়ল,

-"তা নেই, তবে আর কী হবে? বেঁচে থাকলে তো খবর পেতাম।"

-"কিন্তু কীভাবে? কতদিন খোঁজাখুঁজি করা হয়েছিল? পুলিশ কিছুই বার করতে পারেনি?"

-"নাঃ। আমি তখন বাচ্চা মেয়ে আর বুড়ো মাকে নিয়ে হিমশিম। আত্মীয়স্বজন কেউ নেই কাছে। একবার ভেবেছিলাম চাকরি ছেড়ে চলে যাব। শুভার ছোট দাদা আমার কলীগ ছিল, ও খুব সাহায্য করেছিল। মা রাজীকে নিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিল, সেখানেই ছিল রাজী কিছুদিন। পরে শুভা আর আমি ওকে নিয়ে আসি এখানে, শান্তিবিহারের বাড়ি হয়, সংসারে শান্তি আসে। আজ এতদিন পরে আবার সব গোলমাল হয়ে গেল।"

-"রাজী কিছুই জানত না এসব কথা?"

-"না, আমরা কেউ কিছু বলবনা ঠিক করেছিলাম, আমরা চাইনি ওর জীবনে এটা নিয়ে কোনো গোলযোগের সৃষ্টি হোক। শান্তিবিহার নতুন জায়গা, সেখানে সবাই রাজীকে শুভার কোলেই দেখেছে।"

রাই ভাবল সেই শান্তিবিহারের মিসেস থমাসই জানত, রাজীর ঠাকুমা তাকে সব বলেছে।আরও কে কে জানে কেজানে!

-"আপনার অফিসে কেউ জানতনা, এতবড় ঘটনা? সেরকম হলে অর্কর বাবারও তো জানার কথা, উনি তো আপনার সাথে একই অফিসে ছিলেন।"

-"অর্কর বাবার সঙ্গে আমি অন্যজায়গায় কাজ করি এর পরে, অন্য অফিসে বদলি হয়ে। সেইসময় আমি নতুন চাকরি পেয়েছি, অফিসে কারুকে কিছু বলিনি, শুধু বস জানতেন। তিনি কাউকে বলেননি, বয়স্ক ছিলেন, কিছুদিন পরেই অবসর নেন, অনেকদিন হল মারাও গেছেন। শুভার দাদা ছাড়া ঐ অফিসে কারো সাথে কোনো ঘনিষ্ঠতা ছিলনা আমার, নতুন ছিলাম, ভাষার সমস্যা ছিল।"

ভার্মা রাইয়ের দিকে তাকালো, আর কী জিজ্ঞাস্য আছে। রাই গিরীশকেই জিজ্ঞেস করে,

-"তাহলে আপনার প্রথমা স্ত্রীর দিকেও রাজীর কোনো কাজিন নেই?"

-"তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ ছিলনা। নির্মলার এক ভাই ছিল বটে, কিন্তু তার ছেলেমেয়ে কী আমি জানিনা। আর রাজী যখন নির্মলার কথাই জানত না তখন সেই কাজিনদের কথাই বা জানবে কী করে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগই বা হবে কোথায়!"

-"ওনার ভাই বাবা এরা খোঁজ করেনি, এখানে আসেনি?

গিরীশ এবার একটু অসহিষ্ণু ভাব দেখায়,

-"এইসব পুরোনো কথা এখন উঠছে কেন? আমার মেয়ের খুনের কিনারা না করে আপনারা সাতাশ বছর আগে কী ঘটেছিল তা নিয়ে এত পড়ছেন কেন? আপনারা অর্কর দিকটা ভালো করে দেখুন, ওর নিশ্চয়ই কোনো মোটিভ আছে। ঐ মেরেছে রাজীকে।"

এবার ভার্মা বলে,

-"আমরা কী করছি না করছি সেটা তো আপনাকে বলা যাবেনা, আপনি শুধু আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিন ঠিকঠাক। আপনার প্রথমা স্ত্রীর বাবা ভাই এরা এসেছিল?"

-হ্যাঁ, এসেছিল। কেস দিল্লী পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে গেছিল, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। পুলিশেরও ধারণা ছিল যে নির্মলা মারা গিয়েছে।"

রাই জিজ্ঞেস করে,

-"ওদের বাড়ি কোথায় তা তো আপনার জানা আছে নিশ্চয়ই, তাদের ঠিকানাটা?"

গিরীশ বেশ অনিচ্ছার সাথে বলে,

-"ক্যানানোর এ। ঠিকানা মনে নেই। তবে সে বাড়িতে কেউ নেই শুনেছি, নির্মলার বাবা মা অনেকদিন মারা গেছে, ভাই ওখানে নেই।"

-"ভাই কোথায় আছে?"

-"ঠিক জানিনা তবে শুনেছি গাল্ফে।"

রাই ভার্মার দিকে তাকায়। রাজীর মামা তাহলে বিদেশে থাকে।

রাই একটু গল্পের সুরে গিরীশ আর শুভা দুজনের দিকেই বলে,

-"আচ্ছা আপনারা যে অর্ককে সন্দেহ করছেন তার কোনো ভিত্তি আছে না এমনিই? রাজীর মৃত্যুতে ওর কী লাভ মনে হয় আপনাদের?"

গিরীশ আবার উত্তেজিত,

-"ওতো সঙ্গে ছিল রাজীর, কয়েক মিনিটে রাজী হারিয়ে গেল। এ সম্ভবই নয়, আমরা ঐ এলাকায় থাকতাম, ওখানে ভরা বাজার থেকে কাউকে তুলে নিয়ে যেতে কোনোদিন শুনিনি। লাভ জানিনা, সে আপনারা খুঁজে বার করুন।"

রাই ওর উত্তেজনা দেখে মৃদু হেসে শুভাকে বলে,

-"আচ্ছা, রাজীর গয়নাগাঁটি তো সব আপনার কাছে, তাই না?"

এতক্ষনে শুভার কথা ফোটে, বেশ একটু তীব্র স্বরে বলে,

-"হ্যাঁ, ওর লকার নেওয়া হয়নি তাই আমার এখানের লকারেই ছিল। আমি তো এখানে থাকিনা, রাজীই লকার অপারেট করত। অর্করা কি রাজীর গয়না চায়? চাইলে দিয়ে দেব, নিয়ে যাক ওরা, মেয়েই রইলনা, তার গয়না নিয়ে আমরা কী করব!"

রাই পাত্তা দিলনা,

-"না কটা গয়নার জন্যে কি ওরকম একটা ছেলে বৌকে খুন করতে পারে, বিশেষ করে গয়না যখন আপনার লকারে, সেগুলো উদ্ধার করাও শক্ত যদি আপনি হাতে করে না দেন! আমি অর্কর লাভ বুঝতে চেষ্টা করছি। আচ্ছা, রাজীর নামে কোনো সম্পত্তি ছিলনা, বিষয়?"

স্বামী স্ত্রীর মুখ আবার ছাই পানা। ওদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে চলতে চলতে রাই অজান্তেই বোধহয় কোনো ব্যথার জায়গায় হাত দিয়ে দিয়েছে। ভার্মাও ওদের অবস্থা দেখে কৌতূহলী, রাই প্রশ্ন করে উন্মুখ ভাবে তাকিয়ে আছে। গিরীশ যেন বুঝে নেয় যে জবাব না দিলে রেহাই নেই, তাই আবার বেশ অনিচ্ছাপূর্বক বলে,

-"তেমন কিছু নেই, আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত, চাকুরীজিবী, দেশে অল্প জমিজমা আছে। রাজীর ঠাকুমা মানে আমার মা বোধহয় কিছু জমি রাজীর নামে করে গেছেন।"

ভার্মা এবার স্পষ্টতই ধমক দেয়,

-"বোধহয় মানে, আপনি নিশ্চিত জানেন না?"

ধমক খেয়ে গিরীশ বলে,

-"হ্যাঁ, মানে দু একটা জমি রাজীর নামে আছে। "

এবার রাই বলে,

-"রাজীর মৃত্যুতে সে সম্পত্তি অর্কর হওয়া উচিৎ যদি না রাজী বা ওর ঠাকুমা অন্য কিছু ব্যবস্থা করে যায়। কিন্তু ঐ অল্প জমির জন্য খুন করে কেউ! সে হলে অর্কর রাজীর মৃত্যুতে পয়সাকড়ির লাভ বিশেষ দেখা যাচ্ছেনা।"

গিরীশ ওর কথাটা লুফে নিয়ে বলে,

-" নাই তো। ওর নিশ্চয়ই কোনো অন্য অ্যাফেয়ার আছে, আপনারা ওকে লক আপে পুরে জিজ্ঞাসাবাদ করুন, ঠিক বলে দেবে। পুলিশ তো ওকে কিছুই করছেনা, উল্টে আমাদের বিরক্ত করছে।"

ভার্মা বলে,

-"অল্প হোক আর যাই হোক ম্যাডাম, এই সম্পত্তির ব্যাপারটা জানতে হবে ঠিক করে। রাজেশ্বরীর কোনো উইলটুইল আছে কিনা। মিঃ গিরীশ, আপনাদের কেরালায় উকিল কে? তার নামঠিকানা দিন আমাকে।"

গিরীশ এবার কোনো আপত্তি না করে উকিলের নাম ঠিকানা লিখে দেয়।

ভার্মা আর রাই এবার উঠে পড়ে, অনেক কাজ আছে তাদের।

-"আপনারা আমাদের না বলে এখান থেকে যাবেন না। আমরা আরও কিছু জানার হলে ভবিষ্যতেও আসতে পারি।" সিঁড়ির মুখে এসে রাইয়ের কী মনে হতে বলল,

-"রাজীর বডি দু এক দিনের মধ্যে ছেড়ে দেবে পুলিশ। ভালো হয় আপনারা শেষ কাজটা দুই বাড়ী মিলে করলে, অন্তত কিছু সময়ের জন্য তিক্ততা ভুলে। ওরা রাজী, আপনি যদি বলেন, অর্কর দিদি আপনাদের ফোন করে সব ব্যবস্থা করবে।"

গিরীশ রাগেনা বা উত্তেজিত হয়না, শুধু শুভার দিকে তাকায়, শুভার চোখ বেশ জলটলটল, বলে,

-" আমাদের আপত্তি নেই, ওরা যদি ব্যবস্থা করে তো করুক। আর যে যাবার সে তো চলেই গেছে, আমাদের যে ক্ষতি হয়ে গেল ...... "।

ওরা উত্তর করেনা, নামতে শুরু করে, গিরীশও ওদের সঙ্গে একটু নামে। ওদের পায়ের আওয়াজেই বোধহয় নেকরাম বেরিয়ে আসে তার বারান্দায়। তার দৃষ্টি বেশ রুক্ষ, বিশেষ করে ভার্মার দিকে তো একেবারে জ্বলন্ত চোখে তাকায়। ভার্মা অবশ্য খেয়াল করে না, আগে আগে নেমে যায়। রাই গিরীশকে জিজ্ঞেস করে,

-"এই নেকরাম আপনাদের এখানে কতদিন আছে? ওর তো বেশ বয়স হয়েছে, ও পারে আপনাদের বাড়ির দেখাশোনা করতে?"

-"ও আসলে শুভার বাবার আমলের লোক। ওনার ব্যক্তিগত অ্যাটেনডেন্ট ছিল। আলমোড়ার গ্রামে ওর বাড়ি, পরিবার আছে, কিন্তু ও এখানে থাকতেই ভালবাসে। দিল্লীতে ওর আত্মীয়স্বজন সব ছড়ানো। এখন অবশ্য একা থাকেনা, ওর ছোট ছেলেটাও এখানে থেকে একটা কারখানায় চাকরি করে। নেকরাম এখন আমাদের বাড়ির সদস্যের মতই।"

রাই যেতে যেতে নেকরামের কথা ভাবে, পুলিশকে ওর এত অপছন্দ কেন! এমন তো নয় যে পুলিশ রাজীর মৃত্যুর ব্যাপারে বার বার আসছে, গিরীশ শুভাকে বিরক্ত করছে, তাহলে? পুলিশের সঙ্গে ওর দুশমনী কী, তাদের ভয়ই বা করেনা কেন ও?

দিল্লির উপকন্ঠে ফিরোজগাঁও, এদিকের হিসেবে গ্রামই,নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের বাস। এখনো অনেকেই যারা দিল্লিতে চাকরি করে অথচ দিল্লির আকাশছোঁয়া বাড়ি ভাড়া দিতে অপারগ, এইরকম দিল্লীর কাছেপিঠে জায়গা খুঁজে নেয় পরিবার নিয়ে বসবাসের জন্য। একটু ভেতরে গেলে মফস্বল শহরকে মনে পড়িয়ে দেয়, সারি সারি নানা মুহল্লা, ছোট বড় নানা আকারের ছিরিছাঁদহীন ঘরবাড়ি একটার ওপরে আর একটা চেপে আছে, সরু সরু রাস্তা, রাস্তার ওপরেই খাটিয়া পেতে আড্ডা, বাচ্চাদের খেলাধূলো। এককালে কিছু পরিকল্পনা ছিল পার্ক ইত্যাদির,তার নিদর্শন স্বরূপ কিছু সবুজ বেখাপ্পা গাছ মাঝে মাঝে, তবে সেসব পার্কের জায়গা দখল করে নিয়েছে দোকানপাট, লোকের ঘর এগিয়ে এসে।

গিরীশের দেওয়া ঠিকানায় পৌঁছে দেখল সেখানে একটি নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি উঠছে। আশেপাশে জিজ্ঞেস করে জানল, আগের বাড়ির মালিক মারা যাবার পর ভাগাভাগি হয়ে ছেলেরা বাড়ি শুদ্ধু জমি বিক্রি করে দিয়েছে। ওরা কেউ এখানে থাকেনা, আশেপাশে খোঁজ নিল, ভাড়াটে পালটায়, পুরনো বাসিন্দা, অনেক বছর আছে এখানে, এমন কাউকেই পাওয়া গেলনা। এক দু জন যারা বয়স্ক বাড়ির মালিক, তাদেরও কারোর এত আগের কথা মনে নেই, কিছুই মনে করতে পারল না।

কিছুক্ষণ এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করে হাল ছেড়ে দিয়ে ভার্মা থানায় যাওয়া স্থির করল, রাই অবশ্য বাজার ঘুরে দেখার কথা বলেছিল। ভার্মার খুব একটা ভরসা হল না সেখানে কিছু জানা যাবে বলে। একটা বাজার চকের কাছে, সেখানে বাসস্ট্যান্ড, এছাড়াও দু একটা ছোটোখাটো বাজার আছে। গিরীশের কথামত সাতাশ বছর আগে এখানে একটাই বাজার ছিল, সেটা ঠিক কোথায় ছিল তাতেও সন্দেহ আছে। থানায় গিয়ে দেখা গেল, সে নামেই থানা, আসলে ছোট এক পুলিশ চৌকি। থানায় ইনচার্জ নেই, সে পেছনে কোয়ার্টারে, দুটো কনস্টেবল জামাটামা খুলে থানার সামনে গাছের নীচে খাটিয়ায় আরাম করে বসে তাস খেলছে, ভেতরে কেউ নেই, দুয়ারে একটা কুকুর শুয়ে আছে। ভার্মা সোজা গেল তাসের আসরে, রাই ব্যাপারস্যাপার দেখে না নেমে গাড়িতে বসে রইল!

ভার্মার পরিচয় পেতেই দলটায় একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, কনস্টেবলরা জামা গায়ে দিতে দিতে দৌড়ল সাহেবকে বাড়ি থেকে ডেকে আনতে। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে ভার্মা থানা থেকে বেরিয়ে এল, সঙ্গে থানার ইন চার্জ ভদ্রলোক। রাইয়ের কী পরিচয় ভার্মা দিয়েছে জানেনা, সে এসে খুব নমস্তে করল ম্যাডামকে, চা টা কিছু খেলেন না বলে দুঃখ প্রকাশও করল। ভার্মা গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে চকের বাজারের দিকে যেতে বলল।

-"এদের এখানে কিছুই প্রায় নেই, অত বছর আগেকার কোনো রেকর্ডই নেই। এখন দিল্লী পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে খুঁজতে হবে, সেখানে রেকর্ড থাকবেই। এই অফিসার তো এ থানায় বছর দুয়েক হল এসেছে, কিছুই জানেনা এখানের সম্বন্ধে। তবে একজন কনস্টেবল স্থানীয়,অনেকদিন আছে, সে বলল ঐ চকের বাজারই এখানকার পুরনো বাজার। আচ্ছা ম্যাডাম, আপনার কী মনে হয়, সত্যিই রাজেশ্বরীর মায়ের ঘটনার সঙ্গে আমাদের কেসের কোনো সম্পর্ক আছে?"

রাই একটু আস্তে আস্তে যেন কী ভাবছে এমন করে বলল,

-"আমি সত্যিই জানিনা ভার্মাজী। মিসেস থমাসও জানেন না, কিন্তু ওনার মনে হয়েছিল যে মা ও মেয়ের এভাবে প্রায় একইভাবে বাজার থেকে নিখোঁজ হওয়াটা স্রিফ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নাও হতে পারে, আরো অন্য কোনো ব্যাপার আছে। তাই উনি বন্ধুর কাছে গোপনীয়তার শপথ ভেঙে পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন। আমারও কীরকম ওনারই মত মনে হচ্ছে, কিন্তু এখনই কোনো যুক্তি আমি দেখাতে পারছিনা। গিরীশের এই প্রথম স্ত্রীর ব্যাপারটা আগেই বলা উচিৎ ছিল বলে আমি মনে করি, অন্তত রাজীর মা যে শুভা নয় সেটা। মিসেস থমাস এও বললেন যে যতদুর উনি জানেন, কেরালার সমস্ত সম্পত্তি গিরীশের মায়ের ছিল, যেখানে ওরা থাকে সেটা ওর মায়েরই বাপের বাড়ি। সেই কারণেই হয়ত ওরা প্রথম দিকে রাজীকে নিয়ে এসেছিল, মাকে খুশী করতে। মিসেস থমাসের মতে রাজীর ঠাকুমা কনকাম্মা শুভার ওপর একেবারেই খুশী ছিলেন না, নিজের ছেলের ওপরও না। ওনার যা টান, স্নেহ ভালোবাসা ছিল সব রাজীর জন্যে। ব্যাপারটা বেশ ভাববার মত, আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের উকিলের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। "

এর আগে ভার্মার সঙ্গে কেরালার গিরীশদের ওখানের থানার যোগাযোগ হয়েছে, ওর মোবাইলে নাম্বার ছিল। রাইয়ের কথায় ও গাড়িতে বসেই ফোন লাগালো। ওদিকের পুলিশ অফিসারটি বেশ ভালো, আগেই কথা হয়েছিল, চেনাজানাও। ভার্মা তাকে উকিলের নাম জানিয়ে অনুরোধ করল অফিসার যেন নিজে গিয়ে উকিলের সাথে দেখা করে সব জেনে আসে। সেইসঙ্গে রাই আরও কিছু খোঁজখবর নিতে বলে দিল, রাজীর ঠাকুমার ও মায়ের বাড়ির।

গাড়ি এসে চকবাজারে দাঁড়ালো। বাজার সেরকম কিছু নয়, তেমাথার মোড়ে একটা গোলচক্কর,বাসস্ট্যান্ড। কিছুটা এলাকা জুড়ে রাস্তার দুইধারে দোকান পাট। ওরা নেমেই খোঁজ করল পুরনো দোকান, যারা অনেক বছর ধরে আছে, সেইসব দোকানের। এক এক করে সব দোকানেই ঢুকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকল। কোথাও কিছু জানা গেলনা, দোকান পুরনো হলেও অনেক জায়গায় পুরনো লোক নেই, কোথাও পুরনো লোক দু একজন থাকলেও তাদের সাতাশ বছর আগের ঘটনা মনে নেই। শেষ যে দোকানটিতে ঢুকল সেটি একটি মুদীখানা, বৃদ্ধ লালাজী বসে আছে দোকানে। আটা ময়দা চাল গুড়ের বস্তা সবের একটা মিশ্র গন্ধ রাইকে কেমন ওর ছোটোবেলার সেই ছোট্ট শহরের দোকানের কথা মনে করিয়ে দেয়। আজকাল সুপার মার্কেটের চাকচিক্যে এসব গন্ধ যেন চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে!

লালাজীও সেই পুরনো স্কুলের লোক মনে হলে, পরিচয় না জেনেই আপ্যায়ন করলে সাদরে, দুপুরবেলায় দোকান খালি। লোকটির বয়স হয়েছে, দোকানটিও পুরনো, এদের মনে আশা জাগে, কে বলতে পারে হয়ত রাজীর মা নির্মলা এই দোকানেই শেষ সওদা করেছিল!

অচিরেই অবশ্য আশা ভঙ্গ হল, লালাজী ফিরোজগাঁওয়ের লোক নয়, পাশের গ্রামের লোক। দোকান ওনার বাবার প্রতিষ্ঠা করা, আগে ওনার বাবা বসতেন, উনি ওনার নিজগ্রামের দোকানে বসতেন। এখন দুই দোকানেই ছেলেরা বসে, উনি মাঝেসাঝে আসেন দুই দোকানেই। ভার্মার চোখে মুখে হতাশার ভাব স্পষ্ট, দোকান থেকে বেরোতে বেরোতে বললে

-"কী অবস্থা, এরকম একটা ঘটনা, সাতাশ বছরেই মানুষের মন থেকে ধুয়েমুছে সাফ, কারুর কিছু মনে নেই!"

রাই চিন্তা জড়ানো স্বরে বলে,

-"সেটা খুব স্বাভাবিক নয়, তাই না?"

ভার্মা ঠিক না বুঝে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকায়, রাই এবার বুঝিয়ে বলে,

-"দিল্লীর কাছে হলেও, এই জায়গাটা এত বছরেও খুব একটা বদলায় নি, শুধু বাড়িঘর দোকানপাট ও লোকজনের সংখ্যা একটু বেড়েছে। নাহলে তাকিয়ে দেখুন, এখনও বেশ মফস্বলের গন্ধ আছে। বাড়ির সামনে খাটিয়া পেতে এবাড়ি ওবাড়ির লোকেরা গল্প করছে, বাচ্চারা গলিতে খেলছে, বয়স্করা মাথায় পাগড়ি জড়িয়ে গাছতলায় বসে জটলা করছে। স্কুলের মাথায় ছাত নেই, মাস্টারজী বারান্দায় ব্ল্যাকবোর্ড পেতে মাটিতে বসা ছাত্রছাত্রীদের চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গিনতি করাচ্ছে। রাজধানীর থেকে বিশ কিলোমিটার দুরত্বে আছি মনেই হচ্ছেনা, মনে হয় কোথায় যেন এসে গেছি। এরকম জায়গায় সচরাচর কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনা, তাই সেরকম কোনো ঘটনা ঘটলে লোকের মনে থাকা উচিত, অনেক পুরনো হলেও। তাহলে কেন কারুর কিছু মনে নেই?"

-"কেন মনে হয় ম্যাডাম?"

-"একটা কারণ হতে পারে ঘটনা টা একজন ভিনদেশী পরিবারের, যারা ঘটনার আগে পরে বেশীদিন এখানে বাস করেনি। দ্বিতীয়ত, ঘটনাটা নিয়ে সেরকম হইচই হয়নি, পুলিশের তৎপরতা সেরকম ছিলনা, সোজা কথায় ঘটনাটি খুব শীগগির চাপা পড়ে যায়।"

দোকান থেকে ওরা বেরিয়ে এসেছে, গাড়ির দিকে যেতে যেতে হঠাৎ রাই ফিরে গিয়ে দোকানে ঢোকে আবার, একটু হকচকিয়ে গেলেও ভার্মা ওর পিছু নেয়। লালাজীও অবাক, তবু "আইয়ে আইয়ে ম্যাডাম" করে অভ্যর্থনা জানাতে ভুল হয়না।

-"লালাজী এখানে, এই গাঁয়ের মন্দির কোথায়? কতগুলো মন্দির আছে, কোনটা সবচেয়ে পুরনো, জানেন আপনি?"

জিজ্ঞেস করেই রাইয়ের সন্দেহ হল, লোকটি তো অন্য গাঁয়ের, ঠিক বলতে পারবে কি! কিন্তু তার সব সন্দেহ নিরসন করে লালাজী এই প্রথম হ্যাঁ তে জবাব দিল,

-"ম্যাডাম, এই গাঁয়ে বড়া মন্দির একটাই আছে, খুব প্রাচীনও। ঐ বাঁদিকের রাস্তা ধরে কিছুটা গেলে একদম গ্রামের শেষে গৌরীকুন্ডের ধারে ঝুলেলালের মন্দির। এছাড়া চকের শেষে শেরাওয়ালী মাতার ছোট মন্দির, সে এই হালে তৈরী, নবরাত্রি উৎসব হয় সেখানে। ঝুলেলালের মন্দির এগাঁয়ের সেঠ জমিদার লালজীদের প্রতিষ্ঠিত। এখানকার অধিকাংশ জমিজমা আগে ওদেরই ছিল, এখন আর নেই। অনেক শরিক, ভাগাভাগি হয়ে সব বেচেটেচে দিয়েছে অনেককাল। এখন শুধু ঝুলেলালের মন্দির পেরিয়ে কিছুটা গেলে একটা ফার্মহাউস আছে ঐ লালজীদের বড় তরফের। ওদের সব ব্যবসাপত্র করে ভালো অবস্থা, দিল্লী নয়ডার দিকে কোথায় বিশাল বাড়ি, মাঝেসাঝে আসে ঐ ফার্মহাউসে, বন্ধুবান্ধব সব বড় বড় লোকেদের নিয়ে পার্টি হয়। এমনিতে খালিই পড়ে থাকে, একজন কেয়ারটেকার আর সিকিউরিটী আছে। মন্দিরের ট্রাস্টেও বোধহয় গাঁয়ের কেউ কেউ আছে, লালজীদেরও কেউ আছে।"

মন্দিরের রাস্তার নির্দেশটা আরেকবার ভালো করে বুঝে নিয়ে ওরা দোকান থেকে বেরিয়ে এল। ভার্মা এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি, কিন্তু বেরিয়ে এসেই আর সামলাতে পারলনা,

-"ম্যাডাম, হঠাৎ মন্দিরের কথা কেন? আপনি এখন ঐ মন্দিরে যাবেন নাকি?"

গাড়িতে উঠে রাই বলল,

-"কেমন যেন মনে হল ভার্মাজী, একবার মন্দিরের খোঁজ নি। এরকম একটা গাঁয়ে মন্দিরের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, যা কেউ মনে করতে পারেনি তা মন্দিরের কোনো পুরনো লোক বা পুরোহিতের স্মরণে থাকতেও পারে। একবার চেষ্টা করতে দোষ কী!"

ভার্মা কী ভাবলো, তারপর রাইকে বলল,

-"শুধু এই কারণেই আপনার মন্দিরের কথা মনে এল, না আর কিছু?"

রাই হেসে ফেলল,

-"আপনার পুলিশী বুদ্ধি ভার্মাজী, আপনাকে লুকোতে পারবনা! আসলে মনে বারে বারে রাজীর ঘটনার সঙ্গে ওর মায়ের ঘটনার একটা প্যারালেল এসে যাচ্ছে। রাজীকে হয়ত বা শান্তিবিহারের মন্দিরে শেষ দেখা গেছে,রাজীর মায়ের ক্ষেত্রেও সেরকম কিছু ছিলনাতো! জানি গিরীশ এমন কিছু বলেননি, তবু তিনি যে সব কথাই ঠিক বলছেন তা ভাবার তো কোনো কারন নেই, বরং উল্টোটাই। যা বোঝা যাচ্ছে রাজীর ঘটনা নিয়ে যত শোরগোল হচ্ছে, পুলিশী তদন্ত, সেরকমটা নির্মলার ক্ষেত্রে হয়ত হয়নি। আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেছেন, ওদের কথা থেকে মনে হল, রাজীর খুব ছোট বয়সেই গিরীশ শুভাকে বিয়ে করে। কেন? যেখানে বৌ মারা গেছে নিশ্চিত নয়, ধারণা মাত্র, সেখানে দ্বিতীয় বিয়ের জন্যে অপেক্ষার পিরিয়ডটা আপনার অনেক কম মনে হচ্ছে না? মারা গেলে, বাচ্চার জন্যে তাড়াতাড়ি বিয়ে করার যুক্তি ছিল। মিসেস থমাসের কথা অনুযায়ী, রাজীর ঠাকুমা গিরীশের সঙ্গে শুভার বিয়ে মেনে নেয়নি। শুভা অন্য জাতের, অন্য ভাষাভাষীর মেয়ে, গিরীশের থেকে কিছুটা ছোটও। এ বিয়ে প্রেমের বিয়ে। গিরীশ হয়ত বোঝাতে চাইবে যে তার অসহায় অবস্থা দেখে শুভা তার প্রতি করুণাপরবশ হয়ে তাকে বিয়ে করে বা তার প্রতি অনুরক্ত হয়। হতে পারে, গিরীশ খুবই সুপুরুষ আর শুভার সেসময় বয়স কম। কিন্তু গিরীশ তার মায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে এরকম একটা অবস্থায় তাড়াহুড়ো করে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেবে এটা খুব স্বাভাবিক নয়। যদি এমন হয় যে নির্মলা নিখোঁজ হওয়ার আগে থেকেই গিরীশ আর শুভার একটা সম্পর্ক ছিল!"

মন্দিরটা বড় রাস্তা থেকে ভেতরে, ড্রাইভার একটু ভুলপথে চলে গেছিল, একজনকে গৌরীকুন্ডের মন্দির কোথায় জিজ্ঞেস করে আবার ফিরল। রাস্তা থেকে ভেতরে কিছুটা গাছপালা ঘেরা মন্দির। একপাশে গৌরীকুন্ড, একটি মাঝারি সাইজের পুকুর, বাঁধানো ঘাট। মন্দিরের সামনে কিছুটা খালি জায়গা, সেখানে গাড়ি দাঁড় করালো। মন্দিরের গেটের দিকে যেতে যেতে ভার্মা আগের কথা প্রসঙ্গে বলে,

-"মানলাম, রাজীর মায়ের ব্যাপারটায় কিছু গন্ডগোল আছে, কিন্তু তার মেয়ের খুনের সঙ্গে সম্বন্ধটা আমি বুঝতে পারছিনা। ধরুন কেউ রাজীকে তার মায়ের মত করে গায়েব করেছে বা হত্যা করেছে, কেন? যদি রাজীর মায়ের মৃত্যু বা নিখোঁজ হওয়ার জন্য যে দায়ী সেই রাজীকেও মেরেছে সে একই রাস্তা ফলো করবে কেন, এটা করে তো তার পুরনো পাপের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে?"

মূল মন্দিরটি রাধাকৃষেঞ্চর, কয়েকটা সিঁড়ি উঠে গোল আকারের দালান ঘেরা। একপাশে আরও কয়েকটা ছোট ছোট খুপরি মন্দির, শিবের, হনুমানজীর, রামসীতা। মন্দিরের দরজা খোলা, সামনে কম্বল আসনের ওপরএকজন প্রৌঢ় বসেছিলেন, হলুদ ধুতি আর সাদা ফতুয়া পরে, সামনে রাখা দানপেটী। রাই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভার্মার প্রশ্নের উত্তরে বলে,

-"কিন্তু একটা কথা ভুলছেন আপনি, মিসেস থমাসের মত কেউ যে জানত নির্মলার ব্যাপারটা সেটা সে হয়ত ধারণা করেনি, তাই ভয়টা ছিলনা। অবশ্য হয়ত গিরীশের দেশে আরও কেউ জানতে পারে, আবার নাও জানতে পারে। গিরীশের মা মিসেস থমাসের মত মহিলার সংস্পর্শে এসে তাকে সব কথা বলে হালকা হতে চেয়েছেন, হতে পারে তা এইজন্যে যে ছেলের চাপে বা ছেলে ও নাতনীর স্নেহে তিনি এসব কথা সেভাবে কারো সাথে আলোচনা করতে পারেননি কোনোদিন। তার আত্মীয়রা নির্মলা রাজীর মা এটা জানলেও সে কী অবস্থায় মারা যায় বা এই দুরদেশে তার কী হয় সেসব ঠিকমত নাও জানতে পারে। নির্মলার বাপের বাড়িতে যারা ব্যাপারটা জানত কিছুটা তারা তো কেউ নেই বা বিদেশে আছে শুনলেন।"

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিই দেখা গেল বর্তমান পুরোহিত। ভার্মা নিজের পরিচয় দিতে উনি উঠে দাঁড়ালেন, একটু বিস্ময় চোখেমুখে। ভার্মা গুছিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে জানাল তাদের আসার উদ্দেশ্য। এরা অবাক হয়ে শুনল পুরোহিত বলছেন,

-"হ্যাঁ, আমার মনে আছে ঐ ঘটনা। তখন আমার বাবা এখানের পুরোহিত ছিলেন, আমি তার সহায়ক। ঐ মহিলা মাঝে মাঝে মন্দিরে আসতেন বাজার ঘুরে, কখনও একা কখনো বা সঙ্গে বাচ্চা ও মাতাজী থাকত, তবে ওনার স্বামীকে কোনোদিন

আসতে দেখেছি বলে মনে পড়েনা। এই মন্দিরে রোজ অত ভীড় হয়না, পালে পার্বণে ছাড়া। সন্ধ্যেয় আরতির পরে মন্দিরের দরজা খোলাই থাকত। পেছনেই আমাদের ঘর, বাবা আমাকে নিয়ে থাকতেন। গুটিকয়েক অনাথ ছেলেও থাকত তখন, মন্দিরের খরচা থেকেই তাদের থাকা খাওয়ার খরচ বহন করা হত, বাবা তাদের পড়াতেন, গুরুকুলের মত।

তা সেদিন সন্ধ্যেয় আরতির পরে আমরা ঘরে ছিলাম, বাবা ছেলেদের পড়াচ্ছিল, আমি একটি ছেলেকে নিয়ে রান্নার দিকটা দেখছিলাম। মন্দিরে ঐ ছেলেদের মধ্যে থেকেই একজন পালা করে বসত, দানবাক্স ইত্যাদির খেয়াল রাখত, কেউ এলে ফুল প্রসাদ দিত। সেদিন যে ছেলেটি ছিল সে ঐ মহিলার নিখোঁজ হবার কথা শুনে বলে যে মহিলা সেদিন মন্দিরে এসেছিল। কিছুক্ষণ থেকে তারপরে চলে যায়। অন্ধকারে ভালো দেখেনি তবে তার মনে হয়েছিল গেটে একজন ভদ্রলোক স্কুটার নিয়ে এসেছিল, সেই স্কুটারে চেপেই মহিলা চলে যায়। পরে ছেলেটিকে পুলিশে নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে, সেখানে কী হয় সে বলেনি তবে পুলিশ বলে ছেলেটি সব বানিয়ে বলছে, ও ঐদিন মহিলাকে আসলে দেখেনি, আগে কোনোদিন দেখেছে। পুলিশ স্টেশন থেকে ফিরে এসে ছেলেটিও তাই বলে যে আসলে ওটা অন্যদিনের কথা, তার ভুল হয়েছিল। এরপরে আমরা আর ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাই নি।"

রাইই প্রশ্ন করে,

-"পুলিশ এব্যাপারে আপনাদের কাছে আসেনি?"

-"না, একেবারেই না। ঐ ছেলেটির কথা বোধহয় কারো কাছে শুনে থাকবে, গ্রামে কথা খুব তাড়াতাড়ি রটে। সেই শুনে দিন দুয়েক পরে এসে শুধু ছেলেটিকে নিয়ে যায়, বাবার সঙ্গে কোনো কথাও বলেনা। বাবা খুব রেগে গিয়েছিলেন, বড় লালজী সাহেব পরে হোলির উৎসবে এলে তাকে জানিয়েও ছিলেন। তবে পুলিশ আর কোনো ঝামেলা করেনি বলে সবাই চেপে যেতে বলেছিল।"

-"আচ্ছা, সেই ছেলেটি তো এখন বড়, সে এখন কোথায় আছে?"

-"আমি ঠিক জানিনা। তার পরে নানা ঝামেলায় ঐ অনাথ ছেলেদের আশ্রয় দেবার ব্যাপারটা উঠে গেছিল, মন্দিরের আয়ও তেমন না, লালজীদের সাহায্যও কমে এসেছিল। ঐসব ছেলেরা বড় হয়ে এদিক ওদিক চলে গেছে কাজকম্ম নিয়ে, তবে মোটামুটি সবাই করে খাচ্ছে, বাবাই চেনাজানা লোকেদের ধরে কাজ জুটিয়ে দিয়েছে ওদের। এদিকে আর কেউ বড় একটা আসেনা বাবা মারা যাবার পর থেকে। আমিও ঠিক জানিনা অজয় মানে ঐ ছেলেটি এখন কোথায়। তবে মাঝেসাঝে ওর সঙ্গীসাথীরা কেউ আসে পুরনো জায়গা দেখতে, সেরকম কেউ এলে খোঁজ করব, হয়ত ওদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ আছে।"

রাই আর ভার্মা দুজনেই একটু অবাক হল, ইনি তো বেশ ভালো লোক, এতদিনকার কথা পরিস্কার জানালেন, তারপরে আবার সাহায্য করতে এত উদগ্রীব। ভার্মা না বলে পারেনা,

-"আপনার তো বেশ সব কথা মনে আছে, পন্ডিতজী। আমরা এখানে সবাইকে জিজ্ঞেস করে করে শেষে হাল ছেড়ে দিচ্ছিলাম।"

-"আরে, এই নিয়ে দুদিন আগেই একজন খোঁজ নিয়ে গেল যে। তখন তো বসে বসে সব মনে করলাম, আপনারা জিজ্ঞেস করতে তাই এত সহজে বলতে পারলাম।"

রাই আর ভার্মা দুজনে পরস্পর চাওয়াচাওয়ি করে। এই ব্যাপার নিয়ে খোঁজ নিয়ে গেল, দুদিন আগে!

-"কে এসেছিল খোঁজ নিতে, পুলিশের লোক?"

-" না মনে হয়। অবশ্য আমি জিজ্ঞেস করিনি। দাঁড়ান, উনি একটা ঠিকানা লিখে দিয়ে গেছিলেন, ঐ ছেলেটির খবর পেলে জানাতে।"

এরা নির্বাক উত্তেজনায় বসে রইল, পন্ডিতজী মন্দিরের পিছনে ঘরের দিকে গেলেন ঠিকানা আনতে। কিছুক্ষণ পরে একটা কাগজ এনে দিল, দামী হোটেলের লেটারহেড, লীলা হোটেলের ফোন নাম্বার আর রুম নাম্বার লেখা, সুজিত মুকুন্দন।

-"এই লোকটির কোনো বর্ণনা দিতে পারেন পন্ডিতজী,কিরকম দেখতে ইত্যাদি?"

ভার্মার কথায় পন্ডিতজী একটু ভাবল,

-"দেখতে মানে ভালোই, জওয়ান আদমী, লম্বা, দোহারা, বয়স ত্রিশ বত্রিশ হবে। মনে হয় বাইরের মুলুকের লোক, হিন্দি সেরকম বলতে পারেনা,ইংরেজীই বলছিল, তবে দেশী। জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন এসব কথা জানতে চাইছে এতদিন পরে, তা বলল ঐ মহিলা ওর আত্মীয়া ছিলেন, এদেশে এই প্রথম এসেছে, একবার জায়গাটা দেখে গেল।"

-"কোথা থেকে এসেছে জানতে চান নি?"

-"না সাহেব, মন্দিরে আরো লোকজন আসছিল, কাজের ব্যস্ততার ফাঁকে কথাবার্তা হচ্ছিল, শেষের দিকে একটু বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাই ঠিকানা দিয়ে চলে গেলেন উনি।"

ভার্মা আর কথা না বাড়িয়ে নম্বরগুলো নিয়ে নিল আর নিজের ও থানার ফোন নাম্বার দিয়ে বলল অজয় মানে সেই অনাথ ছেলেটির ঠিকানা জানতে পারলে শুধু তাকেই জানাতে। ওরা মন্দির থেকে বেরিয়ে এল,পন্ডিতজীও ওদের সঙ্গে গেট অবধি এগিয়ে দিতে এল। এরা গাড়িতে উঠলে যখন ড্রাইভার যেদিক দিয়ে এসেছে সেইদিকে গাড়ি ঘোরাতে যাবে তখন ওনার খেয়াল হল,

-"আরে আপনারা তো দিল্লি ফিরবেন?"

-"হ্যাঁ।"

উনি উল্টোদিকে গৌরীকুন্ডের পাশের একটা সরু রাস্তা দেখিয়ে বললেন

-"তাহলে আর গ্রামের ভেতরে যাচ্ছেন কেন? ওদিকে রাস্তা খারাপ, ভিড়ও বেশী হয়। এই রাস্তা দিয়ে গেলে ফার্মহাউসের কাছে গিয়ে বাইপাস পাবেন। বাইপাস ধরে কিছুদুর গেলে দিল্লি আসবে, ফাঁকা রাস্তা, তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবেন।"

ভার্মা পুরোহিতকে ধন্যবাদ জানিয়ে ড্রাইভারকে ওনার দেখানো রাস্তায় চলতে নির্দেশ দিল। মাঝদুপুর প্রায়, পেটে কিছু পড়েনি সেই সকালের ব্রেকফাস্টের পর, উত্তেজনায় খিদে তেষ্টা ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু এখন গাড়িতে বসে রাইয়ের প্রচণ্ড খিদে পেল। ভার্মা নিজের নোটবুকে লীলা হোটেলের নাম্বার আর নামটা দেখছিল,

-"ম্যাডাম, চলুন না একবার হোটেল ঘুরে যাই। আপনি সঙ্গে থাকলে ভালই হয়, ঐ মন্দিরের ব্যাপারটা আপনি না বললে তো মাথায়ও আসতনা।"

রাইয়েরও সেরকম ইচ্ছে, সে একটু হেসে বলল,

-"তা না হয় যাব, কিন্তু পেটে কিছু না পড়লে আর যে দাঁড়াতে পারব না ভার্মাজী। রাস্তায় কোথাও মোটামুটি পরিস্কার একটা ধাবাটাবা দেখলে একটু দাঁড় করাবেন, খেতে হবে।"

ভার্মা লজ্জা পেয়ে নিজেকেই ছি ছি করতে লাগল, ম্যাডামকে চা পর্যন্ত খাওয়ানো হয়নি কোথাও। তাদের তো এরকম হয়ই, কিন্তু ম্যাডামের অভ্যেস নেই, তার খেয়াল করা উচিৎ ছিল। সে ড্রাইভারকে বলে দিল, খাবার জায়গা দেখলেই গাড়ী থামাতে।

প্রায় কিলোমিটার খানেক চলার পরে একটা গেট এল, উঁচু পাঁচিলঘেরা জায়গা, বাইরে থেকে বাড়ি দেখা যায়না, গেটে সিকিউরিটীর কুঠরি এখন বন্ধ। রাই দেখে বুঝল এটাই মন্দিরের মালিক লালজীদের ফার্মহাউস। ঐ পাঁচিলের গা দিয়ে গিয়ে

গাড়িটা একটা বড় রাস্তায় উঠল, দু চারটে গাড়ি সে পথে চলাচল করছে দেখা গেল। কিছুদুর গিয়ে একটা ছোট ধাবা মতন দেখে ড্রাইভার গাড়ি থামাল। বেশী কিছু পাওয়া গেলনা,গরম পুরী, সবজি আর চা। খিদের সময় তাই অমৃত মনে হচ্ছিল, পেটভরে খেল তিনজনে। খাওয়াদাওয়া সেরে গাড়ি যখন আবার চলতে শুরু করল রাই রোদচশমার আড়ালে চোখ বুজেছে, ভার্মাও চুপচাপ। আগেই আলোককে ফোন করে দিয়েছিল, তার ফেরার ঠিক নেই, আলোক যেন তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বাড়ি ফেরে।

ঝিমোনোর ফাঁকে সারাদিনের ঘটনা আবার ফিরে ফিরে দেখছিল রাই। এই মুকুন্দনই কি রাজীর মামার ছেলে, যে গাল্ফে থাকে! সে কবে এসেছে এখানে, কেন? পুলিশ রাজীর মায়ের ব্যাপারে যা মনে হচ্ছে সেরকম ভালো করে তদন্ত করেনি। কেন? মন্দিরের ছেলেটি কি সত্যিই দেখেছিল নির্মলাকে ঐদিন সন্ধ্যেয় স্কুটারে যেতে, মানে গিরীশের স্কুটারে! ঠিক যেমন করে সোনি বলছে রাজীকে দেখেছে অর্কর গাড়িতে যেতে, অন্ধকারে!

এতকিছুর মধ্যেও সব ছাপিয়ে বারবার নেকরামের জ্বলন্ত দৃষ্টিটা মনে ভেসে আসছিল। কী মনে হতেই ধড়পড় করে উঠে পড়ল রাই,

-"ভার্মাজী।"

ভার্মারও বোধহয় ঝিমুনি এসে গিয়েছিল, আচমকা ডাক শুনে চটকা ভেঙে "কী কী" করে উঠল।

-"ভার্মাজী, নেকরামকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়না? আমার কেমন মনে হচ্ছে ওর সঙ্গে একবার ভালো করে কথা বলা দরকার। ও শুভার বাবার আমলের লোক, শুভা গিরীশের সম্পর্কের সত্যটা ও নিশ্চয় জানবে,পুরনো কথা। পুলিশকে গ্রাহ্য করেনা, এটা আমার খুব অস্বাভাবিক লাগল। হয় ও একজন পোড় খাওয়া অপরাধী নয়তো বা পুলিশে কখনো কাজটাজ করেছে, যাই হোক, ওর অতীতটা জানতে পারলে ভালো হত। "

ভার্মা অতটা উৎসাহী হতে পারেনা, একটু দ্বিধায় বলে,

-"হতে পারে, ওকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করাই যায়, কিন্তু তাতে আমাদের কেসের কী সুবিধে হবে জানিনা। ওকে রাজপাল জিজ্ঞাসাবাদ করেছে আগে, মিসেস ব্যানার্জী ঐদিন বা ওর আগেও অনেকদিন ওবাড়ী যায়নি। সাধারনত উনি ওবাড়ি কমই যেতেন।"

রাই বুঝল ভার্মা রাজীর মায়ের সাতাশ বছর আগের নিখোঁজ হওয়ার কেসের চেয়ে বর্তমানে মেয়ের খুনের কেস নিয়ে বেশী চিন্তিত। সেটাই স্বাভাবিক, সেও রাজীর খুনেরই কিনারা করতে চায়, অর্কর ওপর যেন মিথ্যে দোষ না চাপে তা নিশ্চিত করতে চায়, তবু কেমন যেন দুটো কেসের এই মিল তাকে ভাবাচ্ছে, কেমন যেন কিছু একটা সম্পর্ক আছে এই দুই ঘটনার মধ্যে। একজন মহিলা সব ছেড়েছুড়ে অচেনা দেশে এসেছিল স্বামীর হাত ধরে, ছোট্ট বাচ্চা, কত স্বপ্ন এরকম সময় থাকে মেয়েদের, ভবিষ্যতের কত রঙীন কল্পনা। সব কিভাবে কেমন করে ওলোটপালোট হয়ে গেল, কেউ জানেনা! কী তার পরিণতি হয়েছিল সেটা পর্যন্ত তার নিকটজনেরা কেউ জানতে পারেনি বা জানতে চেষ্টা করেনি। রাজীর সাথে সাথে নির্মলার জন্যেও সহানুভূতিতে মন আপ্লুত হয়ে উঠছে রাইয়ের।

কিন্তু দুটো কেসের সম্পর্ক শুধু তারই মনে, কোনো প্রমাণ নেই, সূত্র নেই, কী করে বোঝাবে সে ভার্মাকে বা অন্যদের! তবু সে আবারও অনুরোধ করল ভার্মাকে, কালই যেন নেকরামকে থানায় এনে কথা বলা হয় এবং তার সম্বন্ধে সব খবর নেওয়া হয়। ভার্মার অবশ্য রাই ম্যাডামের ওপর প্রভূত আস্থা, তাই নিজে ঠিক জরুরী মনে না করলেও রাইয়ের কথামত নেকরামকে থানায় এনে কালই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে কথা দিল।

দুপুরের দিকে রাস্তা খালি, বেশ তাড়াতাড়িই ওরা লীলা হোটেলে পৌঁছে গেল। রিসেপশনে প্রথমটায় ভার্মা নিজের পুলিশী পরিচয় দেয়নি। খোঁজ নিয়ে ওরা জানল সুজিত মুকুন্দন রুমেই আছে। রিসেপশনের মহিলা যখন রুমে ফোন করতে যাবে তখন ভার্মা নিজের আই কার্ড দেখাল রুমে ফোন করতে বারণ করে। এটুকু তৈরী হওয়ার সময়ও দিতে চায়না মিঃ মুকুন্দনকে। রিসেপশনিস্টের চোখে হালকা ভয় পুলিশের নামে, রাই মেয়েটিকে একপাশে নিয়ে গিয়ে বোঝালো, মিঃ মুকুন্দনের এক আত্মীয় অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে, ওরা সেই খবর দিতে এসেছে, অন্য কোনো ব্যাপার নেই, এনিয়ে মেয়েটিকে কোনো আলোচনা করতেও বারণ করল। সে কতটা ওদের বিশ্বাস করল বোঝা গেলনা তবে এনিয়ে আর কোনো কথা বাড়ালোনা।

লিফটে সাততলায় উঠে নম্বর মিলিয়ে একদম কোণের ঘরের দরজায় ভার্মা নক করল, রাই একটু তফাতে দাঁড়িয়ে। দরজা খুলল বছর তিরিশের একটি যুবক, ঘুমচোখে হালকা বিরক্তি। ভার্মাকে হোটেলের স্টাফ ভেবেছিল বোধহয়, বেশ রেগে কিছু একটা বলতে গিয়ে তার চোখ পড়ল রাইয়ের দিকে। রাগটাকে গিলে নিয়ে বলল,

-"ইয়েস?"

-"মিঃ মুকুন্দন? আমি পুলিশের পক্ষ থেকে আসছি। আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।"

পুলিশের নাম শুনে লোকটির ঘুম উধাও। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ চোখে নিয়ে ওদের ভেতরে আসতে বলল। নির্ঘাত রাইকে দেখে পুলিশের লোক বলে মনে হচ্ছিলনা, সন্দেহ সেই কারণেই। ভার্মা সেটা বুঝতে পেরে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে নিজের কার্ড বার করে দেখাল। বিছানার পাশে একটা সোফায় ওদের বসিয়ে নিজে বিছানায় বসল সুজিত। রাই চারদিকে তাকিয়ে দেখল, বেশ সাজানো গোছানো ঘর যেমনটা হয় দামী হোটেলে। বিছানার ওপরে ল্যাপটপ খোলা আছে, একটা ফাইল। এছাড়া সারা ঘরে অগোছালো কিছু নেই। সুজিতের পরণে জীনস আর টিশার্ট। কম্পিউটারে কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল মনে হয়। ভার্মা সরাসরি কাজের কথায় আসে, ফিরোজগাঁওয়ের মন্দিরের পুরোহিতের কথা জানিয়ে জিজ্ঞেস করে,

-"আপনি হঠাৎ এতকাল পরে নির্মলার খোঁজ করে ওখানে গেছিলেন কেন? ওর সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক।"

সুজিত মাথা নীচু করে একটু চিন্তা করে, তারপরে যেন স্থির করে ফেলেছে এমন একটা ভঙ্গীতে মাথা তুলে সরাসরি ওদের দিকে তাকিয়ে বলে,

-"উনি আমার বাবার বোন, আমার পিসী ছিলেন।"

-"তাহলে রাজেশ্বরী আপনার পিসীর মেয়ে। আপনার সঙ্গে ওর যোগাযোগ ছিল? আপনি রাজেশ্বরীর মৃত্যুর খবর পেয়েছেন? কবে এসেছেন এ দেশে?" রাই একদৃষ্টিতে সুজিতের দিকে তাকিয়ে ছিল, রাজেশ্বরীর মৃত্যুর কথায় ওর প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করছিল। ঘনিষ্ঠতা কিরকম কে জানে, তবে কোনো বিষাদের ছায়া নজরে পড়লনা, একটু দ্বিধা, একটু দোটানার মত, কী বলবে না বলবে!

-"হ্যাঁ, কিছুদিন আগে ওর ঠাকুমার মৃত্যুর পর ও আমাদের কথা জানতে পেরে আমার বাবার সাথে যোগাযোগ করে। তারপর থেকে মাঝেমাঝে আমার সাথে নেটে কথাবার্তা হত, বাবাও দু একবার ওকে মোবাইলে ফোন করেছে। তবে ওর মৃত্যুর খবর আমরা পাইনি, কারণ ওর মা বাবা কেউ জানতনা আমাদের সাথে ওর যোগাযোগের কথা, ওর স্বামীও না। আমি চারদিন হলো এদেশে এসেছি অফিসের কাজে। আসার আগে খুব ব্যস্ত থাকায় ওকে ফোন বা মেল করিনি। এসে ফোন করছিলাম কিন্তু নাম্বার মজুদ নেই বলছিল। পরদিন সকালে পেপারে খবরটা দেখি, খুব ছোট্ট খবর কিন্তু ছবি আর নাম দেখে চিনতে ভুল হয়না। খবরটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে আমি বাবাকে জানাই। বাবা শুনে অবধি খুবই শকড। ওর স্বামীর ফোন নাম্বার বা ঠিকানা জানা নেই তাই ইচ্ছে থাকলেও তার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। আমার বাবা চায়না রাজেশ্বরীর বাবার সঙ্গে আমাদের কোনোরকম যোগাযোগ হোক , তাই কেউই জানেনা আমার আসার কথা।"

ভার্মা প্রমাণ হিসেবে সুজিতের পাসপোর্ট দেখতে চাইল। সুজিত পাসপোর্ট আর টিকিটের প্রিন্ট আউট দুইই দেখাল, তার এদেশে আসার দিন নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কথার মাঝে মোবাইল বেজে উঠল ভার্মার, স্ক্রিনে নাম্বার দেখে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাই একা, অনেকক্ষণ থেকে তার মনে হচ্ছিল আরও একটু খোলাখুলি কথা বলে ছেলেটির সঙ্গে, পুলিশী জেরার বাইরে গিয়ে, মনে অনেক প্রশ্ন। এতখনে সুযোগ পেয়ে সে আর চুপ থাকেনা।

-"রাজেশ্বরী কিভাবে আপনাদের কথা জানতে পারে, এনিয়ে কিছু বলেছিল?"

সুজিত একটু যেন অন্যমনস্কভাবে জবাব দেয়,

-"ঠিক জানিনা, ওর ঠাকুমার মৃত্যুর কিছুদিন পরে বাবা ওর চিঠি পায়। তারপর বাবা ওকে ফোন করে। মনে হয় ওর ঠাকুমাই সব জানিয়ে ছিলেন মারা যাবার আগে। উনি আমাদের ঠিকানা জানতেন, মাঝেসাঝে চিঠিও দিতেন বাবাকে।"

-"আপনার সঙ্গে ওর প্রথম দেখা কবে হয় ?"

সুজিত একটু অবাক হয়েই এবার পুরো মনোযোগ দেয় রাইয়ের কথায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না, যেন প্রশ্নটা ভালো করে বুঝে নিচ্ছে। রাই সেটা বুঝতে পেরেই বলে,

-"আমি ঠিক পুলিশের লোক নই, রাজীর স্বামীর পারিবারিক বন্ধু, পুলিশের সঙ্গে জানাশোনা আছে, এইমাত্র। রাজীর স্কুলের বন্ধুরা বলেছে ও প্রতিদিন ওর কাজিনের সাথে চ্যাট করত। এতটা ঘনিষ্ঠতা, বন্ধুত্ব আপনাদের মধ্যে এই কদিনে, সেসবই শুধু দূর থেকে এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলবেন না।"

সুজিত এবার সোজা উত্তর দেয়,

-"হ্যাঁ, দেখা হয়েছিল। আমাদের ব্যাঙ্গালোরে একটা ফ্ল্যাট আছে, আমরা মানে মা বাবা ও আমি যখন দেশে আসি, সেখানেই উঠি। রাজীর সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার পর আমরা যখন এলাম ও তখন আমাদের সঙ্গে ব্যাঙ্গালোরে এসে দেখা করে। আর তখনই ওর সঙ্গে ভালো করে আলাপ হয়।"

-"ওকী ওর মায়ের সব কথা ডিটেলে আপনার বাবার কাছেই শোনে?"

-"হ্যাঁ, এমনকী আমি বা আমার মাও এই প্রথম সব শুনি । বাবা এনিয়ে কোনোদিন কোনো আলোচনা করেনি আমাদের সাথে। পিসী মারা গেছেন এটুকুই জানতাম, বাবা আর দাদু দিল্লী থেকে ফিরেও মাকে বা ঠাকুমাকে সব কথা বলেনি কোনোদিন। ওরা এখানে এসেছিল পিসীকে খুঁজতে কিন্তু পুলিশের সেরকম সাহায্য পায়নি। এখানে ওরা কাউকে চিনতনা, ভাষাও জানতনা। বাবা রাজীকে বলেনি কিন্তু বাবার মতে রাজীর বাবাও সেভাবে চেষ্টা করেনি নিজের স্ত্রীকে খুঁজতে। অথচ উনি সরকারী চাকরি করতেন, অফিসের সাহায্যে পুলিশের ওপর জোর খাটাতে পারতেন, কিন্তু সেসব কিছুই তিনি করেননি। দাদু শেষদিন অবধি এনিয়ে দুঃখ পেয়ে গেছেন যে মেয়ে মারা গেছে কিনা তাও তিনি নিশ্চিত জানেননা, তাই তার কোনো ক্রিয়াকর্মও করা হয়নি। আমার দাদু আর ঠাকুমা রাজীকে নিজেদের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, রাজীর বাবা আর ঠাকুমা দেয়নি। বাবা এর কিছুদিন পরে চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যায়। এর অল্পদিন পরেই দাদু মারা যান, এরপর কেরালার সব বিক্রি করে আমরা ঠাকুমাকে নিয়ে পাকাপাকিভাবে গাল্ফে চলে যাই। এদেশে আমার মামা থাকে ব্যাঙ্গালোরে, পরে তার কথায় বাবা ওখানে একটা ফ্ল্যাট কিনে রাখে। ঠাকুমাকে নিয়ে মা আসত প্রতিবছর দাদুর শ্রাদ্ধ করতে, তখন ওখানেই ওঠা হত। বছর পাঁচেক আগে ঠাকুমা মারা গেলে আমাদের এখানে আসা অনিয়মিত হয়ে পড়ে।"

-"রাজীর পক্ষে তো সমস্ত ব্যাপারটা খুব আকস্মিক, ওর প্রতিক্রিয়া কীরকম ছিল আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে বা মায়ের কথা জেনে?"

-"পুরোটা বলতে পারবনা। কারণ ও সমস্ত ব্যাপারটা জানার বেশ কিছুদিন পরে আমাদের সঙ্গে ওর দেখা হয়। তবে আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে ও খুব খুশী হয়েছিল, মনে হচ্ছিল যেন অনেকদিনের চেনা। কয়েকদিন ছিল আমাদের সাথে,খুব ভালো একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে মাবাবার সঙ্গে, মেয়ের মত। আমার সাথেও খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায়। তারপর থেকে আমরা রেগুলার যোগাযোগ রাখতাম।"

-"রাজী সব জেনেশুনেও কিন্তু ওর বাবার সঙ্গে এনিয়ে কথা বলেনি বা স্বামীকেও কিছু জানায়নি। আপনি প্রথম দিল্লী এসেই ফিরোজগাঁও ছুটেছেন, অথচ রাজী কোনোদিন ঐ মন্দিরে যায়নি মায়ের খোঁজ করতে, গেলে ঐ পুরোহিতের মনে থাকত। কেন বলতে পারেন? আপনারা তো বন্ধু ছিলেন। কখনো কথা হয়নি এ বিষয়ে?"

সুজিত কিছু বলতে যাবে সেইসময় ভার্মা ফোন করা শেষ করে ঘরে ঢুকল। রাই প্রশ্নটা আবার করল, ভার্মাও সুজিতের উত্তরের অপেক্ষায়।

-"না, হয়নি। আমাদের মধ্যে সাধারণ বন্ধুর মতই কথা হত, এনিয়ে কখনো তেমন আলোচনা হয়নি। রাজীর মা মানে আমার পিসীর কোনো স্মৃতিই রাজীর মনে ছিলনা, আমিও তখন খুব ছোটো ছিলাম, আমার ওনাকে মনে নেই।"

রাই কী মনে পড়ায় বলে,

-"ওর সম্বন্ধে নানা কথা শুনে যা মনে হয় রাজী খুব চাপা মেয়ে ছিল। এতকিছু ও কাউকে বলেনি, বাবামাকে নয়, স্বামীকেও নয়। আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগের কথাও। ওর মনে কী ছিল সেটা আন্দাজ করা বেশ কঠিন মনে হচ্ছে। আচ্ছা আপনি ফিরোজগাঁও গিয়ে আর কোথাও না গিয়ে ঐ মন্দিরে গেলেন কেন? ঐ ছেলেটির আপনার পিসীকে সেইরাতে দেখার কথা নিয়েই বা খোঁজখবর করার কথা মনে হল কেন?"

সুজিত একটু থতমত খেল, এমনিতে বুদ্ধিমানই মনে হয়, এতক্ষনে ভার্মার পুলিশী জিজ্ঞাসায় সে সড়গড় হয়ে এসেছে। কিন্তু এই মহিলা আবার কোথা থেকে কী সব প্রশ্ন তুলছে, মুখখানায় যেন সেরকমই ভাব! ভার্মা চুপ করে সাগ্রহে রাইয়ের প্রশ্ন শুনছে, মুখে তারিফযুক্ত প্রশ্রয়।

-"আসলে বাবার কাছে পিসীর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটা বিশদভাবে আমি হালেই শুনি, রাজীর সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়। শুনে অবধি আমার খুব অবাক লেগেছিল। একজন মহিলা এভাবে উধাও হয়ে গেল কোথাও কোনো সূত্র না রেখে। মাঝে মাঝেই বাবার সঙ্গে আজকাল আলোচনা হয় এ নিয়ে। ছুটি ছিল ঐদিন, এখানে কাউকে চিনিনা, কোনো কাজ নেই, তাই ভাবলাম একবার ফিরোজগাঁও জায়গাটা দেখে আসি। ঐ জায়গার ঐ ঘটনা বলতে গেলে আমাদের পরিবারে অনেক কিছু বদলে দিয়েছে। মন্দিরের বাচ্চা ছেলেটি প্রথমে পিসীকে সেদিন দেখেছিল একথা বাবা আর দাদু রাজীর ঠাকুমার কাছে শোনে। পরে ওরা যখন গিয়ে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করে সে তখন সেকথা অস্বীকার করে। বাবা আর দাদু যাওয়ার আগে নাকি ছেলেটিকে পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদ করতে। তারপর থেকেই ছেলেটির বয়ান বদলে যায়। এই ব্যাপারটা আমার খুব অদ্ভুত লাগে। ছেলেটি এখন একজন পূর্ণবয়স্ক, এখন হয়ত সে বললেও বলতে পারে সেদিন সত্যি সে কী দেখেছিল, তাই মন্দিরে গিয়ে ওর খোঁজ করি।"

-"আপনি বা আপনারা কী সত্যি চান নির্মলার কী হয়েছিল তা জানতে? তাহলে এতদিন আপনার বাবা সে চেষ্টা করেননি কেন? উনি বিদেশী, এন আর আই, এখানে দিল্লীতে এলে সরকারের ঘরে সেই পরিচয়ে খাতির কম হতনা, চাইলে ঐ কেসের খাতা আবার খোলাতে পারতেন।"

সুজিত একটু তেজের সাথে বলে,

-"আমার বাবা আমার ফিরোজগাঁও যাবার কথা কিছু জানেন না। আমি তো বললাম রাজী যদি না আমাদের সাথে যোগাযোগ করত বাবা আমাদেরও কিছু বলতেন না। ওনার বোন তো আর ফিরে আসবেনা, উনি তাই হয়ত এনিয়ে আর কিছু করতে চাননি কোনোদিন, ভুলে ছিলেন সবকিছু। আমার জানার ইচ্ছে হয়েছিল, স্রিফ কৌতূহল, জেনে কী করব, কেসের খাতা খোলাব কিনা, এসব নিয়ে ভাবিনি।"

রাই আর কিছু বলেনা। ভার্মা বলে,

-"আপনি রাজেশ্বরীর ব্যাপারে আমাদের কিছু বলতে পারেন? ওনার কোনো সমস্যা চলছিল, কিছু বলেছিলেন আপনাকে?"

সুজিত আবার সহজ, এ যেন জানা প্রশ্ন,

-"না, আমি সেরকম কিছু জানিনা। আমি তো বুঝতেই পারছিনা এসব কী করে হল।"

আবার রাই জিজ্ঞেস করে, সুজিতের চোখে সোজাসুজি তাকিয়ে,

-"রাজীও সেই একইভাবে বাজার থেকে নিখোঁজ হয়, সেই একইভাবে একটি মন্দিরের অনাথ মেয়ে রাজীকে শেষ দেখে বলে মনে করে। আপনি তো নির্মলার ঘটনা বাবার কাছ থেকে শুনে তা নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা করেছেন। রাজীর ব্যাপারে আপনার কিছু মনে হয়, কী হতে পারে?"

-"কিন্তু কাগজে দেখলাম রাজীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। দুটো কেস তো তাহলে আর এক থাকেনা।"

সুজিত সত্যিই বুদ্ধিমান। রাই ভার্মার দিকে তাকালো, তার এখন আর কিছু জানার নেই।

ভার্মা উঠতে উঠতে বলল,

-"আপনার অফিসের কাজ আর কতদিন মিঃ মুকুন্দন?"

-"ঠিক বলা যাবেনা, দিন দশেক লাগার কথা। বেশী সময়ও লাগতে পারে, আবার দুদিন আগেও হয়ে যেতে পারে।"

-"কাজ হয়ে গেলে যাবার আগে আমাদের জানিয়ে যাবেন। আপনার সঙ্গে আরও দরকার হতে পারে। কিছু মনে হলে বা কিছু জানতে পারলে সেটাও আমাকে জানাবেন। আমার কার্ডে মোবাইল নাম্বার আছে।"

কী ভেবে ভার্মা শেষকালে রাইকে অনুরোধ করল রাইয়ের ফোন নাম্বারও সুজিতকে দিয়ে রাখতে। তাকে ফোনে না পেলে সুজিত যেন রাইকে ফোন করে। রাই আপত্তি করল না, ভার্মা সুজিতকে এখন পুলিশের হিসেবের বাইরে রাখতে চাইছে তাই থানার বা ওর অফিসের কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে না বলে রাইয়ের নাম্বার দিচ্ছে।

গাড়িতে যেতে যেতে ভার্মা বলে,

-"ম্যাডাম, তখন ফোনটা কেরালা থেকে এসেছিল, ওখানকার থানার অফিসারের।" গাড়িতে যেতে যেতে ভার্মা বলে।

রাই উৎসুক,

-"কী বলল? উকিলের সঙ্গে কথা হয়েছে?"

-"হ্যাঁ হয়েছে। ওদের শহরে রাজেশ্বরীর ঠাকুমার ও ঐ পরিবারের যে উকিল তার সঙ্গে কথা হয়েছে। যেটা ইন্টারেস্টিং তা হল ওখানের সম্পত্তি সব রাজেশ্বরীর ঠাকুমার নামে, তিনি তার বাবার একমাত্র সন্তান ছিলেন। সে সম্পত্তি এমনিতে খুব বেশী নয়, তবে জমির দাম যেহেতু ওদিকে অনেক তাই তার মূল্য ধরলে ভালই। এদিকে গিরীশ আবার একমাত্র ছেলে তাই সবাই জানত যে সমস্ত সম্পত্তি পরে তারই হবে। ওদের ছোট পুরনো বাড়ির পাশে গিরীশ রিটায়ারমেন্টের পরে বেশ বড় এক বাড়ি

তৈরী করে অনেকটা জায়গা নিয়ে। শুভা সেখানে একটা ছোটদের নাচের স্কুলও খুলেছে। এদিকে কনকাম্মা মারা যাবার কিছুদিন পরে কোচিনের এক পুরনো ল ফার্ম থেকে রাজেশ্বরীকে ডেকে পাঠায়। তখন জানা যায় যে ঠাকুমা বেশীরভাগ সম্পত্তি উইল করে তার নাতনীকে দিয়ে গেছে, গিরীশকে শুধু পুরনো বাড়িটা দিয়েছে। এছাড়া রাজেশ্বরীর মায়ের বিয়েতে যৌতুক হিসেবে যেসব সম্পত্তি পেয়েছিল সেসবও রাজেশ্বরীর নামে তার দাদুর দানপত্র অনুযায়ী। জানাজানি হলে যদি গিরীশ শুভা বা আত্মীয়স্বজনরা কোনো চাপ দেয় তাই হয়ত ওর ঠাকুমা নিজের পরিচিত উকিলের কাছে উইল বা দানপত্র যাই হোক সেসব না করে নামী দামী ফার্মে পাকা উকিল দিয়ে বন্দোবস্ত করেছিল। এখন দাঁড়াচ্ছে যে গিরীশ নিজের পয়সা খরচ করে যে বাড়ি করেছে সে জায়গাটাও তার নামে নয়, রাজেশ্বরীর নামে!

আজ সকালে গিরীশ আর শুভা একথা আমাদের কাছ থেকে লুকোলো কেন! ওদের সম্পত্তি হলেও সেতো একদিন ওদের মেয়েরই হত। কথা হচ্ছে আইনে কী বলে, রাজেশ্বরীর সম্পত্তি এখন অর্কর পাওয়া উচিৎ কিনা? তাহলে তো গিরীশদের খুবই অসুবিধে হয়ে যাবে।"

রাই একটু ভাবল,

-"তাহলে এতদিনে একটা মোটিভ পাওয়া গেল অর্কর বিরূদ্ধে। আপনি অর্কর সবদিক ভালো করে দেখেছিলেন, কোনোভাবে অন্য কোনো সম্পর্কের কোনো ইশারা?'

-"না ম্যাডাম, ওর ফোন রেকর্ড, অফিস ইত্যাদি আমরা ভালো করে চেক করেছি। কোথাও সেরকম কোনো লক্ষণ নেই। ও, আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি, রাজেশ্বরীর ইমেল অ্যাকাউন্ট আমরা চেক করতে পেরেছি। সেখানে কিছু নেই, কোনো মেলই নেই। স্কুলের ও বাড়ীর কম্পিউটার পরীক্ষা করেছে এক্সপার্টরা। ওরা বলছে হয় রাজেশ্বরী কম্পিউটার ব্যবহার করেনি নয়ত কোনো কম্পিউটার প্রোফেশ্যনাল সমস্ত রেকর্ড মুছে দিয়েছে। ওর ফোন রেকর্ডেও দেশের বাইরের থেকে কোনো ফোন নেই। অথচ সুজিত বলল তার বাবা রাজেশ্বরীকে ফোন করত, বা সে মেলে যোগাযোগ করত।"

ভার্মাকে চিন্তিত দেখাল। রাই এগুলো আগে জানতনা, তাই খেয়াল করেনি, এখন জেনে ভাবনায় পড়ল। অর্ক কম্পিউটার প্রোফেশ্যনাল নয়, তার কর্মক্ষেত্র অন্য, রাই আগেই জেনেছে। যদি সে শিখেও নেয় কারুর থেকে, স্কুলের কম্পিউটার তার ছোঁয়ার বাইরে থাকে। তাহলে, কী ছিল রাজীর ইমেলে বা কম্পিউটারে?

বাড়ি ফিরে রাই দেখল আলোক অনেক আগেই ফিরেছে আজ। মেয়ে খেলে এসে পড়ার টেবিলে। ওর খুব ক্লান্ত লাগছিল সারাদিন ঘোরাঘুরির পরে। গা ধুয়ে নিজের জন্যে কফি বানিয়ে নিয়ে বসার ঘরে এসে আরাম চেয়ারটায় বসল। আলোক ইকনমিক টাইমসে বুঁদ হয়ে আছে। কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বলল,

-"কী ব্যাপার, তোমাদের তদন্ত খুব সিরিয়াস জায়গায় পৌঁছেছে মনে হচ্ছে, সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরলে?"

রাই জানে আলোক জিজ্ঞেস করতে হয় তাই করছে, বললে ভালো করে শুনবেওনা। তবু ও কফিতে চুমুক দিতে দিতে একটু একটু করে সারাদিন কী হয়েছে না হয়েছে বলতে থাকে, যত না আলোকের জন্য তার চেয়ে বেশী নিজেকেই শোনানোর জন্য, টুকরো টুকরো ভাবনাগুলোকে সাজিয়ে কোনো ছবি পাওয়া যায় নাকি তা দেখতে।

-"আচ্ছা, ধর একসঙ্গে একবাড়িতে থেকে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে একজন যদি অন্য কারোর সঙ্গে কোনোরকম রোম্যানটিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে তাহলে অন্যজন তা একেবারে টের পাবেনা এটা সম্ভব?"

প্রশ্ন টা হয়ত নিজেকেই করছিল কিন্তু আলোকের কাগজ পড়া শেষ, তার কানে ঢুকেছিল কথা। সে হেসে বলল,

-"হঠাৎ, কী আবার হল?"

-"না ধর এই রাজী আর অর্কর ব্যাপারটা। রাজীর স্কুলের ঐ মেয়েটি বলছে রাজী এমন কিছু লিখছিল চ্যাটে যেটা লোকে বয়ফ্রেন্ডকে লিখবে, অর্থাৎ রাজী ও সুজিতের সম্পর্কটা সেই ধরণের। কিন্তু অর্কর সাথে কথা বলে একবারও মনে হয়না রাজীর কোনো বয়ফ্রেন্ড সম্পর্কে সে কিছু জানে বা এরকম কিছু হতে পারে বলে তার ধারণা আছে। আমি ওকে খুব ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেছি, মনে হয়না ও অভিনয় করছে। আজ রাজীর কাজিনকে দেখে আমার মনে হলনা রাজীর মৃত্যুতে ও খুব শোকাতুর। এমনকী খুব যে কিছু দুঃখ হয়েছে তাও মনে হলনা। যেটা ওদের মধ্যে অন্য কিছু না থাকলে খুব স্বাভাবিক, কারণ ওদের কাজিন হিসেবে চেনাজানাটা খুব অল্প দিনের, ছোটবেলার সম্পর্ক নয়, গভীরতার অভাব থাকতেই পারে।"

আলোক বেশ মন দিয়ে শুনছিল,

-"তুমি ঐ মেয়েটির কথা এত সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন? মেয়েটির বয়স কেমন আর দেখতেই বা কেমন?"

-"কেন?"

-"আরে বলই না। নাও আমি একটা আন্দাজ করছি, গোয়েন্দার বর তো, তুমি মিলছে কিনা বল। মেয়েটি দেখতে খুবই সাধারন আর বয়স পঁচিশ বা তার বেশী।"

রাই বুঝতে না পারলেও মজা পেল খেলাটায়, সারাদিনের প্রথম হালকা মুহূর্ত।

-"হতে পারে পঁচিশ বা বেশী তবে দেখলে কমই লাগে, রোগা ছোটখাটো, দেখতে খুবই সাধারণ।"

-"হতেই হবে। এদিকের লোকেদের হিসেবে ঐ মেয়ের বিয়ের বয়স হয়ে গেছে অনেককাল, নির্ঘাত বিয়ে হচ্ছে না। রাজীর মত সুন্দরী মেয়ে, হ্যান্ডসাম বর, ভালো ঘর আছে, এসব নিয়ে ওর মনে মনে হয়ত হালকা হিংসে আছে। হতে পারে সেটা ও নিজেও সেভাবে বোঝেনা। এছাড়া হয়ত ওর বাড়ী দ্যাখোগে খুব গোঁড়া ধরণের, ছেলেদের সঙ্গে সেভাবে মেশার সুযোগ হয়নি। তাই বর ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে চ্যাট করছে দেখেই কোনো নিষিদ্ধ ব্যাপার ধরে নিয়েছে। চ্যাটে ও কী এমন কথা দেখেছে, ওখানে তো লোকে অনেক শর্ট মেসেজ ফরম্যাটে লেখে!

রাজী আর সুজিতের এই রোজের আলাপচারিতা, সেটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে। রাজী সুজিতের পরিচয় বা ওর মায়ের কথা অর্ককে বা শ্বশুরবাড়ীতে জানাতে চায়নি। পুরো ব্যাপারটা তো সত্যিই বেশ রহস্যজনক, কে কীরকম ভাবে নেবে, কী কী প্রশ্ন উঠবে ওর মাবাবা সম্পর্কে। তাই ও বাড়ি থেকে সুজিতের সঙ্গে চ্যাট না করে স্কুল থেকে করত। বাবা আর সৎমার ওপরে ক্ষোভ, অর্ককে সব কথা বলতে পারছেনা, এরকম অবস্থায় মামাতো ভাই সুজিতই ওর খোলা জানালা, তার সাথেই সব কথা অনায়াসে আলোচনা করতে পারে। এরমধ্যে অন্য কোনো ব্যাপার নেই।"

রাই আলোকের বিশ্লেষণকে একেবারে পুরো পয়েন্ট না দিলেও ফেলতেও পারেনা। রীটার কথা ছাড়া সুজিত রাজীর বয়ফ্রেন্ড এ তথ্যের আর কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু রাজীকে মরতে হোলো কেন তাহলে! চোখ বন্ধ করে ভাবতে ভাবতে ঘুম ধরে গেছিল, ভাঙল ফোনের আওয়াজে। ভার্মার ফোন।

-"ম্যাডাম বিশ্রাম করছিলেন, বিরক্ত করলাম?"

-"না না ভার্মাজী, বলুন কী ব্যাপার?"

-"আপনাকে একটা কথা জানানোর ছিল।"

-"কী?"

-"ম্যাডাম, কোচিনের ঐ ল ফার্ম থেকে উকিল যিনি রাজীর ঠাকুমার উইলের সব কাগজপত্র করেছেন তিনি ফোন করেছিলেন এই মাত্র। ওরা রাজেশ্বরীর মৃত্যু সংবাদ আগে পায়নি। রাজেশ্বরী কয়েক মাস আগে একটা উইল করে। সেই উইল অনুযায়ী ওর কিছু হলে সমস্ত সম্পত্তি ওর মামার ছেলে সুজিত মুকুন্দন পাবে। অবশ্য উনি বললেন আইনি অনেক ব্যাপার আছে, অর্ক বা রাজীর বাবা এই উইল কনটেস্ট করতে পারে। তাহলেও রাজেশ্বরীর মায়ের সম্পত্তি যা সুজিতের ঠাকুর্দার দেওয়া তা হয়ত সুজিত পেয়ে যেতে পারে।"

রাই চুপ করে থাকে। সেসব যা হয় হবে কিন্তু রাজী হঠাৎ উইল করতে গেল কেন! আর উইল করে সবকিছু সুজিতকে দিল কেন?

যদি তার এও মনে হয় যে তার মায়ের সম্পত্তি সুজিতের পাওয়া উচিৎ তাহলে তার ঠাকুমার সম্পত্তিও তো তার বাবার পাওয়া উচিৎ। নাকি সে ভেবেছিল তার আগেই তার বাবা চলে যাবে। তাহলে সাত তাড়াতাড়ি উইল করল কেন!

-"ভার্মা জী, ঐ উকিল ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করবেন, উইল করার আইডিয়াটা কার মাথায় আসে, রাজীর নিজের না উকিলের পরামর্শ।

-"করেছিলাম ম্যাডাম। উনি তো বললেন রাজেশ্বরীই ওদের কাছে আসে উইল করার জন্য।"

-"রাজী তাহলে বেশ ধনী মহিলা ছিল বলা যায়। ওদের সম্পত্তির পরিমাণ কিরকম, কিছু বলেছে উকিল?"

-"হ্যাঁ ম্যাডাম। আমিও ঐকথাই জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি আমাকে মেল করবেন বল্লেন বিশদে, তবে খুব বেশী না হলেও সম্পত্তি কমও নয়। আর একটা কথা, গিরীশ ও শুভা উকিলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল গিরীশের মায়ের মৃত্যুর পর যখন উইলের ব্যাপারটা জানাজানি হল। ওরা দুজনেই প্রচন্ড হতাশ হয়েছিল। গিরীশরা বেশ খরুচে দম্পতি ছিল, পয়সাকড়ি তেমন করতে পারেনি, দরকারও মনে করেনি, মায়ের যা আছে সব তাদেরই হবে জানত। এছাড়া বাড়ি করতে গিয়ে নিজের যা ছিল প্রায় সবই খরচ করে ফেলেছিল। উকিলদের অনেক সোর্স থাকে, উনি কিভাবে জেনেছিলেন যে শুভা কেরালায় সারাবছর থাকতে চাইছিলনা, তাই ওরা দিল্লীতেও একটা ভালো ফ্ল্যাট বুক করেছে গিরীশের মা মারা যাবার কিছুদিন আগেই। এত টাকা ওদের ছিলনা, ওরা মায়ের টাকা পাবে বলেই এমন ভবিষ্যত পরিকল্পনা করেছিল। সেসব বানচাল হয়ে যাবার উপক্রম হল মায়ের উইলে। যদি বলেন ওদের মেয়েরই তো সব, সে হলেও রাজেশ্বরী তো আর একা নয়, অর্কও আছে। ওরা বাবাকে দরকারে সাহায্য করতে পারে কিন্তু বিলাসের খরচ যোগাতে যাবে কি!

গিরীশ উকিলের কাছে জানতে চেয়েছিল কিভাবে কী করলে সম্পত্তি সব আবার তার হবে। এরপরে রাজেশ্বরীর সঙ্গে এব্যাপারে ওদের কিছু মনান্তর হয়েছিল মনে হয় তাই রাজেশ্বরী বেশ তাড়াহুড়ো করে রাগের মাথায় নিজের উইল করে। যদিও উকিলকে সে কিছু বলেনি তবু উনি আন্দাজ করেছিলেন। আরও একটা কথা, রাজেশ্বরীর ঠাকুমা এই উকিলদের একটি খাম দিয়ে যান, ওর মৃত্যুর পর রাজেশ্বরীর হাতে দেওয়ার জন্য। মনে হয় ঐ খামেই সেই চিঠি ছিল যাতে কনকাম্মা নাতনীকে সব কথা জানিয়ে যায়।"

রাইও এরকমই কিছু ভেবেছিল। এনিয়ে আর কথা না বলে ভার্মাকে মনে করায়,

-"ভার্মাজী, ঐ নেকরামকে কালই থানায় আনিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করুন।"

ভার্মা এবার আর আপত্তি করল না,

-"হ্যাঁ ম্যাডাম। আজ আমরা চলে আসার পর ওরা রাজপালের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের যাওয়ার কথা জানায়। রাজপাল রেগেমেগে ওর বসের কাছে যায় আমার নামে অভিযোগ জানাতে। ভাগ্যিস ওরা রাজপালকে ঐ নির্মলার ব্যাপারটা কিছু বলেনি, ওর বসকে আমার বড়সাহেব এসব নিয়ে আগেই ফোন করেছিলেন। উনি রাজপালকে খুব কড়কে দিয়েছেন।

রাজপাল এখন আবার আমাকে খুব খাতির করে ফোন করছিল। মনে হয় কিছুদিন ও চুপচাপ থাকবে, এই সুযোগে আমি কালই কাউকে পাঠিয়ে নেকরামকে ডেকে আনছি। ও ভালো কথা, আপনার খুব অবাক লাগছিল না, নেকরাম কেন পুলিশের নাম শুনে ঘাবড়ালো না একথা ভেবে?"

-"হ্যাঁ, কেন? ও কী পুলিশে ছিল?"

-"না, সে নয়। শুভার বাবা অর্থাৎ গিরীশের শ্বশুর পুলিশ অফিসার ছিল, নেকরাম তার খাস চাকর ছিল।"

ভার্মা ফোন রেখে দেওয়ার পরে রাই উঠল খাওয়া দাওয়ার জোগাড় করতে। ছোট ছোট পাজলের টুকরো টুকরো সমাধান পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাতে রাজীর মৃত্যু রহস্যের সমাধানের দিকে কতটা এগোচ্ছে ওরা তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। শুভার বাবা পুলিশ অফিসার ছিলেন, গিরীশ কি ইচ্ছে করেই সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল? নাহলে নির্মলার কেসের ব্যাপারে শুভার দাদার নাম এল অথচ পুলিশ অফিসার বাবার কথা এলনা!

রাজীর মৃত্যুতে প্রায় সবারই প্রাপ্তি দেখা যাচ্ছে, সুজিত, হয়ত বা অর্ক ও গিরীশেরও। কিন্তু রাজী বেঁচে থাকলেও এরা তার নিকটজন, তার সবই এদের দরকার মত এরা পেয়ে যেত, মারার কী দরকার হল? না, নতুন করে ভাবতে হবে, রাজীর মৃত্যুর কোনো মোটিভই খুব পোক্ত নয়!

ভোর ভোর ঘুম ভেঙে গেল রাইয়ের, তখনও ভালো করে বাইরে আলো ফোটেনি। গতরাত্তিরে অবশ্য সারাদিনের ক্লান্তিতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিল। মুখটুখ ধুয়ে চা নিয়ে এসে বারান্দায় বসল যখন তখন সারা বাড়ি ঘুমিয়ে আছে। এমনিতে এখন অনেক ফ্রেশ লাগছে, ভাবনাগুলোও অনেক স্বচ্ছ, কিন্তু তবু তার মাথা জুড়ে আছে রাজেশ্বরী ও নির্মলা। দুই মা মেয়ের কারোকে একা ফেলে শুধু অন্যকে নিয়ে ভাবতে পারছেনা।

মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে রাই কাগজ নিয়ে বসল চানে না ঢুকে, আলোক তাই দেখে জানতে চাইল,

-"কী ব্যাপার, তুমি আজও অফিস যাবেনা নাকি?"

হালকা বিরক্তির আভাস আলোকের গলায়। গোয়েন্দাগিরি যতক্ষণ শখের আছে ঠিক আছে, তার জন্যে দিনের পর দিন অফিস ছুটি করে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানোকে সে সমর্থন করতে পারছেনা। রাই বুঝতে পারলেও, বিরক্তিটা গায়ে মাখলনা,

-"না যাব, কাল গেলাম না, আজ কাজ রয়েছে। তুমি চানে যাও, আমি একটু ভার্মাকে ফোন করে তারপর যাব।"

আলোক আর কিছু বলল না। অফিস যাবে যখন তখন তার আর কিছু বলার নেই। সাড়ে সাতটা বেজেছে দেখে রাই মোবাইল তুলে নিল, খুব সকালে ভার্মাকে ফোন করে বিরক্ত করতে চায়নি।

-" তুই শুভা ম্যাডামদের বাড়িতে কবে থেকে আছিস?"

গোঁয়ারের মত অন্যদিকে তাকিয়ে বসে থাকে হাট্টাকাট্টা লোকটা, উত্তর করেনা।সিনহার হাত নিশপিস করে তবে ভার্মা খুব কড়াভাবে মানা করে রেখেছে, গায়ে হাত তোলা যেন না হয়, বুড়ো মানুষ। হুঁ, বুড়ো মানুষ, চেহারা দেখে মনে হয় সাত জোয়ানের মহড়া নিতে পারে একা!

ভার্মা নিজে যায়নি নেকরামকে আনতে, জুনিয়র সিনহাকে পাঠিয়েছিল। এখন তার জিজ্ঞাসাবাদের সময়ও তার সামনে এলনা। পাশের ঘরে বসে ছোট্ট খুপরি দিয়ে সব দেখছে শুনছে। দরকার হলে সামনে যাবে। সকালে শুভা আর গিরীশ বেরিয়ে যেতেই সিনহা আর তার সঙ্গীরা গিয়ে নেকরামকে থানায় নিয়ে আসে। প্রথমে অনেক গাঁইগুঁই করছিল কানুনের কথা বলে, কিন্তু

সিনহা ধমকধামক দিয়ে চুপ করিয়ে দেয়। নেকরামের ছেলে ছিল ঘরে, সিনহা তাকে বোঝাতে যে তারা শুধু কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিয়ে যেতে চাইছে ওর বাবাকে, সেও নেকরামকে পুলিশের সাথে পাঙ্গা নিতে বারণ করে।

সিনহা আবারো জিজ্ঞেস করে, এবার একটু ধীরে কিন্তু উদ্ধত ভঙ্গীতে জবাব আসে,

-"অনেক সাল, শুভা দিদির বচপন থেকে।"

-"গিরীশকে কবে থেকে চিনিস?"

-"সেও অনেক কাল হবে। ছোট ভাইয়ের বন্ধু ছিল, পরে দিদির সাথে শাদী হল।"

-"রাজেশ্বরী,যে মারা গেছে তাকে শেষ কবে দেখেছিস?"

-"মনে নেই। অনেকদিন সে যায়না ওদিকে। গত বছর যখন এরা এসেছিল তখন বোধহয় রাজী আর ওর স্বামী এসেছিল বাপমার সঙ্গে দেখা করতে।"

-"গিরীশের আগের স্ত্রী নির্মলাকে চিনতিস তুই?"

-"না।"

নেকরামের চোখমুখ কি আরো কঠিন হয়ে উঠল না ভার্মার দেখার ভুল? শুভা ও গিরীশকে নিয়ে আরো প্রশ্নে নেকরাম ছাড়া ছাড়া উত্তর দিল, কিছুই সে জানেনা। তবে গিরীশ শহরে আসার পর পরই শুভার দাদার সঙ্গে তার ভাব ও নিয়মিত ও বাড়িতে যাতায়াত, এটা স্বীকার করে নিল। রাজেশ্বরীর সঙ্গে শুভার সম্পর্ক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলল কেউ বুঝতেই পারত না যে রাজী শুভার নিজের মেয়ে নয়!

ভার্মার একটু অস্থির লাগে, কী জন্যে রাই ম্যাডাম একে এত গুরুত্ব দিচ্ছে কে জানে! সে ঘরে ঢুকে সিনহাকে বাইরে যেতে বলে। একা নেকরামের মুখোমুখি, ভার্মাকে দেখেও নেকরামের ভাবভঙ্গীর কোনো পরিবর্তন নেই।

-"নেকরাম, তোমার তো বয়স হয়েছে, গাঁয়ে তোমার পরিবার আছে, ছেলেমেয়ে নাতি নাতনী। তা এই বয়সে গাঁয়ে না ফিরে গিয়ে এখানে রয়ে গেছ কেন?"

নেকরাম একই রকম মেজাজে বলে,

-"এই সওয়াল করতে আমাকে এখানে নিয়ে এলেন?" ভার্মা ভেতরের উষ্মা প্রকাশ করেনা,সংযত থাকে,

-"তুমি তো পুলিশ অফিসারের সঙ্গী ছিলে, জান তো পুলিশকে সব জানতে হয়, সাধারণ লোকে অনেক সময় যা দেখেনা বোঝেনা, পুলিশকে সে সবকিছু দেখতে বুঝতে হয়। আমায় উল্টে সওয়াল না করে আমি যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও।"

-"আমি চলে গেলে এই বাড়ির দেখাশোনা কে করবে। বড়ভাই আসেনা কিন্তু ছোটভাই তো আসে মাঝে মাঝে, শুভা দিদি আসে, ওদের জন্যে সব ঠিক করে কে রাখবে। তাছাড়া প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে এখানে আছি, এখন আমার এখানে থাকতেই ভালো লাগে, এই বাড়িতে। গাঁয়ে যাই মাঝে মাঝে যখন ইচ্ছে হয়। জরু মরে গেছে, ছেলে মেয়েদের সংসার, বেশীদিন সেখানে থাকতে ভালো লাগেনা।"

-"ছোটভাই মানে গিরীশের বন্ধু? কোথায় থাকে সে?"

-"ঠিক জানিনা, ঘোরাঘুরি করে। পাহাড়ে কোথায় আশ্রম আছে ।"

-"তা সে সাধু হয়ে গেল কেন?"

নেকরাম প্রথমে জবাব দেয় না। ভার্মা খুব ভেবে প্রশ্ন করেনি এমনিই কথার পিঠে কথা, তাই চট জবাব না পাওয়াতে অবাক হল। আবার জিজ্ঞেস করতে নেকরাম একটু উদাস স্বরে বলে,

-"ছোটী বহু কে খুব ভালোবাসত, সে হঠাৎ মারা গেল,তার পর থেকেই কেমন বাওরা হয়ে গেল। ঘুরে বেড়াত, অফিস যেতনা, তারপর একদিন সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করে ঘর ছেড়ে চলে গেল। সাহেবের মারা যাওয়ার খবর কোথা থেকে পেয়ে এসেছিল।"

রাইকে মনে করে ভার্মা,রাই বলেছে নেকরাম হয়ত সোজাসুজি কোনো উত্তর দেবেনা, ওর সঙ্গে প্রচুর কথা বলতে হবে, যতক্ষণ কথা বলা যায়, যা খুশী কথা। কথা বলতে বলতে কখন বেফাঁস কিছু বলে সেই অপেক্ষায় থাকতে হবে। তাই সে বলে,

-"গিরীশের প্রথম বৌয়ের নিখোঁজের কথা কিছু মনে আছে তোমার? গিরীশ নিশ্চয়ই তোমার সাহেবের কাছে এসেছিল সাহায্য চাইতে, তার চেনাজানার মধ্যে একজন পুলিশ অফিসার। আসেনি?"

-"আসতে পারে, আমাকে কেউ কিছু বলেনি। আমি নোকর মানুষ, সাহেবদের মধ্যে কী কথা হচ্ছে আমি কী করে জানব!"

ভার্মা ধৈর্য্য হারায় না,

-"গিরীশ কোনোদিন তার প্রথমা স্ত্রীকে নিয়ে শুভাদের বাড়ি মানে তার বন্ধুর বাড়ি যায়নি?"

-"জানিনা, আমি দেখিনি।"

-"তুমি কোনোদিন ওদের ফিরোজগাঁওয়ের বাড়িতে গিয়েছিলে? শুভা আর গিরীশের বিয়ের আগে বা পরে?"

-"না, ওরা বিয়ের পরে শুভাদিদির বাড়িতেই ছিল, ফিরোজগাঁওর বাড়ি আগেই ছেড়ে দিয়েছিল। তখন দোতলায় ভাড়া ছিল না, ছাদে বর্ষাতিও বানানো হয়নি। ছোটদাদা, তার বউ, সাহেব আর শুভাদিদিরা ছিল। এতলোকে, ঐ দুটো ঘর, অসুবিধে হত, তাই ওরা শান্তি বিহারে চলে যায়, সাহেবই ব্যবস্থা করে দেয়। প্রথমে ভাড়া বাড়িতে ছিল, পরে ফ্ল্যাট কেনে।"

-"রাজেশ্বরী বাজার থেকে হারিয়ে গিয়েছিল পরে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়, তুমি জান?"

-"হাঁ, শুনেছি।"

-"রাজেশ্বরীর মাও বাজার থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, তুমি জানতে?"

নেকরাম এ প্রশ্নের উত্তর দেয়না প্রথমে। ভার্মা আবার প্রশ্ন করতে বলে,

-"ঠিক মনে নেই, অতকাল আগের কথা। শুনেছিলাম মনে হচ্ছে।"

-"তার কিন্তু মৃতদেহ পাওয়া যায়নি, হয়ত সে বেঁচে ছিল বা আছে?"

নেকরাম এ কথায় কিছু বলেনা।

-"শুভা আর গিরীশের বিয়ে কবে হয় মনে আছে? রাজেশ্বরীর তখন কত বয়স?"

-"ঠিক মনে নেই। বিয়ের সময় তো মেয়েকে দেখিনি, পরে শান্তিবিহারের বাড়িতে দেখেছি, তখন বছর দেড় দুয়েক বয়স হবে।"

-"রাজেশ্বরীর খোঁজ করতে ওর স্বামী তোমার কাছে গিয়েছিল?"

-"হ্যাঁ, কিন্তু সে তো অনেকদিন ওদিকে যায়নি, আমি দামাদজীকে বলেছিলাম সে কথা।"

-"রাজেশ্বরীকে আইয়াপ্পা মন্দিরের একটা মেয়ে মন্দিরের উল্টো দিকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে শেষ দেখেছিল, পরে সে একটা গাড়িতে উঠে চলে যায়। তোমাদের বাড়িতে কোনো গাড়ি আছে, গিরীশ শুভার গাড়ি?"

-"না, গাড়ি নেই। ওরা কোথাও যেতে হলে গাড়ি ভাড়া নেয়, সাহেবের মানে শুভা দিদির বাবার পুরনো ফিয়েট অনেক দিন হোলো বিক্রি হয়ে গেছে।"

ভার্মা আর কী জিজ্ঞেস করবে বুঝতে পারছেনা। নেকরামের গ্রামের ঠিকানা নিয়ে নিয়েছে সিনহা। সেখানে কাউকে পাঠিয়ে কতগুলো ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে। কেমন যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করছে এমন ভাবে ভার্মার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়,

-"মন্দিরে মেয়েটা কার গাড়িতে যেতে দেখল মহিলাকে, ঠিক দেখেছে কিনা কে জানে!"

-"গেটের সামনে তো ঝাড়ির ছায়া পড়ে অন্ধকারে, মন্দিরে বসে গেটের কাছ ঠিকমত নজরে আসেনা মোটেই, বকোয়াস করেছে ঐ বাচ্চাটা!"

ভার্মা নেকরামের যেচে উত্তর দেওয়া দেখে একটু অবাক হয়,

-"তুমি দেখেছ আইয়াপ্পা মন্দির? হ্যাঁ,অন্ধকারে মন্দিরের সামনে থেকে রাস্তা ঠাহর করা মুশকিল।"

নেকরাম তড়িঘড়ি বলে ওঠে,

-"হাঁ হাঁ,আমি অনেকবার গেছি শান্তিবিহারে মন্দিরে। শুভা দিদি তো ওখানেই থাকত।"

-"নেকরাম, তুমি এখন বাড়ি যাও। কিন্তু শহর ছেড়ে কোথাও যেও না।"

নেকরামকে ধরে রেখে আর কী জিজ্ঞেস করবে ভার্মা বুঝতে পারল না। ও গিরীশ আর শুভার বিয়ের আগের সম্পর্ক নিয়ে জানলেও বলবেনা। তবে এটা জানা গেছে যে ওরা নির্মলার যাওয়ার বছরখানেকের মধ্যেই বিয়ে করেছে। শান্তিবিহারে যখন ওরা রাজেশ্বরীকে নিয়ে এসেছে তখন তার বয়স দেড় কী দুই, সেই হিসেবে সময়টা ওরকমই দাঁড়াচ্ছে। অবশ্য ভার্মা খুব বেশী হতাশ হয় না, নেকরামকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা রাইয়ের মতলব, তার নয়। নির্মলার ব্যাপারে জেনে রাজেশ্বরী কেসের সুরাহা হবে সে মনে করেনা। তবু ম্যাডামকে জানাতে হবে সব কথা।

লাঞ্চ টাইমে ভার্মার কাছে নেকরামের কথা শুনল রাই। ভার্মা টেলিফোনেই পুরো জিজ্ঞাসাবাদ পর্বের রেকর্ডিং শুনিয়ে দিল রাইকে।

-"ম্যাডাম, তেমন কিছু তো পরিস্কার হলনা। কোনো নতুন কথাও জানা গেলনা।"

রাই চুপ করে রইল। দু এক কথার পরে ভার্মা জানালো অঞ্জনা ফোন করেছিল রাজীর বডি নেওয়ার বিষয়ে কথা বলতে। রাজপাল ঝামেলা করছে, গিরীশরাও চুপ। তবে ভার্মা কথা বলেছে, দু এক দিনের মধ্যে বডি তুলে দেওয়া হবে অর্কদের হাতে। সুজিত মুকুন্দনের ওপরেও নজর রাখছে ভার্মার লোক, সে আজ সকাল থেকেই অফিসে।

খাওয়াদাওয়ার পরে অফিসে এসে সীটে বসে রাই চোখ বন্ধ করে নিজের স্মৃতির রেকর্ডে বার বার শুনতে লাগল নেকরামের ইন্টারভিউ।

-"হ্যালো, মিঃগিরীশ?'

-"হ্যাঁ,বলছি।"

-"নিন, কথা বলুন"।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। লাইনটা কেটে গেল নাকি। গিরীশ আবার হ্যালো হ্যালো করে। হঠাৎ অস্পষ্ট চাপা একটা আওয়াজ,

-"বাবা, আমি রাজী। আমি ভালো নেই .... ।"

থানায় এসে ভার্মা আজ অনেকগুলো ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বড়সাহেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আসন্ন সি এম ভিজিট নিয়ে একটা বিভাগীয় মিটিংও হয়ে গেল। সাহেবের নির্দেশে এরপর সে গাড়ি নিয়ে বেরোলো রুটটা একবার ভালো করে দেখে নিতে। পরদিন লখনৌ থেকে বড় অফিসারদের একটা টীম আসার কথা। বিকেলে শহরের সিইও একটা মিটিং ডেকেছে তাতেও যেতে হবে সাহেবের সাথে। সকালে ঘুরেটুরে থানার দিকে ফিরছে তখন সিনহার ফোন এল।

-"স্যর, আপনি কোথায়?"

-"এই পানবাহারের মোড়ে, থানার দিকেই আসছি। কেন, কী হল সিনহা?"

-"না ঠিক আছে, তাহলে তো আপনি পাঁচ মিনিটে পৌঁছে যাবেন। আসুন, তারপরেই কথা হবে।"

থানায় ঢুকে নিজের ঘরে যাবার আগে দোতলায় বড়সাহেবের ঘরে যেতে যাবে, ওর ঘর থেকে সিনহা বেরিয়ে এল। হয়ত গাড়ি ঢোকার আওয়াজ পেয়েছে।

-"কী ব্যাপার সিনহা, ফোন করেছিলে কেন?"

-"স্যর, সেই মিসেস ব্যানার্জীর বাবা এসে বসে আছেন অনেকক্ষণ। আমাদের কিছু বলছেন না, উনি আপনার সঙ্গেই কথা বলতে চান। খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন তাই আপনাকে ফোন করেছিলাম।"

আজ সারাদিনের ব্যস্ততায় ভার্মার এই কেসটার কথা মনে হয়নি। এখন গিরীশের কথা শুনে একটা ব্যগ্রতা জেগে উঠল। সে বসের কাছে যাওয়া মুলতুবি রেখে নিজের চেম্বারের দিকে গেল।

তাকে ঢুকতে দেখে গিরীশ উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ভার্মা "বসুন, বসুন" করতে করতে নিজের চেয়ারে বসে বলল,

-"হ্যাঁ এখন বলুন কী ব্যাপার। কী জন্য খুঁজছিলেন আমাকে?"

-"আপনারা ভালো করে তদন্ত করছেন না অর্ক সম্বন্ধে, ওকে ছেড়ে রেখেছেন। দেখুন ও কীরকম বদমায়েশী করছে আমাদের সঙ্গে।"

ভার্মা অবাক হল। অর্ক আবার কী করল! যতদুর দেখেছে অর্ক এদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারই করছে, অভদ্রতা যা হচ্ছে সে এই তরফে, রাজপালের মদতে।

-"মিঃ ব্যানার্জী? কী করেছে?"

-"আজ ভোরে আমার মোবাইলে একটা ফোন আসে। ভালো করে আওয়াজ শোনাও যাচ্ছিল না, বোঝাও যাচ্ছিলনা। বলল সে নাকি রাজী, আমার মেয়ে। কীরকম বদমায়েশী চিন্তা করুন।"

ভার্মা একটু চমকায়। এ আবার কী নতুন আপদ! ভদ্রলোক বেশ আপসেট, চোখমুখ দেখেই মনে হচ্ছে। কিন্তু কথা হচ্ছে রাজপালের কাছে না গিয়ে এখানে তার কাছে কেন। এদের উকিল তো রাজপাল। গিরীশ বোধহয় ভার্মার মুখের দিকে তাকিয়ে তার ভাবনাটা আন্দাজ করতে পারল।

-"আমি রাজপালের কাছে গিয়েছিলাম, সে বলল আপনাকে এসে বলতে। তার ধারণা এ অর্কর কাজ, আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করছে, আমরা ওর নামে শান্তিবিহার থানায় রিপোর্ট করেছি তাই এসব করছে আমাদের বিরক্ত করতে, দুঃখ দিতে!"

-"ঠিক আছে দেখছি। আপনি নাম্বারটা দিন আগে।" ভার্মা সিনহাকে ডেকে পাঠাল। নাম্বার ট্রেস করে দেখা গেল ওটা সাউথ পার্কের রাস্তার ধারের একটা পাবলিক কল বুথ। সাউথ পার্ক এখান থেকে অনেক দুর। রাত থাকতে উঠে অর্ক এক দেড় ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে ফোন করতে সাউথ পার্ক গেছে!

-"ফোনে আপনাকে আর কিছু বলেছে না শুধু আপনার মেয়ের নাম করেই রেখে দিয়েছে?"

গিরীশ ভেবে বলে,

-"খুব অস্পষ্ট ছিল স্বর, ভালো শোনা যাচ্ছিলনা। "রাজী বলছি" টাই ঠিক করে শুনলাম। তারপরে কী একটা বলে কেটে দিল, ভালো শুনতে পেলাম না। আমি বারবার ফোন করলাম ঐ নাম্বারে, কিন্তু কেউ ওঠালো না।"

-"মিঃ ব্যানার্জীর গলা মনে হল আপনার? আপনি নিশ্চয় মিঃ ব্যানার্জীর গলা অস্পষ্ট হলেও বুঝতে পারবেন।"

গিরীশ অনিচ্ছাসত্বেও বলল,

-"না অর্কর গলা নয়। মেয়েলী গলা, তবে রাজীর গলার সঙ্গে কোনো মিল নেই, খুব আবছা শোনা গেল।"

-"আবছা, অস্পষ্ট যখন তখন মিল নেই তা নিশ্চিত কী করে বলছেন?"

গিরীশ চুপ, ভার্মা আবার বলে,

-"কিন্তু এরকম ফোন করে কার কী লাভ? আপনার মেয়ের দেহ আপনি নিজে শনাক্ত করেছেন, প্রমাণ হয়ে গেছে। আপনি এরকম একটা ফোন পেয়ে দুঃখিত হতে পারেন বড়জোর, আর কিছু না! তাহলে আপনাকে কে আপনার মেয়ের নাম দিয়ে ফোন করল?"

গিরীশ এখন অনেকটাই শান্ত,

-"জানিনা, কিন্তু আপনি ভালো করে অর্কর ওপর নজর রাখুন। ঐ আমার মেয়ের মৃত্যুর জন্যে দায়ী, ওকে চাপ দিন আপনারা।"

গিরীশকে বুঝিয়ে বাড়ি পাঠালো ভার্মা, এ নিয়ে আরো খোঁজখবর করবে কথা দিয়ে। গিরীশ চলে যাবার পরে ও বড়সাহেবের কাছে গেল সারাদিনের রিপোর্ট দিতে। দুপুরে বাড়ি এসে খাওয়াদাওয়ার পর আর থানায় গেলনা। বিকেলে গাড়িকে বাড়িতেই আসতে বলে দিল, সোজা মিটিংয়ে চলে যাবে। শুয়ে শুয়ে সকালের সব ঘটনা ছাপিয়ে গিরীশের কাছে আসা ফোন কলটাই মনে পড়ছে। ভদ্রলোক অর্ককে ফাঁদে ফেলবার জন্য গল্প বানাচ্ছেনা তো! সাউথ পার্ক এখান থেকে দুর হলেও গিরীশের বাড়ি থেকে দুর নয়। নিজেই গিয়ে বুথ থেকে নিজের মোবাইলে ডায়াল করেনি তো!

রাইয়ের এখন লাঞ্চ আওয়ার,ভার্মা ফোন লাগাল, ঘটনাটা জানাতে হবে, একটু পুলিশী ধরণের বাইরে গিয়ে আউট অফ বক্স চিন্তাধারা দরকার আর রাই সেরকম ভাবতে পারে বলেই ম্যাডামের অনেক কথা মিলে যায় অনেক সময়।

রাই শোনে সব, মিলছেনা, অনেক কিছুই মিলছেনা। যদি রাজীর নাম করে কেউ ফোনও করে গিরীশ তা নিয়ে এত হইচই করছে কেন, পুলিশকে জানিয়ে রেখে দেওয়াই তো যথেষ্ট। রাজপালকে বলে আবার ভার্মার কাছে এসেছে। অর্ককে ও প্রথম থেকে দোষী করছে অথচ কোনো প্রমাণ নেই, মোটিভও সেইভাবে কিছু নেই, তাই কি মরিয়া হয়ে গেছে?

-"ভার্মাজী, রাজীর বডি কবে ছাড়ছেন আপনারা?"

-"পরশু, কাল জানিয়ে দেব ব্যানার্জীদের। কেন ম্যাডাম?"

-"আপনি আমার কথা খুব ভালো করে শুনুন। এই ফোন কলের ব্যাপারটায় আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। আপনাকে নিজে কাজটা করতে হবে, অন্য কাউকে ভার দিলে চলবে না। সুজিত আর অর্কর ওপর যেভাবে নজর রাখছেন সেভাবে গিরীশের ওপরেও নজর রাখুন কিছুদিন।"

-"ম্যাডাম, কাজটা কী করতে হবে?"

-"ভার্মাজী মিটিং শেষ হলে সে যত রাত্রিই হোক আপনি আমার বাড়ি আসতে পারবেন?"

নেশার জিনিস দেখলে শালিখরামের আজকাল কেমন একটা ভয়মেশানো অদ্ভুত অনুভূতি হয় মনের ভেতর। ঐ নেশার কারণে তার যে একদিন সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছিল তা ভুলতে পারেনা কিছুতেই। তখন অল্পদিন হোলো এসেছে এই শহরে, চাকরিটা তার গাঁয়ের এক পড়শীর, সে অসুস্থ হয়ে পড়ায় শালিখরামকে নিয়ে এসে নিজের জায়গায় কাজে লাগায়।

ওদের অবস্থা ভালো ছিলনা, জমিজমা এত অল্প যে গাঁয়ে থাকলে একবেলা ঠিকমত খাওয়াও জোটেনা। মা বউ ছেলে, খাবার মুখ নেহাত কম নয় বাড়িতে। চাকরি পেয়ে সে বর্তে গিয়েছিল,শহরটাকেও বেশ পছন্দ হয়েছিল, তার অনেক আত্মীয় স্বজন তখন এখানের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

শহর ভালো লাগলেও কাজ ভালো লাগেনি। কাজ কিছু নয় পাহারা দেওয়া, জায়গাটা শহরের লাগোয়া একটা গাঁয়ের প্রান্তে, লোকালয় থেকে একটু তফাতে। শালিখরাম পরেশান হয়ে যেত, সারাদিন রাত যদি মাঠের ধারে ভুতের বাড়ি পাহারা দিতে হয় তাহলে লোকে পাগল হবে না! কেয়ারটেকার ছিল ভজনলাল, সে আবার সাহেবদের লতায় পাতায় আত্মীয় হত, রোয়াব খুব তার। ভজনলালের পরিবার থাকত পাশের গাঁয়ে। রোজ রাতে ঐজন্যে সে এবাড়ীতে থাকত না, শুধু সাহেবরা এলে থাকত। সকালে এসে ঘর খুলে লোক দিয়ে পরিস্কার করিয়ে, বাগানে মালীকে দিয়ে কাজটাজ করিয়ে, সবার ওপরে খবরদারী করে সন্ধ্যেয় সব বন্ধ করে চলে যেত। তখন এতবড় এই ফার্মহাউসে শুধু শালিখরাম আর চৌবেজী। চৌবেজী সন্ধ্যে থেকেই রামায়ণ আর হনুমান চালিশা পড়ত ভুত তাড়াতে, আর রাত দশটা বাজলেই খেয়েদেয়ে পিছনের গেট বন্ধ করে সেখানে খাটিয়া পেতে ঘুম দিত। সামনের গেটে শালিখরাম একা, ভয়ে প্রাণ বেরিয়ে যেত। গাঁয়ের দু চারজন নেশাখোর যখন তার কুঠরিতে নেশা করতে আসতে লাগল মাঝে মাঝে, সে বারণ করল না। ওরা থাকলে ভয়টা একটু কম লাগত। যেদিন ওরা আসত,দের রাত অবধি আড্ডা বসত, ভালোই কাটত সময়। ওদের পাল্লায় পড়ে তারও নেশাতে হাতেখড়ি হল তবে সে পাকা নেশাড়ু কখনোই ছিলনা। সেই একদিন যে তার কী হয়েছিল!

কাজটা তো মন্দ ছিলনা, পয়সাকড়িও ভালো দিত, এছাড়া ক্ষেতের আলুটা মুলোটা গাছের ফল এসবের বিক্রির ভাগ পাওয়া যেত ভজনলালের সঙ্গে মিলেমিশে। কোথা হতে কী যে হয়ে গেল, তবে গুরুর কৃপায় এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। তবু আজও নেশার জিনিস বা নেশাখোরের থেকে সে শতহস্ত দুরে থাকে।

-"শালিখরাম।"

-"হাঁ মহাত্মাজী।"

-"তোকে যে একটা কাজ করতে হবে"।

-"কী কাজ মায় বাপ? হুকুম করুন।"

-"এবার যে সময় এসেছে, তোকে সেই রাতের কথা গিয়ে পুলিশকে গিয়ে বলতে হবে।"

-"কোন রাত হুজুর?"

-"ভুলে গেলি? তোর সেই শেষ নেশা করার কথা?"

-"আরে ছি,সে কী ভোলবার মহাত্মা? কিন্তু সে রাতের কথা আমি কিছু জানিনা হুজুর, বেহুঁশ ছিলাম,সেই জন্যেই তো আমাকে শাস্তি পেতে হয়েছিল।"

-"সেই কথাই তোকে বলতে হবে। তোর বেহুঁশীর কথা, নেশার কথা, শাস্তির কথা,যা তুই জানিস সব কথা। এখন চল, আমি তোকে পুলিশ স্টেশনের বাইরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। ভেতরে গিয়ে কার সঙ্গে কথা বলতে হবে সে যেতে যেতে বুঝিয়ে দেব।"

-"কিন্তু সেসব কথা এখন এতদিনে কেন মহাত্মা? তাছাড়া পুলিশের ব্যাপার, ওরা তো এমনিই বিনা কারণে লোককে ধরে রাখে, মারে। এখন উমর হয়ে গেছে বাবা, ডর লাগে।"

-"দরকার পড়েছে রে, কোনো ডর নেই, আমি সামনে যাবনা তবে নজর রাখব, তোকে ওরা কিচ্ছু করবেনা। যদি কিছু করেও আমি সামলে নেব, আমার ওপর ভরসা আছে তো?"

-"পুরা ভরোসা আছে গুরুজী, আপনি যা বলবেন।"

-"আজ দরকার নাহলে তোকে একলা পাঠাতাম না। সংসার, সম্পর্ক এসব কখন কোন পথে যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন কীবা সন্ন্যাসী কীবা গৃহী!"

"ম্যাডাম, একবার থানায় আসতে পারবেন?"

-"ভার্মা, এখন? আমি এইমাত্র অফিসে ঢুকলাম যে।"

বলেই রাইয়ের মনে হল খুব জরুরী কিছু না হলে ভার্মা সাতসকালে ওকে থানায় যেতে বলবেনা। এমনিতে ভার্মা সব ব্যাপারেই ওর বাড়ি এসেছে, ওকে থানায় যেতে বলেনি কখনো। তাই আবার বলে ওঠে,

-"কেন বলুন তো? কী হল?"

-"না মানে খুব অসুবিধে না থাকলে এক্ষুনি একবার চলে আসুন কিছুক্ষনের জন্যে। চেনেন তো? আপনার অফিস থেকে রিক্সায় মিনিট কয়েক লাগবে।"

রাই চেনে থানার রাস্তা। সে আর কথা না বলে সব বন্ধঝন্ধ করে ছোট পার্স আর মোবাইলটা তুলে নিয়ে বসের ঘরের দিকে পা বাড়ায়। মেয়ের স্কুল থেকে ডাক এসেছে বলবে।

থানায় পৌঁছে দেখল বাইরে ভার্মার একজন জুনিয়র অফিসার ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। "রাই ম্যাডাম? আমার সঙ্গে আসুন।" সঙ্গে করে নিয়ে গেল দোতলার একটা ঘরে। রাই আগে এসেছে যখন তখন অভি ছিল, সেও প্রায় বছর চারেক হয়ে গেল। এমনিতে খুব কিছু বদলায়নি, দোতলাটা অপেক্ষাকৃত পরিস্কার আর লোকজন বিশেষ নেই। টানা বারান্দার শেষপ্রান্তে একটা আধা অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে অফিসারটি চলে গেল। ঘরে একটা বেঞ্চি,দু তিনটে কাঠের চেয়ার আর একটা টেবিল ছাড়া অন্য কোনো আসবাবপত্র নেই, জানালা সব বন্ধ, একটা কম ওয়াটের বাল্ব মাঝখানে জ্বলে চারপাশের অন্ধকারকে আরো গাঢ় করে তুলেছে । ভার্মা একটা চেয়ারে বসেছিল, ও ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালো।

-"ম্যাডাম, আসুন আসুন। সরি বিরক্ত করলাম, কিন্তু এই ব্যাপারটায় মনে হল আপনার উপস্থিতি জরুরী।"

-"কী হয়েছে ভার্মাজী?"

-"ম্যাডাম, এ হল শালিখরাম। সাতাশ বছর আগে ফিরোজগাঁওয়ে লালজীদের ফার্মহাউসের সিকিউরিটী ছিল।"

এতক্ষন রাই ঘরের মধ্যে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি আঁচ করতে পারেনি। এখন অন্ধকারে চোখ সইয়ে ভার্মার নির্দেশ অনুসারে কোণের বেঞ্চির ওপর একজন মানুষ চোখে পড়ল। ভালো করে দেখে লোকটির বয়স এই পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন হবে মনে হল। রোগা রোগা চেহারা তবে বসে থাকলেও বোঝা যায় বেশ লম্বা গঠন। মাথা অগোছালো আধকাঁচা আধপাকা চুলে ভর্তি, মুখখানা বেশ শুকনো খড়ি ওঠা। পরণে সাদা ময়লা পাজামা আর একটা মেটে র ঙের কুর্তা, একটা গরমের চাদরও জড়ানো গায়ে। রাইয়ের দিকে তাকিয়ে দু হাত জুড়ে নমস্তে করল। রাইও উত্তরে মাথাটা ইষৎ নামালো। লোকটার চোখদুটো খুব ইন্টারেস্টিং,কেমন একটা উদাস সরল দৃষ্টি।

-"শালিখরাম ঘন্টাখানেক আগে থানায় এসে রাজেশ্বরীর কেসের অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে চায়। থানার লোকেরা পাত্তা দেয়নি, ভাগিয়ে দিচ্ছিল,কিন্তু ও যাচ্ছিলনা, কাকুতিমিনতি করছিল। ভাগ্যিস সিনহা ওখান দিয়ে আসছিল, গোলমাল দেখে দেখতে গিয়ে রাজেশ্বরীর কেস শুনে সোজা আমার কাছে নিয়ে আসে একে। শালিখরাম বলছে ওর কোন গুরুজী নাকি ওকে পাঠিয়েছে আমার কাছে সব কথা বলতে।"

রাই দেখে শালিখরাম একটু হাসি হাসি মুখে ভার্মার কথা শুনছে, ওকে নিয়ে কথা হলেও কথার মাঝে কিছু বলছেনা। লোকটাকে দেখে অবাক লাগে রাইয়ের, কেমন যেন একটা নির্লিপ্ত ভাব। সে কেন এসে পুলিশের ব্যাপারে জড়াচ্ছে, কে ওর গুরুজী! সবকিছু জানার জন্যে অস্থির হয়ে ভার্মাকে তাড়া দেয়।

-"কী জানে ও? কী বলেছে আপনাকে?"

-"সেরকম কিছু না। তাই আমি চাই আপনিও শুনুন ওর কথা। ও নাকি এক রাতে নেশা করে বেহুঁশ হয়ে গেছিল, অথচ এমনিতে ও সব দিন নেশা করত না, করলেও এরকম বেহুঁশ হবার মত নেশা কখনই করত না। ও পরিস্কার বলছে না কিন্তু আমার মনে হয় যে দিন নির্মলা নিখোঁজ হয়েছিল, এ সেই রাতের কথা।"

ভার্মা এবার শালিখরামের দিকে তাকিয়ে বলে,

-"শালিখরাম, ইনি আমাদের ম্যাডাম, তুমি একে সব কথা বল তো আরেকবার।"

শালিখরাম আবার হাত জোড় করে।

-"ম্যাডাম জী, মহাত্মাজী আমার ভগবান। উনি না থাকলে আজ যে আমার কী হত, ভেসে যেতাম, আমার পুরো পরিবার শেষ হয়ে যেত।"

রাই কিছুই বোঝেনা, কে এই মহাত্মাজী, গুরুজী। তবু ও শালিখরামের কথায় বাধা দেয়না, ভার্মাকেও ইঙ্গিতে চুপ থাকতে বলে।

-"ম্যাডামজী, মহাত্মা বলল, সময় হয়েছে শালিখরাম। তোর সাথে যে অন্যায় হয়েছিল তা পুলিশকে গিয়ে বল, এতে সবার ভালো হবে, অন্যায়ের প্রতিকার হবে। আমি কিছুই জানিনা ম্যাডামজী, কার ভালো হবে,কী অন্যায়! আমি শুধু বাবার আদেশ পালন করি। সেই রাতে ম্যাডাম আমি কী করে যেন বেহুঁশ হয়ে গেলাম। সবাই বলল নেশা করেছে, বেওড়া হয়েছে। কিন্তু আমার বেটার কসম সাব, আমি অত নেশা করিনি। সন্ধ্যে হলে ঐ ভুতের পুরীতে শুধু পিছনের গেটে চৌবেজী আর সামনে একা আমি, খুব ভয় করত মাঝে মাঝে। গাঁয়ের দু চারজন নেশাড়ু মাঝে মাঝে এসে আসর বসাত, তারা থাকলে ভয়টা কম লাগত। তাদের খুশী করতে একটু আধটু খেতাম, সেও রোজ নয়।

সেদিন সন্ধ্যেয় ভাই এসে বোতল খুলল, বলল ওর মালিকের ছেলে দিয়েছে, বিলিতী। তাই একটু চেখে দেখলুম, বিলিতী আসলী মাল ছিল বলে কী কে জানে, জবর নেশা হয়ে গেল একটু তেই। তারপর রাতভোর আর কিছু মনে নেই। সেরাতে আবার চৌবেজীও ছিলনা, ছুটি নিয়ে কদিন গাঁও গেছিল। আমাদের দুজনের কেউ একজন ছুটিতে গেলে ভজনলালের রাতে থাকার কথা। ভজনলাল মানে ফার্মহাউসের কেয়ারটেকার, কিন্তু সে থাকত না। পাশের গাঁয়ে ওর বাড়ি, ও বাড়ি গিয়ে ঘুমতো। সকালে ভজনলাল এসে দেখে আমি তখনও ঘুমোচ্ছি, ঐ চেঁচামেচি করল, মুখে নেশার গন্ধ পেয়েছিল। আমি যখন নেশায় অচেতন ছিলাম, সেই ফাঁকে নাকি চোর ঢুকেছিল ফার্মহাউসে। মালিকরা দিল্লী থেকে ম্যানেজারকে পাঠাল, সে এসে ভজনলালের কাছে সব শুনে আমাকে তাড়িয়ে দিল। আমি অনেক মিনতি করলাম, কিন্তু শুনলনা, বেশী কথা বললে পুলিশ ডেকে হাজতে পাঠিয়ে দেবে বলল। শুনলাম সেই রাতে গাঁয়ের একটা মেয়েও হারিয়ে গেছিল। ভজনলাল বলছিল ঐ চোরগুলোই নাকি মেয়েটাকে তুলে নিয়ে গেছিল।"

রাই চমকালো। ভার্মা ঠিকই ধরেছে, এ সেই রাতেরই কথা। কিন্তু শালিখরামকে কে পাঠিয়েছে? যে পাঠিয়েছে সে মনে করে যে নির্মলার ব্যাপারে শালিখরামের এই ঘটনার সম্পর্ক আছে। কিন্তু রাজেশ্বরীর কেসে পুলিশ নির্মলা অবধি পৌঁছেছে সেটা সে কী করে জানল!

রাই শালিখরামকে বাধা দেয়,

-"কী কী চুরি গেছিল ফার্মহাউস থেকে? এমন কী দামী জিনিস থাকত সেখানে?"

শালিখরাম কপালে হাত দিল,

-"না ম্যাডামজী, আসলে কিছুই চুরি যায়নি। সব ভজনলালের সাজানো। বাউন্ডারী ওয়ালের ধারে ধারে বিদেশী গাছের দামী চারা এনে সার সার লাগানো হয়েছিল সারা কম্পাউন্ড জুড়ে। পাঁচিলের ধারে মাটি তখনো কাঁচা ছিল, সেখানে পায়ের চিহ্ন পড়েছিল, কিছু চারা নষ্ট হয়ে গেছিল, তাই দেখে চোর যে এসেছিল তা বোঝা গিয়েছিল নাহলে কেউ বুঝতেও পারত না। কিন্তু আসলে চুরি কিছুই যায়নি। সেরকম কিছু দামী জিনিস ছিলই না, আসবাবপত্র, বাসন কোসন গাছ ফুল, ক্ষেতে সামান্য আনাজপত্র। ভজনলাল সুযোগ বুঝে কিছু জিনিস বস্তা ভরে নিজের বাড়ীতে রেখে এসেছিল, তারপরে বলেছিল চুরি হয়ে গেছে।"

-"তারপর, তোমার কী হল?"

-'আমার ম্যাডাম নোকরি চলে গেল। সাহেবেরা খুব গুস্সা হল। অন্য কোথাও কাজ খুঁজতে গেলে তারা এই সাহেবদের কাছে খোঁজ নিত, আর সাহেবরা আমার বদনাম করত নেশাড়ু বলে। এই শহরে কেউ আমায় কাজ দিচ্ছিল না। খুব কষ্টে দিন চলছিল মুটে মজুরী করে কোনোরকমে। বিরাদরীর লোকেরাও তখন মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। গাঁয়ে ফিরে যাব সেখানেও

জমিজমা ছিলনা, খাব কী, বৌ ছেলেকে খেতে কী দেব! নিজের খরচ চালিয়ে বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারছিলাম না, মমেরা ভাইয়ের কাছে গেলাম টাকার জন্যে, তা সেও রোজ ফিরিয়ে দিত দেখা না করে। আমাকে দেখলেও গেট খুলত না। সেদিন খুব খাটনি গেছে, রোদে হেঁটে গেছি ওর ওখানে,যদি কিছু কাজের ব্যবস্থা হয়। তা কাজের মেয়ে বলল সে নেই, ঢুকতে দিলনা। এতটুকু দানা নেই পেটে, কিছুদুর গিয়ে ফুটপাতের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। আমার ভাগ্য মহাত্মা দেখতে পেলেন,আমি বেঁচে গেলাম। তারপর উনি আমার সব কথা শুনে আমায় দয়া করলেন। ওর দয়াতেই আবার কাজ হল, সব হল। শুধু ওনার কথা রেখে আর জীবনেও নেশা ছুঁইনি, কারোকে ঠকাইনি। ছেলে লেখাপড়া শিখে গুরুজীর আশ্রমে কাজ করছে, আমরা বুড়োবুড়ি এখানে আছি, সীতা কলোনিতে একখানা ঘর আছে, আনন্দেই কেটে যায়।"

ভার্মা জানতে চায়,

-"এই মহাত্মা বা গুরুজী কে? কোথায় থাকেন?"

-"উনি আমাদের মত লোকের ভগবান সাব। আমার দেশের কাছে ওনার আশ্রম, মাহরীতে, একটা পাহাড়ের উপরে। গরীবদুঃখী দের নিয়ে কাজ করেন, সব আমিও জানিনা। মাঝে মাঝে শহরে এলে আমাদের বাড়ি আসেন।"

-"শহরে ওনার বাড়ি কোথায়?"

-"সে আমি জানিনা। এত লোকে ওঁকে ভালোবাসে, সবার বাড়িই ওর বাড়ি। আমি ওনার সাথে ঘুরেছি, যার বাড়িতে যান সেই খুশী হয়, কত বন্ধু ওনার।"

রাই বুঝল লোকটি সহজ সরল, প্রথম জীবনে ওরকম একটা ধাক্কা খাওয়ার পর এখন কোনো কিছুতে থাকেনা, সাদাসিধে জীবন যাপন করে। রাই একটু অধৈর্য্য হয়ে ভার্মাকে বলল,

-"এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ফার্মহাউসের চুরি আর নির্মলার নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার কী সম্পর্ক তা উনি নিশ্চয়ই কোনোভাবে জানেন।"

ভার্মা বলল,

-"কিন্তু এতো তার নামও বলতে পারছেনা, আশ্রমের খোঁজ করছি আমরা, এর বাড়ি গৌরীপুরে, উত্তরাঞ্চলে, মাহরী ওদিকেই হবে। কাছাকাছি থানার ঠিকানা খুঁজছে আমার লোকেরা।"

রাই একটা চেয়ারে বসেছিল, এরা জানালা খোলেনি কেন কে জানে। হয়ত এই ঘরে যা কথা হয় তা বাইরে থেকে যাতে কেউ না শোনে তাই এই ব্যবস্থা। দরজা ভেজানো ছিল, ভার্মা বাইরে গিয়ে কাউকে কিছু বলল। একটু পরে একটা লোক তিন গ্লাস চা নিয়ে এসে ওদের তিনজনকে দিল। শালিখরাম চা পেয়ে কেমন একটা শিশুর মত খুশী হয়ে উঠল, আরাম করে শব্দ করে চায়ে চুমুক দিল। রাইয়ের লোকটাকে খুব ভালো লাগছিল, আজকের যুগে এমন সরল লোক দেখা যায়না। সেইসঙ্গে ওর গুরুজীকে জানতে বা দেখতে ইচ্ছে করছিল। কেমন সেই মানুষটি?

-"ভার্মাজী, এই ফার্মহাউসের চুরির ব্যাপারটা ফিরোজগাঁওয়ের লোকেদের একবার জিজ্ঞেস করলে হয়না? নির্মলার কথা না মনে থাকুক, লালজীরা গ্রামের সেঠ, তাদের বাড়ির চুরির ঘটনা পুরনো লোকেদের মনে থাকতে পারে।"

-"তাতে কিছু লাভ হবে ম্যাডাম? আমরা তো রাজেশ্বরীর আর তার মায়ের ব্যাপারে জানতে চাই। ওখানে তো সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখেছি কেউ কিছু বলতে পারেনি। চুরির কথা মনে থাকলেও যদি তার সঙ্গে নির্মলার ঘটনার কোনো যোগসূত্র যদি কেউ না দিতে পারে শুধু চুরির কথা জেনে কী লাভ! শালিখরামের গুরুজীর ব্যাপারটা আমার অদ্ভুত লাগছে, উনি শালিখরামকে পাঠালেন, নিজে এলেন না কেন?"

রাই একটু অন্যমনস্কভাবে বলল,

-"হয়ত উনি ভেবেছেন আমরা শালিখরামের কথাতেই সব বুঝতে পারব। উনি পেরেছেন, কিন্তু আমরা পারছিনা, কেন!"

শালিখরামের চা খাওয়া শেষ, সে উসখুশ করছে, মনে হল যেতে চাইছে কিন্তু ওরা না বললে যেতে পারছেনা।

রাই সেদিকে খেয়াল করল না, মনে মনে শালিখরামের বলা ঘটনাটার কথাই ভাবতে থাকে, ভাবতে ভাবতে ভ্রুদুটো কুঁচকে আসে, অজান্তেই দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে। ওদিকে ভার্মা মোবাইলে কাকে ধরার চেষ্টা করছে।

-"শালিখরাম, তোমার ভাই তোমাকে মদ খাইয়েছিল সে রাতে, বললেনা?"

শালিখরাম ঘাড় নাড়ে।

-"তোমার নিজের ভাই? সে কখন বাড়ি গিয়েছিল, তার বাড়ি কোথায়? সেকী এর আগেও কখনো এভাবে তোমার সাথে মদ খেতে এসেছে? "

রাইয়ের গলা শুনে ভার্মা ফোন ছেড়ে দেয়, শালিখরামও তাকায় এদিকে। রাই সাগ্রহে উত্তরের অপেক্ষায়,

-"না, ম্যাডাম, আমার ঐ মমেরা ভাই, মামার ছেলে, আমার অনেক আগে থেকে সে এই শহরে আছে। সে আমার ওখেনে বিশেষ আসতনা, দরকার ছাড়া। গাঁও যাওয়ার সময় কিছু পাঠাতে হলে তখন আসত। । সেই প্রথম সে আমার জন্য বোতল নিয়ে এল, আমি খেতে চাইনি, আমি সেরকম নেশা করতাম না কখনো তায় আবার সাঁঝবেলায়। কিন্তু ঐ যে বলল বিলেত থেকে আনা, জোর করল, আমার শুনে কেমন ইচ্ছে হল, খেয়ে ফেললুম।"

-"তোমার ভাই এশহরে থাকে এখনো, দেখা করা যায় তার সঙ্গে? কী নাম তার?"

অনেকগুলো মিসড কল পড়ে আছে ফোনে, একই নাম্বার থেকে। কার ফোন কে জানে! দেখে রেখে দেয়, পরে ফোন করবে। বিকেলে ওরা সবাই ভার্মার ঘরে বসে আছে, বড়সাহেব চৌহানও আছে। মাঝে একবার অভির সঙ্গে কথা হয়েছে। চৌহান অভির কাছে তার বন্ধুর প্রশংসা করল।

ভার্মা বলল,

-"ম্যাডাম নেকরামকে কোথাও পাওয়া গেলনা। ও কাল থানা থেকে ফিরে গিয়েই কোথায় চলে গেছে, ছেলেটাও নেই। আপনি যখন থেকে ওর ওপর নজর রাখতে বলেছিলেন তখন থেকেই আমি একজনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সে ছিলও ওখানে, কিন্তু ওরা তার আগেই পালিয়েছে। এই লোকটি বুঝতেই পারেনি ঘরে কেউ নেই। এখন ওকে গ্রেফতার করতে গিয়ে দেখি নেই। সব জায়গায় খোঁজা হচ্ছে, ওর গ্রামের থানায় আমরা খবর পাঠিয়েছি, সেখানে গেলেই ধরবে। তবে সেখানে যাবে কী আর!"

-"ভার্মাজী, আপনারা কাজ কবে শুরু করতে পারবেন?"

উত্তর দিল চৌহান,

-"প্রাইভেট প্রপার্টি ম্যাডাম, তারওপর লালজীরা দিল্লীতে যথেষ্ট প্রভাবশালী, মন্ত্রীসান্ত্রীদের সাথে ওঠা বসা। আমি পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে সব বলে এসেছি। উনি চেষ্টা করছেন কথা বলে যদি অনুমতি পাওয়া যায়, এক্ষেত্রে পুলিশী ওয়ারেন্ট নিয়ে গিয়ে তাড়াহুড়ো করতে গেলে পরে ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে, আমাদের পক্ষে ভালো হবেনা, চাকরির ব্যাপার বোঝেনই তো।"

রাই বুঝতে পারে তবু ওর এই দেরী অসহনীয় মনে হয়।

ভার্মা অন্যকথায় গিয়ে বলে,

-"মাহরীর আশ্রমের খোঁজ পাওয়া গেছে কিন্তু ওদের গুরুজী এখন ওখানে নেই। ছোট আশ্রম, দু তিনজন কাজের লোক আছে, বাকী সব গ্রামের লোকেদের সাহায্যেই হয়। গুরুজীর কোনো ফোন নাম্বারও নেই, উনি নিজের কাছে মোবাইল রাখেন না। আমরা শালিখরামের সীতা কলোনির বাড়ির ওপর নজর রাখছি, উনি নিশ্চয়ই ওখানে আসবেন আজ বা কাল, পুলিশের সঙ্গে কী কথা হল জানতে।"

-'ভার্মাজী, টেস্ট রিপোর্ট কবে আসবে?"

-"কাল। আপনি কী আশা করছেন ম্যাডাম? ঐ রিপোর্টে কিছু পাওয়া যাবে?"

-"জানিনা। সবই অনুমান। যদি কিছু পাওয়া যায়, সবদিক দেখে রাখা আর কি!"

রাই এবার ভার্মা আর চৌহানের কাছে বিদায় নিয়ে উঠে পড়ে। ওরা আশ্বাস দেয় যখনই কিছু খবর আসবে বা নতুন কিছু জানা যাবে ওরা রাইকে ফোন করবে।

বাড়ি ফিরে নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ঐ ফোনকলটার কথা আর মনে থাকেনা।

পরদিন অফিসে পৌঁছেই থানায় ফোন করল। ভার্মাজী সকাল থেকে থানায় আসেনি। ভার্মার নাম্বার ডায়াল করবে কিনা ভাবতে ভাবতে ফোন নিয়ে এদিক ওদিক করতে গিয়ে আবার কালকের মিসড কলগুলো দেখে।

কী ভেবে নাম্বারটা ডায়াল করে,

-"হ্যালো, এই নাম্বার থেকে আমার ফোনে ফোন এসেছে।"

-"হ্যাঁ, আমি করেছিলাম। আমি সুজিত, রাজেশ্বরীর কাজিন।"

রাইয়ের মনে পড়ল ভার্মাই সুজিতকে রাইয়ের ফোন নাম্বার দিয়েছিল তাকে না পেলে যেন রাইকে ফোন করে। ভার্মা কী ফোন বন্ধ করে রেখেছে! সেকেন্ডে এসব ভাবনার মাঝেই কথা বলল,

-"আরে হ্যাঁ, অমি রাই বলছি। কী ব্যাপার, ভার্মাজীকে পাচ্ছেন না ফোনে?"

-"না, ভার্মাজীকে আমি ফোন করিনি। আপনি তো ঠিক পুলিশের লোক নয়, রাজেশ্বরীর হাজব্যান্ডদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড, তাই না?"

রাই বিনা দ্বিধায় "হ্যাঁ" বলে।

-"পুলিশ বোধহয় আমার ওপর নজরদারী করছে। বেশ অস্বস্তি হচ্ছে, আপনার একটু সাহায্য চাই।"

রাই জানে,কিন্তু সুজিতের তো বুঝতে পারার কথা নয়! ভয়টা কিসের?

-"বলুন কীরকম সাহায্য, আমি চেষ্টা করব?

সুজিত প্রথমে চুপ রইল, তারপর জিজ্ঞেস করল,

-"আপনার সাথে দেখা করা যাবে?"

রাই একটু ভাবে,

-"কখন? কোথায়?"

-" আমি এখানে সব জায়গা চিনিনা,তাই আপনিই বলে দিন কোথায়?"

সুজিতের সঙ্গে দেখা করা কী দরকার এখন? তবে ভার্মারও ওকে দরকার হতে পারে।

-"আমার অফিস আছে, সন্ধ্যের আগে হবেনা। আপনি নাহয় আজ সন্ধ্যেয় আমার এখানে চলে আসুন। মেট্রোতেও আসতে পারেন, স্টেশন থেকে রিক্সা করে মিনিট পাঁচেক লাগবে। অথবা সিটি ক্যাব নিয়ে চলে আসুন। আমি ঠিকানাটা বলে দিচ্ছি, লিখে নিন।"

সুজিত ফোন রেখে দেবার পরমুহূর্তেই ভার্মার ফোন এল।

-"ম্যাডাম, ফোনে সব বলা যাবেনা। আমি এখন দিল্লীতে। ফিরে আপনার কাছে আসছি। শুধু জেনে রাখুন অনুমতি পাওয়া গেছে, আমরা কাজ শুরু করছি। আসলে দুই রাজ্যের পুলিশের একসাথে হয়ে কাজ করাতে অনেক প্রোটোকল জড়িত থাকে তাই সকাল থেকে ব্যস্ত ছিলাম।"

রাই বুঝতে পারে, সন্ধ্যে অবধি অপেক্ষা করতেই হবে।

আলোককে বলেছিল সুজিতের আসার কথা, আলোকের আবার আজকেই জরুরী মিটিং ,অন্য অফিসে, রাত্রি হয়ে যেতে পারে ফিরতে ফিরতে। সে একটু উৎকন্ঠায় জানতে চায়,

-" আমায় থাকতে হবে নাকি? তাহলে কী বসকে বলব মিটিংয়ে যেতে পারবনা।"

রাই হাসে,

-"আরে না না, তুমি ছেলেটাকে কী মনে করেছ, ভদ্র ছেলে, খুনীটুনী নয়।"

বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি কাজকর্ম সারতে থাকে। সন্ধ্যে প্রায় সাড়ে সাতটার সময় গেট থেকে ফোন আসে, সুজিত বাড়ি খুঁজে এসে পড়েছে। ওপরে আসতে রাই দরজা খুলে ভেতরে বসায়। ছেলেটি এমনি স্মার্ট হলেও এখন একটু অস্বস্তিতে আছে বোঝাই যাচ্ছে, তাই জড়সড় লাগছে। রাই কফি দিয়ে এমনি টুকটাক কথা বলে ওকে সহজ করতে চেষ্টা করে।

-"আগে বলুন আপনি কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন?"

-"আসলে দুদিন ধরে কেমন মনে হচ্ছে কেউ আমার পিছু নিচ্ছে। আমার এখানে গাড়ি নেই, হোটেল থেকে অফিস বেশী দুরে নয়, আমি হাঁটতে ভালোবাসি। ওদিকের রাস্তা বেশ ফাঁকা ফাঁকা, তাই বোধহয় বুঝতে পারলাম, নাহলে ভীড়ে বা গাড়িতে থাকলে এরকম শহরে কেউ পিছু নিয়েছে বোঝা মুশকিল।"

-"আমি এব্যাপারে কিছু জানিনা। ভার্মাকে জিজ্ঞেস করব। আপনাকে পুলিশ কি কোনোভাবে বিরক্ত করছে?"

-"না, অন্য আর কিছু নয়। তবে এই ব্যাপারটাই তো বিরক্তিকর।"

রাই এবার একটু কঠিন গলায় বলে ওঠে,

-"কেন?"

সুজিত একটু চমকায়, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারেনা। রাই আবার বলে,

-"আপনার যদি কিছু লুকোবার না থাকে, আপনি যদি কোনোভাবে অপরাধী না হন তাহলে সমস্যার কী আছে? পুলিশ দুদিন নজর রেখে যখন দেখবে আপনি ঠিকঠাক লোক তখন সরে যাবে।"

-"না মানে, পুলিশ ঠিক কী সন্দেহ করে আমার ওপর নজর রাখছে, সেটা জানেন?"

রাই এখনও সেই শক্ত গলায় বলে,

-"না জানিনা। জানলেও অবশ্য আপনাকে বলতে পারতাম না। আমার তো এটা কোনো সমস্যা বলেই মনে হচ্ছেনা যদি না আপনার কিছু লুকোবার থাকে। রাজীর মৃত্যুতে আপনিই এখনও পর্যন্ত লাভবান, তার উইল অনুযায়ী। তাই আপনার ওপর পুলিশের নজর থাকবে এটা তো খুব স্বাভাবিক।"

সুজিত তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,

-"বিশ্বাস করুন আমি এর কিছুই জানিনা। রাজী উইল করে আমাকে সম্পত্তি লিখে দিয়েছে এ আমার জানা ছিল না।"

-"এখন কী করে জানলেন?"

-"না মানে আমার বাবাকে জানিয়েছে উকিল, রাজীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে।"

রাই খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুজিতের দিকে তাকায়,

-"মিঃ মুকুন্দন, আপনার যদি কিছু বলার থাকে, এখনই সময়। পুলিশের এই কেসে জাল গুটিয়ে আসতে আর বেশী দেরী নেই। তখন যদি জানা যায় আপনি কিছু লুকিয়েছেন ...... ", কথাটা শেষ করেনা।

সুজিত একটু ঘাবড়ে গিয়ে কিছু বলতে যাবে তখনই ইন্টারকম ফোন বেজে উঠল,ভার্মা এসেছে।

ভার্মা ঘরে ঢুকে সুজিতকে দেখে অবাক হলেও সেটা প্রকাশ না করে রাইকে বলে,

-"ম্যাডাম, আপনার অনুমান ফার্মহাউসের ব্যাপারে একেবারে সঠিক। একটু দেরী হয়ে গেল, গিরীশকে দিল্লী পুলিশ অ্যারেস্ট করতে গেলে তাদের সঙ্গে আমাকেও থাকতে অনুরোধ করল।"

রাই কিছু বলার আগেই সুজিত বলে উঠল,

-"গিরীশ মানে রাজীর বাবা? রাজেশ্বরীর কেসে তাকে অ্যারেস্ট করেছেন আপনারা?"

ভার্মা সোফায় বসতে বসতে বলল,

-"না না, রাজেশ্বরীর কেসে নয়। গিরীশকে আমরা নির্মলার মৃত্যুর ব্যাপারে জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করেছি।"

-"নির্মলার মৃত্যু? আপনারা প্রমাণ পেয়েছেন নির্মলাকে মারা হয়েছিল? কিভাবে?"

ভার্মা রাইয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল,

-"রাই ম্যাডাম, এবার আপনি পুরো ব্যাপারটা একটু বিস্তারে বলুন না, কিছু কিছু জায়গা আমারও এখনো পরিস্কার নয়, তাছাড়া মিঃ মুকুন্দনেরও শোনা উচিৎ, উনিই তো নির্মলার একমাত্র আত্মীয় এখন। তবে তার আগে একটু চা যদি পাওয়া যেত।"

রাই ওদের বসিয়ে ভার্মার জন্যে চা করতে গেল। চা আর খাবার নিয়ে যখন এল, সুজিত চুপ করে বসে আছে, ভার্মা ফোনে ব্যস্ত।

ভার্মার খাওয়া শেষ হতে হতে আলোকও এসে গেল। সেও শুনল গিরীশের গ্রেফতার হওয়ার কথা। প্রাথমিক শোরগোল মিটলে সবাই উৎসুক হয়ে রাইয়ের দিকে তাকিয়ে,

রাই আর সময় না নষ্ট করে শুরু করল,

-"প্রথমেই সুজিতকে জানাই যে আমাদের বিশ্বাস পুলিশের লোকজন লালজীর ফার্মহাউস থেকে যে মৃতদেহের কঙ্কাল উদ্ধার করেছে তা নির্মলার। কিছু পরীক্ষানিরীক্ষার পর তা প্রমাণও হয়ে যাবে। নেকরামকে পাওয়া গেলে অথবা গিরীশ যখন মুখ খুলবে তখন পাকাপাকি জানা যাবে।

মানুষের মনের গতি বড় বিচিত্র, কোনো কার্যকারণে সব সময় তাকে বাঁধা যায়না। গিরীশ দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি পেয়ে যখন আসে তখন সে বিবাহিত, তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। এখানে থাকার কোনো ঠিক নেই, অচেনা শহর তাই নির্মলাকে তার শাশুড়ী আসতে দেয় না। গিরীশের এই শহরে প্রথম বন্ধু হয় শুভার ছোট দাদা, এভাবেই গিরীশের শুভাদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু হয়। সে অত্যন্ত সুপুরুষ, শুভা তাকে দেখে প্রেমে পড়ে। শুভা এমনিতে দেখতে তেমন কিছু নয়, কিন্তু দিল্লীর মেয়ে, চটক আছে, পড়াশোনা নাচগানের শহুরে পালিশের কাছে সাধারণ নির্মলা ম্লান হয়ে যায়। গিরীশের ব্যক্তিত্বের অভাব আজও তাকে দেখলেই বোঝা যায়, আমার ধারণা শুভা অনায়াসে তাকে নিজের করায়ত্ত করে।

রাজী হওয়ার পর হয়ত কিছু আন্দাজ করেই গিরীশের মা, বউ ও নাতনীকে নিয়ে দিল্লীতে ছেলের কাছে আসে। এদিকে শুভা গিরীশকে তাড়া দিতে থাকে, বৌ মেয়েকে কাছে পেয়ে গিরীশের মত দুর্বল চরিত্র যদি আবার ঘুরে যায়, সে দেরী করতে চায়না।

নির্মলাকে ডিভোর্স করলে তার মা শুভাকে মেনে নেবেনা ও তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে এ ভয় গিরীশের ছিল। তার চাকরি সামান্য, শুভার বাবাও এমন কিছু ধনী নয়, তার দাদারা আছে অংশীদার। শুভা বাবার মা মরা আদুরে মেয়ে, সে প্রাচুর্যে অভ্যস্ত তা বাবার কালো পথের পুলিশী রোজগারেই আসুক আর যে ভাবেই আসুক।

আমার ধারণা শুভারই মস্তিস্কপ্রসূত এটা যে কোনোভাবে নির্মলা যদি সরে যায় পথ থেকে তাহলে সবদিক বজায় থাকে। আর এটা করতে গেলে দিল্লীর মত জায়গাতেই সম্ভব কারণ এখানে পুলিশ বাবা সহায়। গিরীশ শুভার পুরোপুরি বশে, সে শুধু পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে। অবশ্য মনে হয় শুভার বাবা জানলে এদের এমন ঝুঁকি নিতে দিতনা না বা মেয়ের এরকম একটি বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ককে সমর্থন করত না, তাই এরা আগে থেকে তাকে কিছু জানায় নি। নেকরাম শুভার ছোটো বয়স থেকে আছে, কোলেপিঠে খেলিয়েছে। লোকটি ডাকাবুকো, তার অতীতও খুব পরিস্কার নয়, মার দাঙ্গায় প্রায়ই জড়িয়ে পড়ত। শুভার বাবা তাকে একটি প্রায় খুনের কেসে বাঁচায় ও তাকে নিজের বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে নিয়োগ করে। সেই থেকে এই পরিবারের জন্য সে সব কিছু করতে পারে। শুভা তাকে ধরে, নেকরামের মত লোকের কাছে এ খুব একটা অন্যায় কিছু বলে মনে হয় না।

সেসময় আমরা জেনেছি সন্ধ্যে হয়ে গেলে ফিরোজগাঁওতে রিক্সাও তেমন পাওয়া যেতনা, গ্রামের মধ্যে হাঁটা বা নিজের বাহন ছাড়া লোকের যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থা ছিলনা। নেকরাম দিন দেখেছিল যখন তার পিসতুতো ভাই শালিখরামের সঙ্গী চৌবেজী ছুটিতে থাকবে। সেই দিনে গিরীশ বৌকে বলে বাজার থেকে হেঁটে না ফিরে মন্দিরে গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে, সে তাকে স্কুটারে নিয়ে আসবে। সেইমত নির্মলা মন্দিরে যায়। সন্ধ্যের ঐ সময়টা মন্দিরের পুরোহিত বা তার ছেলে কেউ থাকতনা, যে কোনো একজন অনাথ বাচ্চা খালি থাকত। মন্দিরে পালপার্বণ ছাড়া লোকসমাগমও তেমন ছিলনা। মন্দিরের ভেতর থেকে গেটের ওখানে স্কুটারে এসে দাঁড়ালে ঠিকমত দেখাও যেতনা, একটা ঝোপের ছায়া এমনভাবে জায়গাটাকে আড়াল করত।

ভার্মাজী যখন নেকরামের ইন্টারভিউ আমাকে শোনালেন, ভালো করে শুনে আমার সন্দেহ হয় যে নেকরাম যে গেট আর ঝাড়ির কথা বলছে সেটা আইয়াপ্পা মন্দিরের হতে পারেনা। ওখানে মন্দিরের গেট নেই ওরকম, সামনে কোনো ঝোপও নেই, বড় গাছ আছে। নেকরাম পুলিশকে বলেছে সে কোনোদিন ফিরোজগাওয়ের মন্দিরে যায়নি । কিন্তু ওর মাথার মধ্যে নির্মলার ব্যাপারটাই ঘুরছিল, রাজেশ্বরীর ঘটনায় সে দোষী নয়, তাই নিয়ে তার মাথাব্যথাও নেই। মন্দিরের প্রশ্নে সে আসলে ঝুলেলাল মন্দিরের বর্ণনা দিয়ে ফেলেছে, শান্তিবিহারের আইয়াপ্পা মন্দিরের নয়।

যা বলছিলাম, নির্মলা ফিরোজগাঁওয়ে নবাগতা, তার ওপর ভাষার সমস্যার জন্য সে কারো সঙ্গে গল্পগাল করবে এ সম্ভাবনা কম,অতএব মন্দিরে তাকে কেউ খুব একটা খেয়াল করবেনা। প্রশ্ন আসতে পারে মন্দিরেই কেন, অন্য কোনো জায়গায় অপেক্ষা করতে কেন বলল না গিরীশ বৌকে? মনে হয় অন্য কোনো শুনশান জায়গায় দাঁড়াতে বললে নির্মলা ভয় পেত, সে ভালো কিছু চেনেনা হয়ত শেষ অবধি স্বামীর কথামত না দাঁড়িয়ে গুটি গুটি পায়ে বাড়িই চলে যেত। মন্দির তার পছন্দের জায়গা, সেখানে সে মাঝে মাঝেই যায়, সেখানে অপেক্ষা করতে তার আপত্তি নেই, বরং বাড়ির কাজ কর্ম, বাচ্চা, শাশুড়ির থেকে বাইরে গিয়ে একটু অবকাশ, সে খুশীমনেই রাজী হয়েছিল।

গেটের সামনের রাস্তা ঝোপের আড়াল পড়ে বলে গিরীশ নিশ্চিত ছিল যে তাকে স্কুটারে কেউ দেখতে পায়নি। মন্দিরের ছেলেটি সম্ভবত গিরীশকে সত্যিই দেখেনি, সে নির্মলাকে যেতে দেখে ভেবেছে যে অন্যদিনের মত গিরীশ স্কুটার নিয়ে এসেছে বা নির্মলা হয়ত বলেছে যে তার স্বামী স্কুটার নিয়ে তাকে নিতে আসবে। সেই কারণেই পরে পুলিশের জেরার সামনে বাচ্চা ছেলেটি ভয় পেয়ে যায় ও ঘাবড়ে নিজের ওপরেই সন্দিহান হয়ে ওঠে। অজয়কে পুলিশ খুঁজছে, পেয়ে যাবে নিশ্চয়ই, তার মনে পড়লে আমরা নিঃসন্দেহ হব।

এরপরে কী হয়েছিল সেটা গিরীশ ও নেকরামই বলতে পারে। আমার ধারণা খুনটা নেকরাম করে। মন্দির থেকে ফার্মহাউসের রাস্তায় কোথাও গিরীশ স্কুটার দাঁড় করায় বা কোনো অছিলায় নির্মলাকে একা রেখে আড়ালে যায় ও নেকরাম এসে কাজ সারে। নেকরাম সন্ধ্যে থেকে এসে তার ভাই শালিখরামকে মদে কিছু মিশিয়ে খাইয়েছিল,কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ জাতীয়। গিরীশ ও নেকরাম যখন নির্মলার মৃতদেহ নিয়ে ফার্মহাউসে পৌঁছয় তখন সিকিউরিটী শালিখরাম ঘুমে অচেতন। তার কদিন আগেই পাঁচিলের ধার জুড়ে ঢেলে গাছের চারা লাগানো হয়েছিল, নরম খোঁড়া মাটি, সেখানেই ওরা মৃতদেহ পুঁতে ফেলে, কয়েকটা নতুন চারা কাটা পড়ে।

সাতাশ বছরে সে সব গাছ বড় হয়ে গেছে, একরকমের গাছের সারির মধ্যে একজায়গায় কিছু অন্যরকম বেখাপ্পা গাছ দেখে পুলিশ সেখানেই খোঁড়া শুরু করে আর ফলও পায়। লালজীরা প্রভাবশালী লোক, গণ্যমান্য, তাদের ফার্মহাউসে ঢুকে নির্মলাকে খোঁজার কথা পুলিশ ভাববেনা। জীবিত নির্মলাকে তো নয়ই,কখনো কোনোভাবে যদি মৃতদেহ খোঁজার কথা আসে তাহলেও ফার্মহাউসের বিদেশী গাছের চারা নষ্ট করে তো কখনৈ নয়। খোঁজেও নি কেউ আজ পর্যন্ত, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে ওদের পরিকল্পনা একেবারে নিখুঁত ছিল!

ডিভোর্স হলে বা কোনোভাবে নির্মলার মৃত্যু হলে তার বাবা ভাই বা গিরীশের মা, এরা সহজে তা মেনে নিত না, শুভার কথা পরে জানাজানি হলে সন্দেহ গিরীশের ওপর গিয়ে পড়ত। কিন্তু নিরুদ্দেশ হওয়াতে শেষ পর্যন্ত সবাই ভাবত যে স্বামী অন্য মেয়ের প্রতি আসক্ত জেনে নির্মলা নিজেই কোথাও চলে গেছে মনের দুঃখে। এরকম ভেবেই নির্মলাকে খুন করা এবং খুন যাতে কোনোভাবেই প্রমাণ না হয় সে ব্যবস্থা করা!

গিরীশ দুঃখে ভেঙে পড়ার অভিনয় করতে থাকল, পুলিশে প্রাথমিক রিপোর্ট লেখানো ছাড়া পুলিশকে বেশী ঘাঁটাতে গেল না। গ্রামের পুলিশ থানা, তাদের এমন কিছু দায় পড়েনি নিজেদের উৎসাহে তদন্ত চালিয়ে যাবে, অতএব অচিরেই সব কিছু চাপা পড়ে গেল, কারুর মনেও রইল না। গিরীশ ওর মাকে বাচ্চা রাজীশুদ্ধু দেশে পাঠিয়ে দিল।

সমস্যা হল যখন নির্মলার বাবা ভাই এসে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল, গোয়েন্দা বিভাগে গেল। তখন মনে হয় এরা শুভার বাবার কাছে গিয়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, সেটাকে এখন চাপা দিতে হবে এমন কিছু বোঝায়। শুভার বাবা সব বুঝলেও তার কিছু করার ছিলনা, সন্তানস্নেহ বিষম বস্তু, আবার তার খাস লোক নেকরামও জড়িত। শুভার বাবা যা জানা যায়, খুব কিছু সৎ অফিসার ছিলনা, স্বল্প মাইনেতে দিল্লী শহরে বাড়ি, ছেলেমেয়েদের ভালো পড়াশোনা, ছেলেকে বিদেশে পড়ানো,জীবন যাত্রার ধরণ এসবই তার অন্য পথের আয়ের কথা বলে দেয়। তিনি এমনই ব্যাপারটা চাপা দিলেন যে আজ গোয়েন্দা বিভাগে কোথাও কোনো রেকর্ড নেই এই কেসের! নির্মলার বাবা ভাই কিছুদিন ঘুরে ঘুরে নিস্ফল হয়ে ফিরে গেল।

রাজেশ্বরীর কেসে তার মায়ের ঘটনাটা না এসে পড়লে আজও তার মৃত্যুর কথা জানা যেতনা। শুভা ও গিরীশের যখন বিয়ে হয় তখন হয়ত রাজেশ্বরীকে নিয়ে আসার ওদের পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু গিরীশের মা মনে হয় ঠিক কী হয়েছে না বুঝলেও নিজের ছেলেকে বরাবরই সন্দেহ করছিলেন। সমস্ত সম্পত্তি টাকা পয়সা তারই হাতে। তার মন পেতে এরা রাজীকে নিজেদের কাছে নিয়ে আসে, রাজীর জন্যে কনকাম্মাও আসতে বাধ্য হন। পরে শুভার নিজের ছেলেপুলে না হওয়ায়, সে রাজীকে নিজের মেয়ের মতই দেখতে শুরু করে।

রাজীর ঠাকুমা কিন্তু কখনোই ভোলেননি রাজী আসলে নির্মলার মেয়ে, তিনি চাইতেন রাজীর ওদিকেই বিয়ে হোক, নির্মলার দিকে কারোর সঙ্গে। তিনি খোঁজ করে সুজিতের বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করেন, কিন্তু তারা তখন বাইরে। বাইরে গিয়ে সুজিতের বাবার ধারণায় পরিবর্তন এসেছিল, সে সুজিতের সঙ্গে রাজীর বিয়ে দিতে চায়নি, চেয়েছিল ওরা দুজন পরিচিত হলে সেটা ভাইবোন হিসেবেই হোক। শুভা এতদিনে আর চাইতনা রাজী সত্য ঘটনা জানুক, সে তাই জোর করে রাজীর বিয়ে অর্কর সঙ্গে দেয়, গিরীশের আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে হলে রাজী নির্মলার কথা জানতেই পারত, কতজনকে আর আটকাবে! এই কারণেই শুভা রাজীকে নিয়ে গিরীশের দেশে কখনো যেতনা, রাজীর বিয়ের পর গেছে। ততদিনে পুরনো লোকেরা মারাটারা গেছে, কারুর আর ব্যাপারটা নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

গিরীশ পুরোপুরিই শুভার কথায় চলে, শুভা বুঝতে পারে রাজী তাদের সঙ্গে থাকলে কনকাম্মা তাদের ফেলতে পারবেনা। কনকাম্মা তবে কোনোদিনই নির্মলাকে ভোলেনি বা এদের ক্ষমা করেনি। তবু বয়স হয়েছে, অশক্ত অবস্থায় একমাত্র ছেলের সঙ্গে বিচ্ছেদে যেতে পারেনি। তাই শেষমেশ সব কিছু যে শুধু রাজীকে দিয়ে গেছে তাই নয়, চিঠি লিখে রাজীকে সত্যিটা জানাবার ব্যবস্থাও করে গেছে।"

এই পর্যন্ত বলে রাই একটু দম নেই। সবাই চুপ করে শুনছিল, ও থামতেই সুজিত বলল,

-"আমি ভাবতে পারছিনা রাজীর বাবা এরকম, এত নীচ। পিসীর এরকম পরিণতির কথা জানলে বাবা ভীষন আঘাত পাবে। রাজীর কথা মনে করেও খারাপ লাগছে। "

একথায় রাই ওর দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার শুরু করে,

-"রাজীর পক্ষে সব জানতে পারার মুহূর্তটা কতটা বেদনাদায়ক ছিল সেটা আন্দাজ করতে পারা যায়। কিন্তু সে আজকের যুগের বুদ্ধিমতী মেয়ে। নিজের বাবা ও সৎমার প্রতি রাগে ঘেন্নায় তার মন ভরে গেলেও সে তাড়াহুড়ো করে কিছু করেনি। সে জানত এরা এখন তার ভরসায়, ঠাকুমার যা কিছু সব তার। ওপরে ওপরে সব যেমন চলছিল সে চালিয়ে গেছে। অভিনয় ক্ষমতা তার ভালো তা আমরা আগেই জেনেছি। অর্ক, ওর মা, রাজীর হঠাৎ করে বাঙালীয়ানার ওপর বিরাগ, খাওয়া দাওয়া রহন সহন সব কিছু নাপসন্দ সেসব নিয়ে আমাকে বলেছে। সব শুনলে বুঝতে পারবে সবাই যে এর সঙ্গে অর্কদের কোনো

সম্পর্ক নেই, তার সৎমার ওপর রাগেই সে এসব করেছে। হয়ত অর্কর ওপরও তার একটা বিরাগ জন্মেছে এই ভেবে যে শুভার জন্যই অর্কর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে!

নির্মলার ওপর ভালোবাসায় ও শ্রদ্ধায় তাকে স্মরণ করে সে বেশী করে মালয়ালী হয়ে উঠতে চেষ্টা করেছে। সাজেপোষাকেও নিজের মায়ের মত হতে চাইছিল, তাই নিজের স্ট্রেট স্টাইল বদলে মায়ের মত কোঁকড়ানো চুলের জন্য কার্ল করেছিল।"

"

রাই থামলে ভার্মা বলল,

-"ম্যাডাম, শালিখরামের কাছে আজ সকালে ওর গুরুজীর সঙ্গী আসে। তার থেকে ঠিকানা নিয়ে গুরুজীর সঙ্গে পুলিশের লোক দেখা করে কথা বলেছে। উনিই শুভার ছোট দাদা। শালিখরাম নেকরামের সঙ্গে দেখা করার বিফল চেষ্টা করে ওদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রাস্তায়। উনি তখন ওকে সুস্থ করে তুলে ওর সব কথা শোনেন। শালিখরামের মুখে নেকরামের কথা শুনেই ওনার নির্মলার ব্যাপারে সন্দেহ হয়। উনি তখন ওনার বাবার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে গেলে বাবা ওকে চুপ করিয়ে দেন, গিরীশকে এনিয়ে কিছু বলতে বারণ করেন শুভার দোহাই দিয়ে। উনি গিরীশের সঙ্গে আর কথা বলতেন না কিন্তু কিছু করতেও পারেন না নিজের আত্মীয়দের কথা ভেবে।

শালিখরামকে উনি ওর এক বন্ধুর দোকানে কাজ দেন।

এর কিছুদিন পরেই ওর স্ত্রী মাত্র কয়েকদিনের জ্বরে মারা যায়। এতে উনি খুব আপসেট হয়ে পড়েন, শুধু মনে হয় তার বাড়ির লোকের পাপের মূল্য তার স্ত্রীকে দিতে হল, চাকরিও ছেড়ে দেন। সব ঠিকমত না জানলেও শুভার আর গিরীশের বিয়েতে উনি বাধা দেন, তাই নিয়ে গোলমাল হয়ে ওর বাবা ওকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে।

ওনার কাছে কোনো প্রমাণ ছিলনা, উনি নির্মলার সব ঘটনা জানতেন না,তাই পুলিশে যেতে পারেননি,তবে ওর মনে হয়েছিল নেকরাম কোনোভাবে জড়িত। উনি বোঝেন শুধু সন্দেহ নিয়ে পুলিশের কাছে গেলে, বাবা কোনোমতেই কোনো তদন্ত হতে দেবে না, কিছু একটা করে সব চাপা দিয়ে দেবে।তাই শেষ অবধি কিছুই করতে পারেন না।

ইতিমধ্যে শালিখরামের সঙ্গে ওর খুব ভালো পরিচয় হয়ে গেছিল। তার গ্রামের লোকেদের অবস্থার কথা শুনে ওখানে কিছু করার ইচ্ছে হয়। বাড়ি ছেড়ে উনি প্রথমে পাহাড়ে শালিখরামের দেশে চলে যান। সঙ্গে টাকাপয়সা ছিল, মাহরীতে জমি কিনে আশ্রম শুরু করেন। প্রথমে গ্রামের লোকেরাই সাহায্য করত, স্কুল হেলথ সেন্টার এসব চালাতে। এখন ওনার শহরের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকেই ওর এই কাজে জড়িয়ে গেছে, টাকাপয়সা নানাভাবে সাহায্য আসে। তবে আশ্রমের ঠাটবাট কম রেখে লোকের উপকারেই বেশী লাগেন ওরা।

নিজের পরিবারের মধ্যে বোনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ উনি রাখেননি, ভাইয়ের সঙ্গে আছে। ওর বাবা নিজের খরচের অভ্যেসের দরুন টাকাপয়সা বেশী রেখে যাননি, ঐ বাড়ি টুকু ছাড়া। বাড়িটা ওদের দুই ভাইয়ের নামে, শুভাকে বাবা শান্তিবিহারের ফ্ল্যাট কেনার টাকা দিয়ে দেন, বাড়িতে অংশ না দিয়ে। ভাড়ার টাকায় উনি একটা ভাগ পান সেটা ওর বড় ভাই ওর অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দেয়।

বাবা মারা যাবার পরে উনি এখানে এলে বাড়িতে থাকেন তবে নেকরামের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেন না। ওনার সঙ্গে ওর সঙ্গীসাথী থাকে, তারাই কাজকর্ম করে, চাবিও একটা ওনার কাছে থাকে। বড় ভাইয়ের চাবি শুভাকে দেওয়া আছে।

এরকমই একবার এসে রাজেশ্বরীর সঙ্গে ঘটনা চক্রে দেখা হয়ে যায়, রাজেশ্বরী কথা দেয় সে তার বাবা মাকে এই দেখা হওয়ার কথা বলবে না। তারপর থেকে উনি এলে কখনো আসত রাজেশ্বরী, দেখা করতে। উনি রাজীকে স্নেহ করলেও নিজের পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতায় রাজীর আসল মায়ের ব্যাপারটা কোনোদিন তাকে বলতে পারেননি!

কিছুদিন আগে এসে বাড়িতে গিয়ে শোনেন শুভারা এসে আছে। তখন বাড়িতে না উঠে ওর এক বন্ধুর বাড়ি ওঠেন। ওর সঙ্গী পাহাড়ের, সে নেকরামেরই আশেপাশের গাঁয়ের। নেকরামের সঙ্গে কথা বলে সে জানতে পারে রাজেশ্বরীর ব্যাপারটা। ইনি শুনে খুব আবাক হন, মায়ের মত মেয়েও হারিয়ে গেল বাজার থেকে, খারাপও লাগে মেয়েটার জন্যে। সন্দেহ হয় দুটো ঘটনার কোনো যোগ নেই তো!

ওনার অনেক মহলে জানাশোনা আছে, পুলিশেও। সেখান থেকেই খোঁজখবর করেন, এবং পুলিশ যে নির্মলার ব্যাপারটা জেনেছে তাও জানতে পারেন। তখনই কেন যেন মনে হয় শালিখরামের ঘটনা পুলিশকে বললে যদি তদন্তে সাহায্য হয় বা অন্তত নেকরামকে পুলিশ ধরে। এই ভেবেই উনি শালিখরামকে পাঠান থানায়। এর বেশী ওনার আর কিছু জানা নেই।"

সুজিত ভার্মাকে জিজ্ঞেস করে,

-"আমার বাবাকে কী আসতে হবে? আমি এখনো বাবামাকে কিছুই জানাইনি ওদের বোনের ব্যাপার।"

ভার্মা একবার রাইয়ের দিকে তাকায়, ইশারাতে কী যেন কথা হয়।

-"এখন থাক, একটু আলোচনা করতে হবে, কী বলেন ম্যাডাম?"

আলোক এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল, সে বলে,

-"সে নাহয় হল, কিন্তু রাজেশ্বরীকেও কী এরাই মেরেছে? সেই একইভাবে বাজার থেকে গায়েব করে?"

ভার্মা একটু গম্ভীর হয়ে যায়,

-"গিরীশকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হলে কিছু জানা যাবে আশা করি। কাল শুভাকেও থানায় আনা হবে।"

এরপর রাইকে বলে,

-"আমি এখন উঠি ম্যাডাম। মিঃ মুকুন্দন, আপনি কাল একটু থানায় আসবেন। আপনাদের তরফ থেকে নির্মলার কেসটা ফাইল করতে হবে। কিছু ফর্মালিটিজ আছে"।

সুজিত ভার্মার হাত ঝাঁকিয়ে বলে,

-'আপনারা এত করছেন, অনেক ধন্যবাদ, আমার ও আমার পরিবারের তরফ থেকে। আমি কাল সকালেই আপনার কাছে আসব।"

ভার্মার সাথে রাই যায় লিফট অবধি, যে কথা সে জানতে চাইছিল তা সুজিতের সামনে বলা যায়না। ভার্মা বুঝতে পেরে রাইয়ের হাতে একটা কাগজ তুলে দেয়,

-"আপনার সন্দেহ ঠিক, কিন্তু আমরা কিছুই ট্রেস করতে পারছিনা। ভদ্রলোক কোথাও যায়নি, মোবাইল বা ল্যান্ড লাইনের ফোনেও কোনো হদিশ পাচ্ছেনা। আপনি দেখুন চেষ্টা করে।"

ফিরে এসে দেখে সুজিত আলোকের সঙ্গে গল্প করছে। রাইকে আসতে দেখে আলোক সুজিতকে বলে ভেতরে যায়। সুজিত রাইকেও অনেক থ্যাঙ্ক ইউ টিউ বলে।

রাই আরাম করে একটা চেয়ারে বসেছে। সুজিতের কথায় ঐ প্রসঙ্গে না গিয়ে বলে,

-"আপনি রাজেশ্বরীর মৃত্যু সংবাদ যখন দেখলেন পেপারে, তখন খুব অবাক হয়েছিলেন না?"

সুজিত যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এভাবে বলে,

-"হ্যাঁ, মানে আমি তো তার আগের দিনই এলাম, কিছু জানতাম না।"

রাই সোফায় আরাম করে বসে বলে,

-"সুজিত আপনি কেন এসেছেন আজ আমার সাথে দেখা করতে?"

সুজিত ঠিক বুঝতে পারছেনা এমন ভাবে তাকালে রাই বলে,

-"আপনি যখন বলবেন না তখন আমিই বলি।"

রমা সবে সন্ধ্যে দিয়ে উঠেছে, অঞ্জনা লিভিং রুমের সোফায় বসে মোবাইলে বরের সঙ্গে কথা বলছে। অর্ক একটা বই খুলে বসে আছে, পড়ছে কিনা কে জানে! রমার ঘরে টিভি চালিয়ে কার্টুন দেখছে অঞ্জনার ছেলে কুট্টু। দরজায় বেল বাজল, অঞ্জনা অর্কর দিকে তাকালো, তার ওঠার কোনো লক্ষণ নেই, একটু বিরক্ত হয়েই মোবাইলে কথা বলতে বলতে গিয়ে দরজা খুলল। খুলেই অবশ্য অবাক ও অপ্রস্তুত, সঙ্গে সঙ্গে পরে ফোন করবে জানিয়ে ফোন রেখে রাইকে আপ্যায়ন করল।

-"আসুন, ভেতরে আসুন।"

রাইয়ের সঙ্গে একটি সুদর্শন যুবক, দেখে অবশ্য বাঙালী মনে হয় না। ছেলেটিকে এমনিতে স্মার্ট লাগে তবে এখন একটু দ্বিধা চোখে মুখে, অচেনা জায়গায় এলে যেমনটা হয়। রাইকে ঢুকতে দেখে অর্কও উঠে দাঁড়ালো, ওদিকে থেকে রমাও গলার আওয়াজ পেয়ে এসে পড়লে। রাইকে দেখে হাসতে গিয়ে চোখ পড়ে তার সঙ্গীর দিকে, হালকা বিস্ময়। রাই সেটা খেয়াল করে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু না বলে ওদের সবাইকে বসতে বলে, সঙ্গী যুবকটিকেও।

সবাই বসলে সে এদের উদ্দেশ্যে বলে,

-"এর পরিচয় জানলে আপনারা খুব অবাক হবেন। এ হচ্ছে সুজিত, সুজিত মুকুন্দন, গাল্ফে থাকে,রাজীর মামার ছেলে।"

বিস্ময়ের নানারকম অভিব্যক্তি তিনজনের চোখেমুখে, সবচেয়ে প্রথম সামলে নেয় অঞ্জনা।

-"শুভা আন্টির ভাই তো শুনেছিলাম ইউ কে তে থাকে, আর ওর ছেলে আছে তাও জানতাম না। যাইহোক পরিচয় হয়ে ভালো লাগল সুজিত।"

সুজিত কিছু বলেনা যদিও কথাবার্তা সব ইংরেজীতেই হচ্ছিল, শুধু মৃদু হাসে। রাইয়ের মুখ গম্ভীর,

-"আমি ভুল বলেছিলাম, আসলে আপনাদের অবাক হওয়ার পালাটা এখন, যখন আমি বলব যে শুভা রাজীর সৎমা আর সুজিত হল রাজীর মা নির্মলার ভাইয়ের ছেলে।"

এবার সবাই চুপ, দৃষ্টি সুজিতের দিকে, কিন্তু কেমন যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছে সবাই। অর্কর চোখে অবিশ্বাস, সে একটু বিরক্তি সহকারে রাইকে বলে,

-"কী যা তা বলছেন আপনি? শুভা আন্টি রাজীর মা নয় সৎমা, মানে? এ আবার কী নতুন কাহিনী!"

রমা ও অঞ্জনাও অর্ককে সমর্থন করে। রাই অবাক হয়না, এরকম একটা রিয়্যাকশন স্বাভাবিক। সে প্রাথমিক গোলযোগটা থিতোলে ওদের অনুরোধ করে ওর কথা একটু ধৈর্য্য ধরে শুনতে। কোনো কথাই বাদ দেয়না, রাজীর মার নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাও বলে।

-"সত্যি বলছেন? আপনি মিথ্যেই বা বলবেন কেন! কিন্তু এযে কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয়, সাতাশ বছরের ব্যবধানে মা আর মেয়ে একইভাবে নিখোঁজ! এ কী করে সম্ভব হয়?" অঞ্জনা বলে।

অর্ক এখনও অবিশ্বাসী,

-"রাজীর মায়ের কথা সে আমাকে কোনোদিন বলেনি, ওর বাবা মাও এনিয়ে কিছু বলেনি কখনো। আপনাকে কে বলেছে এসব কথা? ইনি? তা, ইনি যে সব সত্যি বলছেন তার কী মানে? এই মামা, মামাতো ভাই এরা এতদিন ছিল কোথায়? রাজীর কাছে এর আগে তো কোনোদিন আসেনি, আজ তার দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ভিড় করছে কেন? আপনি রাজীর বাবা মার কাছে একে না নিয়ে গিয়ে এখানে এনেছেন কেন? সেখানে গেলেই তো এদের আসল উদ্দেশ্যটা বোঝা যেত।"

-"অর্ক, তুমি খুব উত্তেজিত, সেটা অস্বাভাবিকও বলছিনা। কিন্তু পুলিশী তদন্তে এসব আগেই উঠে এসেছে। তোমাদের এতদিন জানানো হয়নি কারণ পুলিশ এসব চাপা রেখেছিল। আজ প্রয়োজন হয়েছে তাই আমি ওকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে এসেছি। রাজী নিজেও আগে জানতনা যে শুভা তার সৎমা, তোমাকে জানাবে কী করে? সে জেনেছে তার ঠাকুমার মৃত্যুর পরে। অবশ্য তখন সে কেন তোমায় বা তোমাদের জানায়নি তা আমি জানিনা।"

অর্ক চুপ। রমা বলে,

-"কিন্তু গিরীশ আর শুভা বিয়ের সময় এসব আমাদের জানায়নি কেন? জানালে কী হত, এই কারণে আমরা বিয়ে দিতাম না তা তো নয়!"

রাই ভাবে এদের কী করে নির্মলার পুরো ব্যাপারটা জানানো যায়। জানাতে তো হবেই!

একটু একটু করে পুরো ঘটনাটা বলে, গিরীশের অ্যারেস্ট হওয়ার খবর দিয়ে। সব শুনে এরা স্তম্ভিত। অনেকক্ষণ কেউ কিছু বলেনা। অর্ক মাথা নীচু করে থাকে, তারপরে মাথাটা তুলে ব্যগ্র হয়ে বলে,

-"রাজীর বাবাকে আমি মাটির মানুষ মনে করতাম, ছিঃ। রাজীকেও কি ওরাই?"

রমাও "ছি ছি" করতে থাকেন।

শুধু অঞ্জনা বলে,

-"আপনারা রাজীর মায়ের মৃত্যুরহস্য তো ভেদ করে ফেললেন কিন্তু রাজীকে কে মারল তা এখনো জানা গেলনা? এই যে একইভাবে ও বাজার থেকে উধাও হয়েছিল, এতে মনে হয়না ওর বাবা মারই প্ল্যান এটা? রাজীকে মেরে সব সম্পত্তি পেতে চেয়েছিল। পুলিশ শুভাকে গ্রেফতার করেনি কেন?"

রাই খুব শান্তভাবে ওকে বলে,

-"রাজীর সম্পত্তি তো তার স্বামীর পাওয়ার কথা, বাবা মার নয়, এটা কী আর ওরা জানেনা, এতই কাঁচা?"

এবার অঞ্জনা রাগে ফেটে পড়ে,

-"আপনারা এখনো অর্ককে সন্দেহ করছেন? আমরা তো রাজীর কী সম্পত্তি আছে কিছুই জানতাম না। এনিয়ে কিছু শুনিনি কখনো। ভাই তো কোনোদিন ওদের কেরালার বাড়িতেও যায়নি। আমরা সাধারন মধ্যবিত্ত, ভাই নিজের ক্ষমতায় সব করেছে, আরো করবে। অন্যের সম্পত্তি টাকাপয়সা লাভের জন্য কোনো অনৈতিক কাজ করার মত শিক্ষা আমরা পাইনি!"

রাই উত্তর না দিয়ে সুজিতের দিকে তাকায়। সুজিত বারান্দা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে হয়ত অস্বস্তি এড়াতেই। এ অবস্থায় শেষ কথাটা রাইকেই বলতে হবে। রাই অঞ্জনার দিকে হাত বাড়ানোর মত ভঙ্গী করে বলে,

-"রাজেশ্বরী বা আপনাদের রাজী বেঁচে আছে, ওর কিছু হয়নি, নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটা সাজানো ছিল।"

তিনজোড়া অবিশ্বাসী চোখ ওর দিকে, কিছুক্ষণ সব চুপ। রাই আবার বলে,

-"রাজী বেঁচে আছে।" অর্ক দুর্বল ভাবে অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বলে "দিদি", একইসঙ্গে অঞ্জনা "ভাই" ও রমা "জিনু" বলে ডেকে ওঠে।

-"কোথায় সে? তুমি কী বলছ রাই, আমরা কিছুই বুঝতে পারছিনা। ওকে পেয়েছ তোমরা? তাহলে ঐ লাশটা কার?" রমা ব্যকুল হয়ে প্রশ্ন করে রাইকে।

-"নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা সাজানো? কে সাজিয়েছিল? এই এতদিন ধরে অর্ক, মা, আমাদের বাড়ির সবাই কী অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, আপনারা আমাদের কিছু বলেননি। আর ঐ লাশ, সত্যি তো ঐ লাশটা তবে কার?" অঞ্জনার কথায় রাই বলে,

-"আমরাও জানতাম না মানে পুলিশ বা আমি। ঘটনাটা রাজীর নিজেরই সাজানো। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এই ঘটনা সাজাতে হলে সেটা রাজীর সমর্থন বা ইচ্ছে ছাড়া সম্ভব নয়।"

অর্ক কিছু বলেনা, কেন? রাইয়ের একটু অদ্ভুত লাগে, ও অর্কর প্রতিক্রিয়া কী হবে ভেবেই সবচেয়ে চিন্তায় ছিল। অঞ্জনা এবার সুজিতকে বলে,

-"রাজী সাজিয়েছে আপনাদের সাহায্যে? কিন্তু কেন? ভাইকে, আমাদের, এভাবে হেনস্থা করে কী লাভ হল আপনাদের?" সুজিত কিছু বলার আগেই রাই বলে,

-"অঞ্জনা, আমি একটু বুঝিয়ে বলি, অবশ্য এসবের কিছুটা আমি সুজিতের কাছে জেনেছি বাকীটা তদন্ত ও অনুমান। আপনারা আমাকে একটু সময় দিন।"

এবার অর্ক কেমন একটা আছোঁয়া স্বরে বলে,

-"বলুন আপনি। আমি পুরো ব্যাপারটা শুনতে চাই। কেন? কেন?"

-"নির্মলার বাবা মেয়ের এভাবে নিরুদ্দেশ হওয়াতে ও তার খোঁজের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ভেঙে পড়েছিলেন এবং কিছুটা এই ঘটনা তার মৃত্যুর কারণ হয়, সুজিতের কাছে আমরা জেনেছি। শাশুড়ী কনকাম্মা কিন্তু রেহাই পাননি, সারাজীবন তিনি কষ্ট পেয়ে গেছেন, অথচ নিজের ছেলের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারেননি। নাতনীর প্রতি অসম্ভব মায়া ছিল, সেই কারণে তার সুস্থ জীবনের কথা ভেবেও হয়ত চুপ রয়ে গেছিলেন। তিনি কিন্তু জানতেন নির্মলা বেঁচে নেই,গিরীশই তার মৃত্যুর জন্যে দায়ী।

নির্মলার গলায় একটি ভারী মঙ্গলসূত্র ছিল, প্রায় ভরি দশেকের। গিরীশ সেটির মায়া ত্যাগ করতে পারেনি, নিজের কাছে রেখে দেয় পরে হয়ত শুভাকে দিয়ে দিয়েছিল। এই মঙ্গলসূত্র কনকাম্মা পরে দেখে চিনতে পারে, গিরীশকে জিজ্ঞেস করতে সে বলে কনকাম্মার ভুল হয়েছে, নির্মলার গলায় অন্য হার ছিল। কনকাম্মা কিন্তু নিশ্চিত ছিলেন যে ঐ হার ঐদিন নির্মলার

গলায় ছিল। তিনি পুলিশে বা নির্মলার বাবাকে এসব বলতে পারেননি তাহলে তার ছেলেকেই ধরা হবে, কিন্তু বিবেকের দংশন তাকে জ্বালিয়ে গেছে চিরকাল।

শেষপর্যন্ত স্বর্গে হিসেব নিকেশ ঠিক রাখার তাগিদেই বোধহয় রাজীকে সব জানিয়ে নিজে পরিস্কার হতে চেয়েছেন। চিঠিতে তিনি এই মঙ্গলসূত্রের ব্যাপারটাও লিখে যান। রাজীও বুঝে যায় যে তার বাবাই তার মায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী। কিন্তু সেও কীভাবে কী করবে বুঝে উঠতে পারেনা! বাবা সৎমার ওপর রাগ ঘৃণা হলেও সে বুদ্ধিমতী মেয়ে, সবদিক না দেখে না শুনে কিছু করতে চায় না।

প্রথমেই সে তার মামার সঙ্গে যোগাযোগ করে, ঠিকানা ঠাকুমা রেখে গিয়েছিল। ঠাকুমা বেঁচে নেই, যা লিখে গেছে তা সত্যি মনে হলেও একবার ভালো করে সব যাচাই করে নিতে হবে। সুজিতদের সঙ্গে দেখা করে মামার কাছ থেকে সব বিশদ জানতে পেরে তার সন্দেহ দুর হয়। তারপরে দিল্লী এসে সে এই ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখে এ কেসের কোথাও কোনো রেকর্ড নেই, উল্লেখ নেই, সব দলিল উধাও। সে বুঝতে পারে এ কেস খুলিয়ে আবার তদন্ত করা, তার মা কিভাবে মারা গিয়েছিল তা জানা অসম্ভব যদি না তার বাবা ও সৎমা নিজে থেকে দোষ স্বীকার করে।

অনেক ভেবে চিন্তে এবং সুজিতের সঙ্গে পরামর্শ করে সে নিজের নিরুদ্দেশের পরিকল্পনা করে দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে, এক, তার বাবা একমাত্র মেয়ের একইভাবে নিখোঁজ হওয়াতে মনস্তাপে যদি সব কথা স্বীকার করে। তবে বাবাকে আটকাতে শুভা আছে তাই দুই নম্বর ও ভেবেছিল যদি এই কেসের ভেতরে ওর মায়ের ঘটনাটা কোনোভাবে এসে পড়ে তাহলে পুলিশ ওর মায়ের ব্যাপারটার তদন্ত করতে বাধ্য হবে।

রাজী দিল্লী এসে মিসেস থমাসের সঙ্গে দেখা করে, ও জানত মিসেস থমাসের সঙ্গে ঠাকুমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল আর উনি একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা, ঠাকুমা ওনাকে ভক্তি করতেন। মিসেস থমাসের সঙ্গে কথা বলে ও দেখল ওর ধারণা ঠিক, ঠাকুমা ওনাকে সব বলে গেছেন। মিসেস থমাসও রাজীকে সাহায্য করতে রাজী হলেন। কথা হল যে উনি পুলিশের কানে নির্মলার ব্যাপারটা আর রাজীর নিরুদ্দেশের সঙ্গে ওর মায়ের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাচক্রের যে মিল আছে সেটা তুলে দেবেন।

রাজী মামার কাছে ঐ মন্দিরের ব্যাপারটা শুনেছিল, সেও তাই ঠিক করল মন্দিরের সামনে থেকে গাড়িতে উঠবে, সোনি ওখানে ওসময় থাকবে সে জানত। সোনিকে দেখলেই ও রাস্তা পেরিয়ে যাবে আর ডাকলে সাড়া দেবেনা। মন্দিরের সামনে থেকে ওকে কালো গাড়িতে তুলে নেয় মিসেস থমাসের মেয়ে, সে এসে মায়ের কাছে অপেক্ষা করছিল, ফোন পেয়ে মন্দিরে আসে। রাজী অন্য একটি ফোন ব্যবহার করে যার নাম্বার অর্কর জানা ছিলনা কিন্তু সুজিত বা মিসেস থমাস এদের ছিল।

সেদিন থেকে গুরগাঁওতে মিসেস থমাসের মেয়ের বাড়িতে থাকে রাজী। মিসেস থমাসকে অর্ক সেভাবে চেনেনা, তার মেয়ের সঙ্গে রাজীর যোগাযোগের কথা কেউ কল্পনাই করতে পারবেনা। আসলে এটা মিসেস থমাসের ব্যবস্থা, তার মেয়ের বাড়িতে থাকার ব্যাপারটা। মেয়ে এখন একা বাচ্চাকে নিয়ে, জামাই বিদেশ গেছে, রাজীর ওখানে লুকিয়ে থাকার কোনো বাধা নেই।

এদিকে শান্তিবিহারের পুলিশ যখন মিসেস থমাসের কথায় পাত্তা দেয় না, তখন ওরা সবাই একটু চিন্তায় পড়ে। ওরা রাজীর লাশ খুঁজে পাওয়ার ঘটনাটাতেও ঘাবড়ে যায়। সুজিত এসে যখন কাগজে দেখে খবরটা তখন সে তাড়াতাড়ি ফোন করে জানায় রাজীকে। লাশ পাওয়া যাবে ও তার কারণে অর্ক খুনের কেসে পুলিশের সন্দেহভাজন হবে তা এরা ভাবেনি। যেমন রাজী এও ভাবেনি তার বাবা মার ওপর রাগ করে করা উইলে সুজিতকে সব লিখে দেওয়ার জন্যে সুজিতও ঝামেলায় পড়বে!

লাশের কীর্তিটা যৌথভাবে গিরীশ ও রাজপালের। গিরীশ যখন পুরো ব্যাপারটা শোনে, তার সন্দেহ হয় অর্ককে। সে অর্ককে নিজের মতই ভাবে, তার তাই বদ্ধ ধারনা হয় অর্কই তার মেয়েকে খুন করেছে। সে চায় যেকোনোভাবে অর্ককে শাস্তি দিতে। আমরা ভাবছিলাম রাজপাল ওদের প্রভাবিত করছে অর্ককে দোষী ভাবতে আসলে উল্টো। ওরাই রাজপালকে ধরে বসেছিল যেভাবে হোক অর্ককে ধরতেই হবে।

যখন রাজপাল গিরীশকে ফোন করে বলে রাজীর মত একটি লাশ পাওয়া গেছে পালওয়ালে তখন গিরীশই তার হাতে মঙ্গলসূত্র তুলে দেয় যা আসলে রাজীর নয়, রাজীর বিয়ের সময়ে একই দোকান থেকে কেনা শুভার হার। রাজপাল টাকা পেয়ে এ কাজে রাজী হয়। অর্ক লাশ দেখে চিনতে পারেনা কিন্তু তাতে কারুর সন্দেহ হয়না কারণ এতদিনের জলে ভাসা লাশ!

তাই যখন ডি এন এ টেস্টের কথা ওঠে তখন রাজপাল ঘাবড়ে যায়। যদি কেউ মঙ্গলসূত্রের ব্যাপারটা নিয়ে প্রশ্ন তোলে! যারা লাশটি দেখেছিল সেই খোঁড়া ছেলেটি ও বনকর্মীদের কারোর গয়নার কথা মনে নেই, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। এত ভারী একটা সোনার হার গলায়, নজরে পড়তই। পালওয়ালের পুলিশরা লাশ ছোঁয়নি রাজপালের নির্দেশে, রাজপাল ভার্মার আগে পৌঁছয়, সে ভান করে যেন তার হাতের হার ঐ লাশের গলা থেকে খোলা।

গিরীশ তার শ্বশুরের দৌলতে এই শহরের পুলিশ বিভাগের কার্যকলাপ ভালোই জানত। তাই বড়মুখ করে ডি এন এ টেস্টে সায় দেয়। তারপর রাজপালকে টাকা দিয়ে ব্যবস্থা করতে বলে যাতে ঐ রিপোর্ট পজিটিভ আসে। গিরীশের ধারণা হয়েছিল অর্ক রাজীকে মেরেছে বা মারিয়েছে কিন্তু হয়ত এমন ব্যবস্থা করেছে শ্বশুরের মতই যে কোনোদিন খুন প্রমাণ হবেনা, লাশ পাওয়া যাবেনা। তাই তার কাছে ঐ লাশ রাজীর বলে প্রমানিত হওয়া জরুরী মনে হয়েছিল।

ভাগ্যবশত যতিন্দর আমাকে নিয়ে যায় মিসেস থমাসের কাছে, নাহলে অবশ্য খোঁজখবর নিয়ে উনি দু একদিনের মধ্যে ভার্মার কাছে যেতেন। সুজিত রাজীকে সাহায্য করতেই কাজ নিয়ে এদেশে আসে। সে ফিরোজগাঁও গিয়ে খোঁজখবর করে এই ভেবে যে দরকার হলে পুলিশের সাহায্য করবে। এসবে সত্যিই আমাদের সাহায্য হয় নির্মলার কেসে। তবে তখনও আমরা রাজীর নিরুদ্দেশের ব্যাপারে অন্ধকারে।

সুজিত আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে পুলিশ কী করছে না করছে জানার জন্যে। আমার কিন্তু প্রথম থেকেই সুজিতের হাবভাব দেখে সন্দেহ হয়, রাজীর সঙ্গে তার ভালো বন্ধুত্ব (যদি কাজিন ব্যাপারটা নাও ধরি) অথচ তার মৃত্যুতে সেরকম কোনো শোক দুঃখ নেই। অর্কর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপার মুখে বলছে, আমাদের কাছে ঠিকানা ফোন নাম্বার নিতে পারত কিন্তু নিল না। রাজীর ঠিক নির্মলার মত একইভাবে হারিয়ে যাওয়া এটা একমাত্র গিরীশ করতে পারে কিন্তু সে কেন করবে! এতে তো তারই বিপদ, নির্মলার কেস যা চাপা পড়ে গেছে আবার খুলবে। গিরীশ ছাড়া এরকম নিরুদ্দেশ মঞ্চস্থ করতে পারে একমাত্র রাজী নিজে।

গিরীশকে দুর্বল করার চেষ্টায় মিসেস থমাসের মেয়ে (সুজিতের ফিল্মি আইডিয়ায়) সাউথ পার্কের ফোন বুথ থেকে রাজীর নামে ফোন করে। গিরীশ এতে ঘাবড়ে যায়, সে তো একটা মিথ্যে লাশকে রাজীর লাশ বানিয়েছে, সত্যিই যদি রাজী বেঁচে থাকে, অর্ক দোষী না হয়! রাজপালও ভয় পেয়ে যায়, তাই দেখে গিরীশ ভার্মার কাছে আসে। এই ব্যাপারটাতে গিরীশের এরকম রিয়্যাকশন আমার অদ্ভুত ঠেকে। তখনই মাথায় আসে তবে কী ঐ লাশটা সত্যিই রাজীর নয়? অর্ক বার বার বলেছে ওটা রাজী নয় যদিও সেভাবে গুছিয়ে কারণ বলতে পারেনি, তাহলে কি অর্কই ঠিক! আমি তখন ভার্মাকে বলি চুপি চুপি আর একবার ডি এন এ টেস্ট করাতে কাউকে কিছু আভাস না দিয়ে। দ্বিতীয়বার টেস্ট করে প্রমাণ হয়ে যায় ঐ লাশ রাজীর নয়। ফরেন্সিকের লোক যে রিপোর্ট বদলেছে ও রাজপাল দুজনেরই সাসপেনসন অর্ডার এতক্ষণে এসে গেছে বোধহয়।

ফোনের ব্যাপারে বলে রাখি, সুজিতের মোবাইল ও হোটেলের ফোন পুলিশ মনিটর করছিল সমানে। কিন্তু সুজিত রাজী বা মিসেস থমাসের সঙ্গে যোগাযোগ করত অন্য ফোনে যার নাম্বার আমরা জানতাম না। মিসেস থমাসকে বা তার মেয়েকে আমরা কেউই সন্দেহ করিনি। আসলে রাজী যে বেঁচে আছে বা তার নিরুদ্দেশের ঘটনা যে তার নিজেরই সাজানো এটা গিরীশ ঐ ফোন পাবার আগে আমার মনে হয়নি। তারপর আমি ভার্মাকে ডি এন এ টেস্ট করতে বলি আবার।

রাজীও তার অন্য ফোনে সুজিত বা তার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করত। সুজিত কম্পিউটার প্রোফেশন্যাল, তারই নির্দেশে রাজী এমনভাবে নিজের মেলবক্স, ব্যবহৃত কম্পিউটার, সব কিছু থেকে সমস্ত রেকর্ড মুছে ফেলে, যাতে কোনোভাবে সন্দেহ না হয় যে নিরুদ্দেশের ব্যাপারটা সাজানো, পরিকল্পনামাফিক হয়েছে। "

একটানে এতটা বলে থামে রাই। ঘরের লোকগুলো চুপচাপ শোনে যন্ত্রের মত, কোনো কথা বলেনা, প্রশ্ন করেনা। না করলেও অর্কর চোখে রাই যেন প্রশ্ন দেখতে পায় "কেন?কেন?"

-"অর্ক, তুমি রাজীকে ভুল বুঝোনা। সে তোমাকে সব কিছু বলতে পারেনি, বলা উচিৎ ছিল, তোমাদের যা সম্পর্ক তাতে সবকিছু সবার আগে তোমার সাথেই শেয়ার করার কথা। কিন্তু অবস্থাটা বোঝো, তোমার সাথে তার সম্পর্কের মূল হল শুভা যে এই অবস্থায় সব জানার পর তার চোখে প্রধান অপরাধী। শুভার সাথে সাথে তোমাদের ওপর, বাঙালী ও বাঙালীয়ানার ওপর রাজীর বিতৃষ্ণা জন্মাল। সে বুঝতে পেরেছিল তার নিরুদ্দেশের ঘটনায় সবাই তোমায় সন্দেহ করবে, পুলিশে তোমায় হ্যারাস করবে, তোমাকে অনেককিছু সইতে হবে কিন্তু তাও সে তোমায় সব জানাতে পারেনি। তোমায় সে বিশ্বাস করতে পারেনি।"

রাইয়ের কথার মাঝে সুজিত বলে ওঠে,

-"আসলে এই লাশের ব্যাপারটা তো আমাদের প্ল্যানে ছিলনা। স্ত্রী নিরুদ্দেশ, স্বামীর ওপর সন্দেহ আসবে সম্পর্ক নিয়ে এইটুকুই। খুনের ঘটনা প্রমাণ হতে আপনার ওপর মানসিক চাপটা অনেক বেশী পড়েছে, রাজী এরকম হবে ভাবে নি।"

অঞ্জনা বলে,

-"এটা অন্যায়। এতদিনে রাজী আমাদের বা নিজের স্বামীকে চিনতে পারেনি? অর্ককে জানালে সে রাজীর সহায় হত। শুভা আন্টি ওরকম বলে সব বাঙালী খারাপ?"

কেউ উত্তর করেনা, রমা সুজিতকে বলে,

-"খুব খুব অন্যায় করেছে রাজী আমাদের না বলে, অন্তত অর্ককে সবকথা বলা তার উচিৎ ছিল। তোমরা ভাবতে পার কী মানসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমার ছেলে গেছে দিনের পর দিন? আশেপাশের লোক, আত্মীয় বন্ধু তার ওপরে পুলিশ তো আছেই সবাই তাকে স্ত্রীর হত্যাকারী সন্দেহে দেখেছে।"

অর্ক কিন্তু তখনও চুপ। সুজিত ওর দিকে তাকিয়ে বলে,

-"রাজী সব কিছু লিখে নিজের স্বীকারোক্তি পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। ভার্মা কথা বলছে যাতে ওর বিরূদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া না হয়। আপনাকে রাজী কিছু লিখে পাঠায়নি তবে আমাকে বলেছে আমি যেন ওর হয়ে ক্ষমা চেয়ে নি।"

অর্করা সবাই এ কথায় অবাক হয়ে তাকায় সুজিতের দিকে। রাই মুখ ঘুরিয়ে থাকে। সন্দেহটা অঞ্জনাই মুখে আনে,

-"রাজী এখন এখানে ফিরবেনা? ওতো গুরগাঁওতে আছে বললেন।"

সুজিত অর্কর পাশে গিয়ে বসে। ওর পিঠে হাত রেখে বলে,

-"প্লিজ, আপনি ওকে একটু সময় দিন। ও কিছুতেই এখানে ফিরতে রাজী হলনা। আজ ভোরের ফ্লাইটে ও আমার বাবার কাছে চলে গেছে। মেয়েটা খুব দুঃখী। ও মনে করে ওর বাবা মার কথা জানলে সবাই ওকে করুণা করবে বা সন্দেহ করবে, মোট কথা কেউ ওকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারবেনা, আপনারাও নয়। তাই ও আমার বাবা মার কাছে থাকতে চায়। বাবাও বলল এ অবস্থায় ওকে ওখানেই পাঠিয়ে দিতে।

আমার বিশ্বাস সব মিটে গেলে ও যখন দেখবে আপনি ওকে ভালোবাসেন, ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছেন তখন ও ফিরে আসবে। সেই কদিন একটু ধৈর্য্য ধরুন, রাজীকে, আপনাদের সম্পর্ককে একটু সময় দিন। আমি আজ এখানে এসেছি আপনাদের সবাইয়ের কাছে এই অনুরোধ করতে। নাহলে কী হয়েছে না হয়েছে সেসব তো রাই ম্যাডাম বা পুলিশের লোক এসে আপনাদের জানাতে পারত।"

রাই ও সুজিত যখন অর্কদের বাড়ি থেকে বেরোলো তখন কেউই বিদায় সম্ভাষণ টুকু জানাবার মতও অবস্থায় নেই, কেমন যেন একটা নীরবতার আচ্ছাদন ঘিরে ধরেছে সবকটি মানুষকে।

রাইকে ওর বাড়ীতে ছেড়ে দিয়ে সুজিত চলে গেল। সে এখন কিছুদিন থাকবে, ভার্মার তাকে দরকার আছে, সেই কড়ারেই রাজীকে যেতে দেওয়া হয়েছে।

রাতে ভার্মার ফোন এল নেকরামকে পাওয়া গেছে। সে সব স্বীকার করেছে। রাইয়ের ধারণাই ঠিক, নির্মলার খুন করেছে ঐ নেকরামই। এবার হয়ত গিরীশও মুখ খুলবে। ওরা উকিল দিয়েছে, শুভা খুব চেষ্টা করছে জামিন করতে।

রাইয়ের খুব ক্লান্ত লাগে। চোখ বন্ধ করে বার বার অর্কর মুখটা ভাসে চোখের সামনে। কী করবে অর্ক এবার? রাজীর জন্যে অপেক্ষা? নাকি আজকালকার আধুনিক যুগের ছেলে দুদিনেই সব ভুলে নিজের জীবন, কেরিয়ারে মেতে যাবে? আর রাজী? সে কি ফিরবে কোনোদিন এদেশে? যেখানে তার সব আছে অথচ কিছুই নেই! সুজিতের কথা মনে হয়। খুব ভালো ছেলে, হয়ত ঐ পারবে সব ঠিক করে দিতে, নিজের পরিবারকে আবার স্বাভাবিক করতে, সবাইকে সাতাশ বছর আগেকার দুর্ঘটনা থেকে বার করে নিয়ে আসতে! নিশ্চয়ই পারবে, পারতেই হবে।

সুজিতের কথা মনে করে রাইয়ের মুখে হাসি ফিরে আসে ঘুমে ঢলে পড়ার আগে।